https://boierpathshala.blogspot.com

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com

বটতলা

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

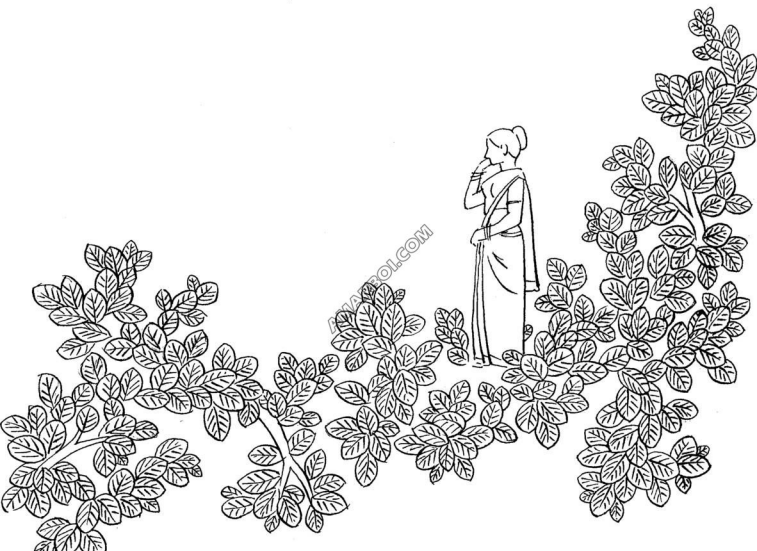

PATHAGAR.NET

প্লেন মাটি ছুঁলেই চাকার আওয়াজে গা-টা কেমন যেন শিরশির করে ওঠে নীলার্কর, কিছুক্ষণের জন্য বড্ড অস্বস্তি। এবার তা হল না। দমদমের রানওয়ে বলেই কি? তা কিন্তু নয়। এর আগেও যখন বিদেশ থেকে ফিরেছে, একইরকম অনুভূতি হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, এবার ফিরল প্রায় আড়াই বছর পর। আগের তিনবার একবছর অন্তর এসেছে। মাঝের এই দীর্ঘ বিরতির ফলে, নিজের এলাকার প্রতি তীব্র একটা টান তৈরি হয়েছিল, অনেকটা তেষ্টার মতো। প্লেন দমদমের মাটি ছুঁতেই অদ্ভুত ভাললাগায় ভরে গেল মন। চাকার আওয়াজ তখন গ্রাহ্যের বাইরে রয়ে গেল।

প্যাসেঞ্জাররা সব উঠে দাঁড়িয়েছে। আপাতত প্লেনটার যাত্রা এখানেই শেষ। দরজায় এখনও সিঁড়ি লাগানো হয়নি। লাগেজ কেবিন থেকে হ্যান্ডব্যাগ নামিয়ে প্যাসেঞ্জে অপেক্ষা করছে যাত্রীরা। নীলার্ক কোনও তাড়াহুড়ো করবে না। আর ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই তো পৌঁছে যাবে বাড়ি। উইন্ডো সিট পেয়েছিল, বাষ্পধূসর কাচের বাইরে এখন ভোর। ফ্লাইটের ঘোষণা অনুযায়ী ছ'টা বাজে। কলকাতার তাপমাত্রা বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর সঙ্গে যদি এটাও বলত, 'এখানে এখন শরৎকাল। তারিখ, পয়লা আশ্বিন...' বড় ভাল লাগত শুনতে। নিকট ভবিষ্যতে হয়তো বলবে। মার্কেটিং পলিসি সর্বক্ষণ হাতড়ে বেড়াচ্ছে মানুষের আবেগ।

সে যাই হোক, নীলার্ক এখন ভাবে, কে তাকে নিতে আসবে এয়ারপোর্টে? গেটের বাইরে গিয়ে কার মুখ দেখবে? আগে যে-ক'বার ফিরেছিল, মা-বাবা এসেছিল। প্রথমবার বোন। এবার ফ্লাইটের অ্যারাইভাল টাইমটা ভীষণ অড। এত ভোরে এখানে আসতে হলে রাতে দু'-তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমোতে পারবে না মা-বাবা। চারটের আগেই দেউলপুর থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। পড়েছে নিশ্চয়ই। গাড়ি নিয়ে আসবে। ড্রাইভার হিসেবে ডেকে নিয়েছে পল্টুদাকে। রাতে গাড়ি চালাতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় পল্টুদার, পাকা হাত।

অন্ধকার থাকতে বাবারা যখন বেরিয়েছে, নীলার্ক সেই সময় উজ্জ্বল একটা সকাল পার হচ্ছে আকাশপথে। নির্দিষ্ট সূচি মেনে সিঙ্গাপুরে নেমেছিল ফ্লাইট। যেহেতু আরও পুরের দেশ, তাই সকাল হয়ে গিয়েছিল। আকাশে রাত নামল কিছুক্ষণের জন্য, এখন আবার ভোর। সামনের দু'মাস আর বেলা এলোমেলো হবে না। এদেশেই থাকবে নীলার্ক। লম্বা ছুটি... ভাবনার মাঝে একটা চিন্তা উঁকি মারল, মা-বাবার সঙ্গে তনয়া না উঠে পড়ে গাড়িতে। ওকে বিশ্বাস নেই, সারপ্রাইজ দিতে ওস্তাদ। কিছুদিন ধরেই তনয়া ফেসবুকে বেশ চুপচাপ আছে। নীলার্কর লম্বা চ্যাটে উত্তর দিচ্ছে ঠিকই। এতে এই লক্ষণগুলোই বলে দিচ্ছে, বড় কোনও সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে নীলার্কর জন্য। তনয়ার ধরন-ধারণ ভালমতোই জানে নীলার্ক। সম্পর্কটা বহুদিনের। ফেসবুকে শেষ লম্বা কথোপকথন, সেটা বোধ হয় মাসছয়েক আগে। তনয়া বলেছিল, "তোমার পোস্ট-ডক অবধি অপেক্ষা করতে রাজি নয় বাবা-মা। আমার কানে মাথা খাচ্ছে। বলছে, সামনের বছরই বিয়ে করে নিতে। এবার এসে তুমি জেঠু-জেঠিমার সঙ্গে বিয়ের তারিখ নিয়ে কথা বলো। তারপর আমার মা-বাবা অফিশিয়ালি কথা বলতে যাবে। আর যদি এসব না করো, আমি এবারই তোমার সঙ্গে প্লেনে চড়ে বসব, মনে থাকে যেন!"

বিয়ে নিয়ে এরকম আলটিমেটাম আগে কখনও দেয়নি তনয়া। পরিস্থিতি নিশ্চয়ই যথেষ্ট চাপের হয়ে আছে। মাঝের দু'মাস বিয়ের কথা বিশেষ তোলেনি চ্যাট করার সময়। আজ হয়তো নীলার্ক এগুচ্ছি গেটের বাইরে গিয়ে দেখবে, ছিপছিপে সারিতে হবু শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে তনয়া। রাতে নীলার্কদের বাড়িতেই ছিল। থাকাটা অবাক করা ঘটনা নয়। পাড়ার সরকারি টিউবওয়েল থেকে ল্যাম্প পোস্ট, এমনকী, ঘোষালদের জোড়া মহনাপাখিও জানে নীলার্ক-তনয়ার সম্পর্কের কথা। এবার উঠতে হবে। ফ্লাইট ফাঁকা হয়ে এসেছে। উঠে দাঁড়ায় নীলার্ক।

ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যাওয়া, কনভেয়ার বেল্ট থেকে নেছেছে দুটো সুটকেস তোলা, তারপর কাস্টমস এরিয়া পার হওয়া— সব মিলিয়ে আধঘণ্টার বেশি লাগল। প্রথমদিকে বিদেশে যাওয়া-আসার সময় এয়ারপোর্টে ঢুকেই কত ছিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যেত নীলার্ক। মনে হত, এই বুঝি নিয়মের বেড়াজালে আটকে গেল পথ। এখন সবকিছুই কত অনায়াস হয়ে গিয়েছে। শুধু তো ক্যালিফোর্নিয়ার ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি ফেরা নয়, গত সাড়ে পাঁচ বছরে আরও বিভিন্ন দেশে সেমিনার, প্রোজেক্টের কাজে গিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জগুলো নীলার্কর কাছে এখন জলভাত।

শেষ যেবার এসেছিল, তার থেকে অনেক বেশি ঝকঝকে লাগছে এয়ারপোর্টের ভিতরটা। ডেকরেশন বেশ স্মার্ট হয়েছে। যদিও উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এখনও ঢের পিছিয়ে। তবু কাজ তো হচ্ছে, এগোচ্ছে দেশ... চারপাশ দেখতে-দেখতে গেটের কাছে পৌঁছে গেল নীলার্ক। কাঁধে হ্যান্ডব্যাগ, দু'হাতে ট্রাউস ট্রলিব্যাগ টেনে বাইরে আসে নীলার্ক, চোখ বোলায় ফেন্সিংয়ের ওপারে অপেক্ষমাণ ভিড়ে। না, বাবা-মা, তনয়া, কারও দেখা তো সে চোখে পড়ছে না। এত তাড়াতাড়ি এসে উঠতে পারেনি। এখন বোধ হয় অন দ্য ওয়ে। বাইরে গিয়ে বুথ থেকে বাবাকে ফোন করবে নীলার্ক। নিজের সেটে আমেরিকার সিম, এখানে কাজ করবে না। হঠাৎ কানে আসে, "অ্যাই নীলু! নীলু! এদিকে!"

অভিদার গলা না? ঘাড় ঘোরায় নীলার্ক। হ্যাঁ, অভিদাই! এমনিতেই লম্বা, তার উপর আবার হাত তুলে ডাকছে। মা-বাবা-তনয়ার অ্যাভোজ হাইট, নীলার্ক সাধারণ উচ্চতার মানুষদের মধ্যে ওদের খুঁজেছিল। অভিদা নিতে এসেছে দেখে ভীষণ খুশি হয়েছে নীলার্ক। একগাল হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুখে। অভিদা কি মা-বাবাকেও এনেছে? তনয়া? বোন অলিও চলে আসতে পারে। অভিদা যখন এসেছে, ড্রাইভার ডাকা হয়নি। দারুণ গাড়ি চালায় অভিদা!

প্যাসেজ থেকে বেরোতেই অভিদা হাত থেকে ট্রলি ব্যাগদুটো নিয়ে নিল। বলল, "তাড়াতাড়ি চল। এখানে বেশিক্ষণ গাড়ি রাখতে দিচ্ছে না। নিয়ম সব পালটে গিয়েছে।"

বোঝা গেল, মা-বাবা আসেনি। এলে, গাড়িতে বসে থেকে অপেক্ষা করত না। ছেলেকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ত। নীলার্ক ভেবেছিল অভিদা মুখোমুখি হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। কত দিন পর দেখা! অভিদাকে জড়িয়ে ধরার জন্য সে প্রস্তুতও ছিল। সেসব কিন্তু না গিয়ে অভিদা এখন চলেছে সুটকেসদুটো টানতে-টানতে। হয়তো গাড়ি বেশিক্ষণ পার্ক করতে দেবে না বলেই এত তাড়াহুড়ো।

বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ফেলে অনেকটাই চলে এসেছে গাড়ি। সকালবেলা বলে রাস্তায় তেমন ট্র্যাফিক নেই। ইতিমধ্যে নীলার্ক জেনেছে মা-বাবা না আসার কারণ। অভিদাই বাবাকে বলেছে, "তোমরা ব্যস্ত মানুষ। বেরোবে কেন? দু'জনেই বয়স হয়েছে। আমি নিয়ে আসব নীলুকে।" এটা একটা কাজের কাজ করেছে অভিদা। করাটা অবশ্য ওর কর্তব্যও। কিন্তু কাজ আর সেটা মেলে চলে! নীলার্ককে ডিপারচারের গেট দিয়ে বেরোতে দেখেই অভিদা বাড়িতে ফোন করে জানিয়েছে। বাড়ির লোক এখন নিশ্চিন্ত। চ্যারিটি পরিবারের এই প্রজন্মের বড় ছেলে অভিদা। নীলার্কর জ্যাঠামশাইয়ের একমাত্র সন্তান। বাবারা চার ভাই, দুই বোন। বিয়ের পর পিসিরা অন্যত্র জমিয়ে ঘর-সংসার করছে। পৈতৃকবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ আছে ভালই। নীলার্কদের মূল বাড়িতে সেজকাকা আর ছোটকাকার পরিবার থাকে। ছোটকাকা নিঃসন্তান। সেজকাকার এক ছেলে, এক মেয়ে। নীলার্ক বাবা আর জেঠু মূল বাড়ির গায়ে, সরু রাস্তার ওপারে পৈতৃক ভিটেতেই আলাদা বাড়ি করে বসবাস করছে। পুরনো বাড়ির নিজেদের অংশ প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। চারটে সংসারের রান্নাঘর আলাদা হলেও, যেহেতু সবাই পাশাপাশি থাকে, একটা যৌথ পরিবারের আবহ বিরাজ করে। মাথা হিসেবে মানা হয় জেঠুকে। বাবারা প্রায় সব ব্যাপারেই জেঠুর পরামর্শ নেয়। বয়স হয়েছে জেঠুর, ছেলে অভিদার উপরই এখন চ্যারিটি পরিবারের ভাল-মন্দ দেখার দায়িত্ব। সেই যোগ্যতা অভিদার আছে। খুবই ডাকাবুকো ছেলে ছিল একসময়। নীলার্ক তার বাদাকে আইডল করেছিল। দেখা পড়াশুনাতেও বেশ ভাল ছিল অভিদা। কেরিয়ার গড়তে গিয়ে কিছু ভুল ডিসিশন নেওয়ার ফলে জীবনে সেভাবে উন্নতি করে উঠতে পারেনি। সাধারণ একটা কোম্পানিতে ক্যাশিয়ারের কাজ করে। জেঠুই বলে-কয়ে করে দিয়েছে চাকরিটা। খুব সোর্সফুল লোক জেঠু। ব্যাঙ্কের রিজিওনাল ম্যানেজার পদে থাকাকালীন চাকরি থেকে রিটায়ার করেছে। টাকাপয়সার অভাব ওদের নেই। ছেলের রোজগারের উপর নির্ভরশীল নয় জেঠু। ওই সংসারের ঘাটতি শুধু একটাই, জেঠিমা নেই। অভিদা কলেজে ফার্স্ট ইয়ার, জেঠিমা মারা গেল আচমকাই। ব্রেন স্ট্রোক। অনেক খরচ করে জেঠু দোতলা বাড়িটা বানিয়েছিল। যেমন আর্কিটেক্ট, তেমনই মডার্ন ফিটিংস। বাড়িটা সে-সময় দেউলপুরের মতো

AMARBOI.COM

একটা গঞ্জে হৃষ্টব্য বস্তু হয়ে উঠেছিল। নীলার্কর তখন স্কুলজীবন। সেই প্রথম সে টের পেল, জেঠ্রার তাদের চেয়ে অনেক বড়লোক। হাবেভাবে ওরা কখনওই সেটা প্রকাশ করত না। জেঠিমা মারা যেতেই বাড়িটাকে কেমন যেন একটা নিভু-নিভু ভাব ঘিরে ধরল। ঘরদোর তালমতো পরিষ্কার হত না। আলো জ্বলত না সব ঘরে। বাড়ি ঘিরে থাকা বড় গাছপালাগুলো ছাঁটা-কাঁটা হত না। জেঠিমা মারা যাওয়ার পর থেকে নীলার্ক শেষ যেবার দেখে গিয়েছে, বাড়িটাকে একবারও রং করা হয়নি। এবার নিশ্চয়ই গিয়ে দেখবে জেঠ্রার বাড়ি ফের জ্বলজ্বল করছে। কারণ, মাঝে বিয়ে হয়েছে অভিদার। বাড়ির একটা বড় অনুষ্ঠান মিস করেছে নীলার্ক। পিএইচ ডি-র পেপার জমা দেওয়ার চাপ ছিল। বিয়ের ছবি বাড়ির লোক মেল করেছিল, তনয়াও শেষ কিছুই পাঠিয়েছে। কনের সাজে অভিদার বউকে বেশ ভাল দেখতেই মনে হয়েছে। সাধারণ সাজের ছবি পায়নি নীলার্ক। বউদির সঙ্গে ফোনেও কেউ কথা বলায়নি। প্রায় দেড় বছর হল বিয়েটা হয়েছে, এই প্রথম বউদিকে চাক্ষুষ করবে নীলার্ক, আলাপ হবে। বিয়ের ছবিতে জেঠ্রার বাড়ির বদলটা বোঝা যায়নি। ল্যান্ডেলো ঢাকা ছিল বাড়ি।

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল গঙ্গার হাওয়ার ঝাপটায়। দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে এসে পড়েছে গাড়ি। বহুদিন পর ফিরছে বলে নীলার্ক নায়ির ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছিল, অভিদা এতক্ষণ ধরে চুপ করে আছে কেন? গাড়ি চালু করার পর কিছু কথা বলেছিল। তারপর থেকে নীরব। কেন এত চুপচাপ অভিদা? মনে একটা আশঙ্কা ছড়িয়ে যায় নীলার্কর, বাড়িতে তার জন্য কোনও খারাপ খবর অপেক্ষা করে নেই তো? মা-বাবার শরীর ভাল আছে? নাকি দু'জনের কোনও একজন বিশেষ অসুস্থ বলেই অভিদা রিসিভ করতে এসেছে তাকে? কিন্তু মাথায় আসা খারাপ চিন্তাটা তো সরাসরি প্রকাশ করে দেওয়া যায় না। তাই হালকা চালে নীলার্ক বলে, "বাড়ির সবার খবর ভাল তো? জেঠ্রার শরীর-টরির..."

"ঠিক আছে।" বলেই চুপ করে গেল অভিদা। একমনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। ধন্দ কাটল না নীলার্কর। আরও কিছু কথা বলে গল্পের ছলে ব্যাপারটা জানতে হবে। নীলার্ক বলে ওঠে, "তারপর, অভিদা, ফেরার পর নতুন জীবন কাটছে কেমন?"

"আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত যেমন কাটে।"

'মধ্যবিত্ত' শব্দটা সম্ভবত একটা খোঁচা। একটা বড় অ্যামউন্টের ফেলোশিপ পেয়ে নীলার্কর বিদেশ পড়তে যাওয়াটায় চ্যাটার্জিবাড়ির লোকেরা যেমন গর্ববোধ করে, কেউ-কেউ আবার হীনমন্যতায় ভোগে। অভিদার ক্ষেত্রে সেটা যেন একটু বেশি মাত্রাতেই ধরা পড়ে। এমএসসি-র পর নীলার্ক যখন আমেরিকার ইউনিভার্সিটি থেকে অফার লেটার পেল, অভিদা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল তার সামনে। ততদিনে দুটো ব্যবসায় হেঁচট খেয়ে গেছে এমনিতেই একটু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। নীলার্কর সাফল্য যেন আরও বেশি নিস্তেজ করে দিয়েছিল অভিদাকে। চ্যাটার্জি পরিবারের সবাইকে এড়িয়ে চলত। আসলে এই সাফল্য অভিদাও পেতে পারত। সে-ও তো কম মেধাবী ছিল না। বাড়ি লোকজন মনে করত অভিদার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। নীলার্কর উপরই বরং তাদের এতটা প্রত্যাশা ছিল না। কারণ, সে অভিদার মতো ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হত না। তবে সায়েন্সে বরাবরই ভাল রেজাল্ট করত। হিসেব উলটে যাওয়ায় অভিদা একবারনের কমপ্লেক্সে ভুগতে শুরু করল। কিন্তু এত দিন পর সেটা খারাপ কথা নয়। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সবার সব কিছু হয় না, এই বাস্তবটা বোঝার মতো বয়স হয়েছে অভিদার। তাও কেন সহজ হতে পারছে না! নীলার্ক যেমন সাফল্য পেয়েছে, একই সঙ্গে পরিবারকে ছেড়ে থাকার কষ্টটাও তো সইতে হচ্ছে। অভিদাকে সেই অসুবিধেয় পড়তে হয়নি। সমস্ত ঘটনারই একটা ভাল দিক থাকে। অভিদাকে সহজ করার জন্য নীলার্ক বলে, "আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড। বউদির সঙ্গে প্রথম আলাপ হবে। তোমরা তো একবার ফোনেও কথা বলাওনি।"

"বলতে চেয়েছিল তুই?"

চেয়েছিল কি না মনে করতে পারল না নীলার্ক। শেষ দেড় বছর যা চাপের মধ্যে কেটেছে! প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলে, "ফোনে কথা না হয়ে ভালই হয়েছে। সামনাসামনি প্রথম আলাপ হওয়ার মজাই আলাদা।" একটু থেমে ফের নীলার্ক বলল, "বউদির সাজগোজের ন্যাক আছে তো? কসমেটিক্স, পারফিউম সব নিয়ে এসেছি।"

কথাটার উত্তর না দিয়ে অভিদা বলল, "বাইরের দেশের সিগারেট দে তো একটা, অনেক দিন খাইনি।"

"এই যাঃ! তুমি যে এখনই চাইবে, তা তো ভাবিনি! তোমার জন্য এনেছি এক কার্টন। লাগেজে রাখা আছে।"

"খুস শালা, কোথায় ভাবলাম তুই বিদেশ থেকে ফিরবি, তোর থেকে একটা কিং সাইজ নিয়ে টানতে-টানতে বাড়ি যাব। তা না, সেই দেশি সিগারেটই খেতে হবে!" বলে এক হাত সিস্যারিং ধরে জামার পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট, লাইটার বের করল অভিদা। গাড়ি চালাতে-চালাতে কায়দা করে ধরিয়েও নিল। বিদেশি সিগারেট না পাওয়াতে অভিদা যেভাবে হতাশা প্রকাশ করল, তাতে বাড়ির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল নীলার্ক। এত অল্পেই যখন হতাশ হচ্ছে অভিদা, তার মানে নিজেই কোনও কারণে ডিসটার্বড আছে। কথা বলছে কম।

ব্রিজ থেকে নেমে গাড়ি এখন হাইওয়ে ধরে চলছে। এভাবে অনেকটাই যেতে হবে। হাওড়া জেলার শেষ প্রান্তে হুগলি জেলা আসার আগেই জেম্ফ টার্ন নিতে হবে। তারপর চার কিলোমিটার গেলেই দেউলপুর। ওই রাস্তাটুকু ভীষণই খারাপ ছিল বলেছিল। এখন কেমন, কে জানে! সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলে ওঠে অভিদা, "হ্যাঁ রে নীলু, তোর মতো জ্বলার ছেলে ছাড়াও তো আমেরিকায় অনেক সাধারণ ভারতীয় ছেলেপিলে থাকে, তারা কীভাবে পেট চালায়? মানে কাজকম্ম কী করে?"

কাজ অনেকরকমই আছে। মোটামুটি শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বল অনেকেই ঢুকে পড়ে ইউএসএ-তে। তারপর ব্যাঙ্ক, ছোটখাটো অফিসে চাকরি করে। শশিং মল-এ অনেক ভারতীয় ছেলে-মেয়েকে সেলস-এর কাজ করতে দেখেছি। তারপর ধরো, বাড়ি বদলের সময় ফার্নিচার শিফ্‌টের লেবার হিসেবেও দেখা যায় আমাদের দেশের ছেলেদের। রেস্তোরাঁর বিঙ্গনেস, সার্ভিস বয়, ক্যাব ড্রাইভার এসব তো আছেই। বাংলাদেশিও প্রচুর।"

"আমি তো গাড়িটা ভালই চালাই, কী বলিস?"

"হ্যাঁ, দারুণ হাত!"

"তোদের আমেরিকায় গিয়ে চালাতে পারব ট্যাক্সি? ওখানে তো আবার রাইট হ্যান্ড ড্রাইভিং?"

"হ্যাঁ, সেটা অভ্যেস হতে তোমার দু'ঘণ্টাও লাগবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুমি হঠাৎ ইউএসএ-তে ক্যাব চালাবে কেন?"

"ইউএসএ-র অন্য কোথাও নয়। তোর লস এঞ্জেলসে ক্যাব চালাব। থাকব তোর কাছে। দু'ভাই একসঙ্গে।"

মাত্রাছাড়া ফ্যানটেশিন থেকে কথাটা বলছে অভিদা। কারণটা এখনই জানতে চাওয়াটা ঠিক হবে না। বাড়ির অন্য কারও কাছে জেনে নেবে নীলার্ক। এখন হালকা চালে জিজ্ঞেস করে, "তা, বউদি কোথায় থাকবে? তাকেও নিয়ে যাবে নাকি?"

"সে এখানেই থাকবে। দেখাশোনা করবে বাবার। আমার আর এদেশে থাকতে ভাল লাগছে না।"

উত্তরে কিছু না বললে খারাপ দেখায় বলেই নীলার্ক জিজ্ঞেস করে, "কেন ভাল লাগছে না? আবার কোনও বিঙ্গনেসে জড়িয়ে গোলমাল পাকিয়েছ নাকি? তুমি তো চাকরি করছিলে!"

সিগারেটের শেষটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে অভিদা বলে, "এখনও ওটাই করছি। বিঙ্গনেস-ফিঙ্গনেসের দিকে আর যাইনি। আমি বুঝে গিয়েছি এদেশে কোনও কিছু করেই নিজের উন্নতি করা সম্ভব নয়। সব কেমন যেন থমকে গিয়েছে। এই দ্যাখ, হাইওয়েতে গাড়ি চালাচ্ছি, আশির বেশি স্পিড তুলতেই পারছি না। এত ট্র্যাফিক! তোর ওখানে তো শুনেছি দেড়শোর নিচে গাড়ি চলে না। স্পিড ব্লো করলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।"

AMARBOI.COM

"হাইওয়েতে দেড়শোর উপরও চালানো যায়। ডাউনটাউনে অত স্পিড তোলা যায় না। ওখানেও ট্র্যাফিক জ্যাম। আর ট্র্যাফিক রুল ভীষণ কড়া। বেড়াতে যাওয়া অথবা খুব দরকার ছাড়া আমি গাড়ি বের করি না। লস এঞ্জেলসে পার্কিং ট্রাজপোর্ট অ্যাভেলেবল। ইউনিভার্সিটি তো পায়ে হাঁটা ডিসট্যান্স।"

"তোকে আমি পাইকেল, সাঁতার শিখিয়েছিলাম, মনে আছে?"

"মনে না থাকার কী আছে!"

"গাড়ি চালানো শিখলি ওখানে গিয়ে। কেমন শিখলি একবার দেখি। দশ-পনেরো মিনিট চালা তো গাড়িটা।" বলে গাড়ির স্পিড স্লো করে রাস্তার বাঁ-প্রান্তে যায় অভিদা।

নীলার্ক আশঙ্কিত হয়ে বলে ওঠে, "আরে, তোমার মাথা খারাপ নাকি! আঠাশ ঘণ্টা প্লেন জার্নির পর গাড়ি চালানো যায় নাকি কখনও?"

"যায়, যায়। এখনও জেট্‌ল্যাগ শুরু হয়নি তোর। নিজের কিনে দেওয়া গাড়ি, নিজের দেশে চালাতে কেমন লাগে, একটু দ্যাখ! আমি তো আছি পাশে।"

কথাটার মধ্যে কি কোনও শ্লেষ আছে? অভিদা সম্ভবত বলতে চাইছে, দূর থেকে টাকা পাঠিয়ে মা-বাবা, বাড়ির প্রতি কর্তব্য করা যায় না। তাদের পাশে থাকতে হয়। যেমন অভিদা আছে। এই আবেগতাড়িত ভাবনাটাও অভিদার হতাশাজনিত। নীলার্ককে প্যাঁচে ফেলে হতাশাটা কাটাতে চাইছে। এতে যদি সে একটু শান্তি পায়, নীলার্ক সমস্যায় পড়তে রাজি। অভিদাকে সে বলে, "ওকে। গাড়ি দাঁড় করাও। দেখি চালিয়ে..."

কিছু তো একটা গড়বড় হয়েছে চ্যাটার্জি পরিবারে। কিন্তু সেটা ঠিক কী, এখনও টের পায়নি নীলার্ক। বা বলা ভাল, পেতে দেওয়া হয়নি। প্রতিবারের মতোই নীলার্ককে দেখে মা-বাবা-বোনের মুখে খুশি উপচে পড়েছিল, খুব তাড়াতাড়ি সেটা স্তিমিত হল। যা অন্যবার হয় না। তারপর যে-উষ্ণতাটুকু ধরে রেখেছিল বাড়ির তিনজন, নীলার্ক বিবি বুঝতে পেরেছে, তার মধ্যে বেশ খানিকটাই অভিনয়। একে-একে কাকা-কাকিমারা এল। তাদের এক্সপ্রেশনেও ধরা পড়ছিল কিছু একটা চেপে রাখার প্রচেষ্টা। এল সেজকাকার ছেলে-মেয়ে, জয় আর সোনাই। ওরা ছিল অনেক স্বতঃস্ফূর্ত, সারবীল। এসেই বলেছিল, আমাদের জন্যেও গিফ্‌ট এনেছ, বের করো।

সুটকেস খুলেছিল নীলার্ক। তাদের জন্য যা এনেছিল, হাতে-হাতে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। দিয়েছে কাকা-কাকিমাদের। ওরা চলে যাওয়ার পর বাড়ির গিফ্‌টগুলো বের করেছে, সেগুলো দামি এবং বোনের বেলায় একাধিক। নয়তো অমি ছাড়বে কেন? নিজের দাবা বলে কথা! জেট্‌লের গিফ্‌টগুলো দেওয়া হয়নি। অমি একসঙ্গে তুলে রেখেছে। জেট্‌ল বাড়ি থেকে এখনও কেউ আসেনি। আসছে না কেন, কে জানে! নীলার্কদের বাড়ির সঙ্গে কোনও মনোমালিন্য হল নাকি? সেই কথাটাই কি সবাই চেপে যাচ্ছে? ঝগড়াঝাটি হলে তো অভিদার তাকে রিসিভ করতে যাওয়ার কথা নয়। হাইওয়েতে নীলার্ক স্টিয়ারিংয়ে বসার পর বাড়ি অবধি চালিয়ে নিয়ে এসেছে। লাগেজ নামিয়ে দিয়ে গাড়ি গ্যারেজে রেখেছে অভিদা। গ্যারেজটা পুরনো বাড়ির সামনে। নীলার্ক ভেবেছিল, অভিদা গাড়িটা রেখে তাদের বাড়ি আসবে। এল না।

নীলার্করা যখন বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছেছিল, তার আগেই গাড়ির আওয়াজ পেয়ে মা-বাবা-বোন চলে এসেছিল বাইরে। নীলার্ক নেমে যাওয়ার পর অভিদা যখন গাড়ি নিয়ে চলে গেল, বাবা বলেছিল, "অভিটার কোনও গাড়িজ্ঞান নেই। তোকে গাড়ি চালাতে দিয়েছে কেন? এখানকার রাস্তায় ড্রাইভ করা কি মুখের কথা! অথচ অভিই আগ বাড়িয়ে বলল, 'আমি গিয়ে নিয়ে আসি নীলুকে। তোমাদের আর রাত থাকতে বেরতে হবে না।' দায়িত্ব যখন নিল, পুরোটা পালন করা চিটাচাকা একরম উলটোপালটা কাজ করে এসেছে।"

বাবাকে ঘামাতে চেয়ে নীলার্ক বলে উঠেছিল, "হাইওয়েতে চালাইনি। গ্রামের মুখ থেকে বাড়ি অবধি। আমিই জোর করেছিলাম চালাব বলে।"

বাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকেই মা জলখাবার খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে যাচ্ছিল। নীলার্ক হত বলছে, "ফ্লাইটে ব্রেকফাস্ট করেছি, ওরা খানিকক্ষণ অন্তর-অন্তর খাবার দেয়।" মা সে কথা শুনলে তো! বলেছিল, "প্লেনে কী খাবার দেয় আমার জানা আছে!"

'জানা' বলতে শোনা আর কী! বাড়ির তিনজনই বিদেশে যাওয়ার প্লেনে চাপেনি। কী খাবার দেয়, না দেয়, কতক্ষণ অন্তর... প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। দেশের মধ্যে বাবা-মা-বোনকে প্লেনে ঘুরিয়েছে নীলার্ক। সেসব ফ্লাইটে খাবার কিনে খেতে চায়নি কেউই। অদ্ভুত বোধ হয় একবার কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়েছিল। গত সাড়ে পাঁচ বছরে নীলার্ক যে-ক'বার বাবাকে বলেছে, তিনজন মিলে চলো আমার ওখানে। ও দেশটার কিছুটা ঘুরে দেখে নেবে, গোটা দেশটা বিরাট, প্রতিবারই বাবার উত্তর ছিল, যাতায়াতে তিনজনের যা প্লেনভাড়া লাগবে, এই গ্রামে তা দিয়ে ঘরকন্নাই জমি হয়ে যাবে। ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া বাকি। দিন-দিন জিনিসের যা দাম বাড়ছে! অত টাকা অপচয় করার কোনও মানেই হয় না!

ফুড কর্পোরেশনের ক্লার্ক ছিল বাবা। রিটায়ার করার আগেই তিল-তিল করে টাকা জমিয়ে এই বাড়িটা করেছে। নীলার্কর কিশোরবেলাটা কেটেছে রাস্তার ওপারে পুরনো বাড়িতে। এবাড়ির দোতলার যে-ঘরটায় নীলার্ক এখন বসে আছে, এটা তৈরি হয়েছে সে আমেরিকা যাওয়ার পর। ওখান থেকে টাকা পাঠানো শুরু করতেই বাবা দোতলায় হাত দিয়েছিল। অ্যাটাচড বাথওয়ালা গুই ঘরটা শুধু নীলার্ক জন্যই বানানো হয়েছে। অন্য কেউ ব্যবহার করে না। দোতলার ফ্লোর মার্বেল করার সময় বাবা একতলাটাও করিয়ে নিয়েছে। আগে ছিল সিমেন্টের লাল মেঝে। বাড়ির ভিতরটা ঝকঝকে-তকতকে হলেও বাইরে ডিস্ট্রাইপটা তো আর পাল্টানো যায়নি। সে তুলনায় পাশে জেট্‌লর বাড়িটা এখনও অনেক সুন্দর। বিছানায় শোওয়ার আগে জানালা দিয়ে জেট্‌লর বাড়িটা দেখেছিল নীলার্ক, আলাদা মিলে গিয়েছিল। অভিদার বিয়ে উপলক্ষে বাড়িটা রং করা হয়েছে, ছাঁটা হয়েছে গাছপালা। বাড়িটা ফিরে পেয়েছে যৌবনের গরিমা। নতুন বউকে এখনও দেখা হল না। কাকারা চলে যাওয়ার পর নীলার্ক মাকে বলেছিল, "যাই, জেট্‌লের গিফ্‌টগুলো দিয়ে আসি। দেখে আসি বউদিকেও।"

মা বলল, "এখনই যাওয়ার কোনও দরকার নেই। খাওয়াদাওয়া কর। রেস্ট নে। শরীরটা ধাতস্থ করে বিকেলের দিকে যাস। এর মাঝে যদি ওরা কেউ আসে, তা হলে তো মিটেই গেল।"

জেট্‌ল্যাগের কথা ভেবে নিজা রেস্ট নিতে বলেছিল মা। এখন আর প্লেনের জার্নিতে তেমন কাবু হয় না নীলার্ক। নিজের দেশ এবং অন্যান্য দেশে বারবার যাতায়াত করে যাত্রার ধকলটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। ঘুমোতে এসে শুয়ে জেগে থাকাটাও বড় বিরক্তিকর। একবার থাইল্যান্ডে দিয়েছে মা। লুচি, বেগুনভাজা, ঘুগনি, সিমাইয়ের পায়েস। ওদেশে এগুলো সহজে খাওয়া হয় না। মা এখন বেছে-বেছে এসব পদ খাওয়াবে। কাজ চালানোর মতো রান্না শিখে গিয়েছে নীলার্ক। ঘুগনির হলুদ মটর ওখানকার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে অনেক খুঁজেও পায়নি। স্ট্যান্ডার্ড সিমাইও পাওয়া যায় না। রুটি-লুচি বেলতে পারে না নীলার্ক। পাপড়ের মতো প্যাকেট করা রুটি পাওয়া যায় ওখানে। সেটাই ভেজে অথবা সেঁকে নিতে হয়। সে কি আর মায়ের হাতের মতো হবে? ছুটির এই দু'মাস এরকমই খাওয়াদাওয়া চলবে বাড়িতে। মাঝে আবার পুজো আছে। আমেরিকা যাওয়ার পর থেকে এই প্রথম দেখে পুজো কাটাবে নীলার্ক। আজ যখন হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালিয়ে আসছিল, চোখ ভেলে যাচ্ছিল মাঠের দিকে, জলার ধারের কাশবনের ঝোপবাড়ে। এই দৃশ্যের কোনও তুলনা হয় না। সাদা, নরম ফুলগুলো যেন স্মৃতির পালক। রাস্তায় আসতে-আসতে অনেকে ক'টা মণ্ডপের সামনে থামা গেল। গ্রামে ঢুকেও চোখে পড়ল তিনটে ক্লাবের মাঠে বাঁশের বাঁধা চলছে। সব শেষে মহাদেবতলার কাছে এসে নীলার্ক যখন দেখল চণ্ডীমন্দিরের ঠাকুরদালানে প্রতিমার গায়ে সাদা রং পড়েছে, মনটা ভরে গিয়েছিল আনন্দে। এটাই তাদের পাড়ার পুজো। এককালে এই পুজোটা এলাকার

জমিদারের ছিল। বংশধররা হাত গুটিয়ে নেওয়ায় পাড়ার লোকেরা হাল ধরে। চণ্ডীমন্দির এখন ট্রাস্টি বোর্ডের জিম্মায়। দাতব্য চিকিৎসালয় আর ছোটখাটো লাইব্রেরি আছে মন্দিরের চৌহদ্দিতে। বাঁধানো একটা মঞ্চও আছে, পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় ওখানে। বড় ফাংশনগুলো খোলার মাঠে।

পাড়ার এই পুজোর আবহে তনয়া প্রোপোজ করেছিল নীলার্ককে। সেটা বোধ হয় সপ্তমীর দিন হিল। তনয়ার ক্লাস টেন, নীলার্ক যাদবপুরে থার্ড ইয়ার। পুজোর দিনগুলোয় মন্দির মঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার থাকত নীলার্কের উপর। সপ্তমীর সন্ধ্যায় নাচের অনুষ্ঠানের আগে বোন অলিকে ড্রেস পরে তৈরি থাকতে দেখলেও, ওর সঙ্গে ড্রয়েটে যে নাচবে, সেই তনয়াকে দেখা যাচ্ছিল না। নাচের অনুষ্ঠানের তখন আধঘণ্টাও বাকি নেই। স্টেজে গান গাইছিল পাড়ার এক বউদি। নীলার্ক ঘণ্টেই উৎকণ্ঠা নিয়ে অলিকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী রে, তোর বন্ধু কোথায়? তোদের তো একসঙ্গে নাচ!"

"ও নাচবে না। রাগ করে বাড়ি চলে গিয়েছে। আমি একাই নাচব। আমার নামটা অ্যানাউন্স করো শুধু।" বলেছিল অলি।

নীলার্ক তখন বলে, "বাড়ি চলে গেছে, মানে এসেছিল। মেকআপও নিয়েছে, তারপর কার সঙ্গে ঝামেলা হল?"

"আমার সঙ্গে। সামান্য একটা কথা বলেছি, সুন্দরীর রাগ হয়ে গেল। ঠোঁট ফুলিয়ে চলে গেল বাড়ি! বড্ড ন্যাকা!" বলে মুখ বেঁকিয়েছিল বোন।

বাচ্চাদের ঝগড়া। এমনিতে দু'জনের গলায়-গলায় বন্ধুত্ব। মেয়েটা যখন মেকআপ নিয়েছে, এখনই নিশ্চয়ই চুলে ফেলেনি। ওদের বাড়িটাও একদম কাছেই। ফুলিয়ে-ভালিয়ে যদি নিয়ে আসা যায়, এই ভেবে নীলার্ক মন্দির চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তার বোনের কথায় রাগ করেছে, রাগ মেটানোর একটা তাগিদও অনুভব করছিল।

তনয়াদের বাড়িতে গা দিতেই ওর মা বলেছিল, "কী হল বল তো? আমি মেয়ের নাচ দেখতে বেরিছি, দেখি সে ফিরে এল কাঁদতে-কাঁদতে। নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়েছে। ডাকছি, খুলছে না।"

"আমি দেখছি।" বলে সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে গিয়েছিল নীলার্ক। তনয়ার ঘরের সামনে গিয়ে নাম ধরে ডাকল বেশ কয়েকবার। দরজা খুলেছিল তনয়া। ভেজা, গমগমে মুখ-চোখ। প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পরও যেন আকাশের মেঘ কাটেনি। নীলার্ক বলেছিল, "কী হয়েছে? ফাংশন ছেড়ে চলে এলি কেন? কী বলেছে অলি?"

"কিছু বলেনি। আমি নিজেই চলে এসেছি। আর কোনওদিন ফাংশন করব না। কালই মামার বাড়ি চলে যাব। ওখান থেকেই লেখাপড়া করব।" বলে বিছানায় গিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইল অলি। নীলার্ক বলেই যাচ্ছিল, "আমাকে বল, কী হয়েছে? কেন এত রেগে গেছিস?" কোনও উত্তর নেই। মাথে এক-দু'বার শুধু মাথা নেড়ে বলে উঠেছিল, "তুমি আমাকে ভুলে যাও নীলুদা।"

হঠাৎ ভোলার কথা আসছে কেন, কিছুই বুঝতে পারছিল না নীলার্ক। তনয়ার দু'কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "ব্যাপার কী, বলবি তো! এরকম পাগলামি করছিস কেন?"

এর পরই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল তনয়া। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে যা বলেছিল, তা এরকম, তনয়া আজ অলিকে বলেছিল, "তোকে আজ কী সুন্দর লাগছে রে! স্টেজে তোর পাশে আমাকে কেউ দেখবেই না!" তার উত্তরে অলি বলে, "তোকেও যথেষ্ট সুন্দর লাগছে। আর কে দেখল, না দেখল, তা নিয়ে তো তোর মাথাব্যথা নেই। একজনের চোখে পড়ার জন্যই তো তুই সেজেছিস। আমাকে তেল মারছিস তার কথা ভেবেই। দাদাকে পেতে হলে বোনকে হাতে রাখতে হবে না! আমার গায়ে-গায়ে ঘুরিস সেই কারণে! আমি যখন বলছি! আমাকে বোকা ভাবিস না!" একথা শোনার পরই কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ফেরে এসেছে তনয়া। ঘটনা বলা শেষ করে কান্নার মাঝে হিক্কা তুলতে-তুলতে তনয়া বলেছিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু তার জন্য অলির পাশে ঘুরি না। ওকেও আমার ভীষণ ভাল লাগে। অলিই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। কিন্তু আমি এখন বুঝে গেছি, তোমাদের দু'জনকে পাওয়া আমার হবে না। তাই আমি চলে যাব এখান থেকে।"

প্রোপোজাল তো নয়, নিজের সিদ্ধান্তই জানিয়ে দিয়েছিল তনয়া। বেশ অবাক হয়ে নীলার্ক বলেছিল, "তুই যে আমাকে ভালবাসিস, কোনওদিন বলিসনি তো!"

"ছোটপিসি বারণ করেছে বলতে। পিসির বিয়েটা টিকল না ওই কারণেই। একে অপরকে ভালবাসি-টাসি বলার পর বিয়ে করেছিল, খুব তাড়াতাড়ি উবে গেল ভালবাসা।"

এর আর কোনও উত্তর দেয়নি নীলার্ক। তনয়া নাচার মতো মুডে ছিলও না। তাই বলেনি স্টেজে যেতে। নিজে ফিরে গিয়েছিল। অলি তখনই জানতে চেয়েছিল, "কী বললেন রূপসী? খুব নিন্দে করলেন তো আমার নামে?"

"কিছু বলেনি।" বলে অনুষ্ঠান পরিচালনায় মন দিয়েছিল নীলার্ক।

ক'দিন যাওয়ার পরই দেখা গেল আবার দুই বন্ধু একসঙ্গে ঘুরছে। আগের মতোই হাসি-ঠাট্টা, নীলার্কর লেখাপড়ায় ডিসটার্ব করতে আসা। বন্ধুকে যখন দাবার প্রেমিকা হিসেবে মেনেই নিয়েছে অলি, তনয়ার সাহস বেড়ে গেল। নীলার্কর ঘরে একাই ঢুকে পড়ত কখা বলতে। রাস্তাতেও পাকড়াও করত। দুই বন্ধু মিলে বায়না করত কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সিনেমা-থিয়েটার দেখানোর। সময়-সুযোগ করে নিয়ে যেত নীলার্ক। কখনও-কখনও অলি তনয়াকে একাই ছেড়ে দিত। এভাবেই দু'বাড়িতে, পাড়ার সবাই জেনে গেল নীলার্ক-তনয়ার সম্পর্ক। এটা এখন ওপেন সিক্রেট। সকলেই জানে, ওদের বিয়ে হবে। বিয়ে নিয়ে এখন তাড়া দিচ্ছে তনয়া। দিনক্ষণটা ঠান্ডা মাথায় ভাবার সুযোগ পায়নি নীলার্ক। এবার ভাবতে হবে। তনয়া এখনও এবাড়িতে এল না। ও-ও হয়তো নীলার্কর জেঠতুতো কাউর জন্য অপেক্ষা করছে। আড়াই বছর তনয়াকে দেখবে নীলার্ক। ফেসবুকে পোস্ট অথবা মেল করা ফোটো দেখেছে। ছবিতে তো আর দীর্ঘ অদর্শনের অভিমান ফুটে ওঠে না। ধরা পড়ে না মানুষের প্রকৃত সজলতা। এই ক'বছরে আরও নিশ্চয়ই সুন্দর হয়েছে তনয়া। এভাবে শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। নীলার্ক ঘুমোচ্ছে ভেবে নিজের ওলায় বাড়ির লোকও চুপাগপা। কথ নিশ্চন্ত হয়ে আছে সকালটা। বাড়ি ফেরার সময় চারপাশে পুজোর আবহ দেখে ঠিক করেছিল, বাড়িতে লাঞ্চেজ হেবে, একটু রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। গ্রামে কত জায়গায় যাওয়ার আছে তার, নাহারবিল, মার্টিন রেলের রাস্তা, চণ্ডীমন্দির, জমিদারবাড়ির পিছনে সরস্বতী নদীটা আরও শুকিয়ে গেল কি না, দেখতে হবে। যদিও জানত, বাড়িতে ঢুকেই বেরোতে গেলে মা চেঁচামেচি শুরু করে দিত। কিন্তু এই চুপচাপ পরিবেশটাও আর সহ্য হচ্ছে না। তাদের পাড়ায় একসময় সকাল থেকেই হইহই শুরু হয়ে যেত। কত হাঁকডাক! আজ আবার রোববার। এই দিনে তো কথাই নেই। এখনও অবধি আওয়াজ বলতে কিছু পাখির ডাক আর বাড়ি সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া রিকশার প্যাঁক প্যাঁক, সাইকেলের ঘন্টি। লস এঞ্জেলসে তার এলাকাটাও ভীষণ শান্ত। মাঝে-মাঝে গাড়ি ছুটে যাওয়ার সাঁ সাঁ আওয়াজ আর কখন-ও-কখন ন মকদের ঘন্টি ছুটে যায়। সেখানে হাওয়া চলে খুব, হাওয়ার শব্দ আছড়ে পড়ে দরজা-জানলায়। নিস্তব্ধতাটা কখনওই ভারী হয়ে যেতে পারে। প্রাণচঞ্চল নীলার্ককের এই পাড়া আজ কেন এত গুরুগম্ভীর লাগছে, কে জানে! হইহই না করাটা সত্যি মানুষের লক্ষণ। উত্তর দেশে কিংবা এদেশেরই বড় শহরে ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সের বাসিন্দারা সবাই কেমন চুপচাপ থাকে। এই গ্রামে কি সেই হাওয়া লাগল? লস এঞ্জেলসে গিয়ে চারজন ছাত্র মিলে প্রথম যে-অ্যাপার্টমেন্টে থাকত নীলার্ক, লাগোয়া ফ্ল্যাটটায় থাকতেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরছে নীলার্ক, দ্যাখে বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর ফ্ল্যাটের দরজায় পড়িয়ে কিছুক্ষণ লোকের ভিড়। এগিয়ে গিয়েছিল নীলার্ক। দরজায় পড়িয়ে দেখল, বৃদ্ধ শুয়ে আছেন। মারা গেছেন বলেই মনে হল। বৃদ্ধা পাশে বসে চোখ মুছছেন। ঘন-ঘন চোখ মুছতে-মুছতে হঠাৎ কী হল, চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। পরক্ষণেই 'সরি' বলে চুপ করে গেলেন। শোক যে এত বোবা হতে পারে, গ্রামে মানুষ হওয়া

নীলার্ক জানত না।

নাঃ! আর শুয়ে থাকা গেল না। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে নীলার্ক। একটা দোয়েল মিষ্টি সুরে শিস দিচ্ছে, জেঠুদের বাড়ির আমগাছ থেকে আসছে শব্দটা। জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় নীলার্ক, হাঁটার ফলে গায়ে পাতলা হয়েছে। পাখিটাকে এখনও দেখা যাচ্ছে না। চোখ টেনে নেয় জেঠুদের ছাদ, ফুলের সঙ্গে গামছা বাঁধা ফর্সা একটি মেয়ে পাঁচিলধারে দাঁড়িয়ে কাচা শাড়ির জল ঝাড়ছে, নিশ্চয়ই অভিদার বউ। বিয়ের ছবির সঙ্গে কোনও মিলই নেই। বিনা সাজে আরও সুন্দর লাগছে। তবে কেমন যেন বিষণ্ণতার প্রলেপ চেহারায়। যাদের উদাসীনও, কোথাও দৃষ্টি স্থির করছে না। করলে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা নীলার্ককে দেখতে পেত। এখন ছাদের তারে শাড়ি মেলছে। গামছা বাঁধা চুলের বিনুনি খুলে গেল। সদ্য স্নান সেরেছে বলেই গামছা বেঁধেছে মাথায়। স্নানের পরও বিষাদ ধুয়ে গেল না কেন? কিছু-কিছু মানুষকে অবশ্য বিষণ্ণ ভাবটা আরও সুন্দর করে তোলে। অভিদার বউ তাদেরই একজন।

বউদি চলে গেছে। তারে এসে বসল একটা কাক, পাশে বউদির মেলে দিয়ে যাওয়া কাপড়-জামা। দোয়েলটা ডাকা বন্ধ করেছে। কোথায় গিয়ে বসল, কে জানে!

"কী রে! তুই ঘুমোসনি! আমি তো দরজা-জানালা বন্ধ করতে এলাম, যাতে ঘুমটা ভালভাবে হয়।" বলতে-বলতে ঘরে ঢুকে এল মা।

নীলার্ক বলে, "বুর! আসছেই না ঘুম। কাঁহাতক শুয়ে থাকা যায়! জেঠুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। দিয়ে আসি সিফ্‌টগুলো। একটু আগে ওদের ছাদে অভিদার বউকে দেখলাম মনে হল। আলাপটা সেরে আসি। বউদিকে তো দারুণ দেখতে হয়েছে। সুন্দর, সফিসটিকেটেড-ও!"

"আর সুন্দর! তোমার ওই বউদির গুণের শেষ নেই। যে কালি মাখিয়েছে তোমাদের বংশে, একশো বছরেও উঠবে না। তুই যাস না ওখানে। আমরা সকলেই এখন তোর জেঠুর বাড়ি এড়িয়ে চলছি।"

মায়ের কথাগুলো শুনে মাথা পুরো গুলিয়ে গেল নীলার্কর। বিছানায় বসে পড়ে বলে, "কালি মাখিয়েছে, মানে? এই তো সেদিন বিয়ে হল! ব্যাপারটা কী হয়েছে, খুলে বলো!"

"ওসব কথা আমি মুখে আনতে পারব না। অলির কাছে শুনে নিস। দাঁড়া, ওকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি..." বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মা।

বড়সড় একটা গণ্ডগোল যে হয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে। এয়ারপোর্টে অভিদার এক্সপ্রেশন দেখেই মনে হয়েছিল, কোথাও একটা ছন্দ কেটেছে বাড়ির পরিবেশে। বিছানায় বসে থেকে জেঠুর বাড়ির ছাদের দিকে তাকায় নীলার্ক, ঝুলছে বউদির শাড়ি, আরও জামাকাপড়। বিরাট কিছু ঘটে গেছে বলে তো মনে হয়নি। কাপড় মেলার মতো স্বাভাবিক কাজকর্ম করছে। একটু বিষণ্ণ লাগছে শুধু। নীলার্ক ভেবেছিল, ওটা বুঝি সহজাত।

পায়ের শব্দ শুনে দরজার দিকে ঘাড় ফেরায় নীলার্ক। অলি এসেছে। নীলার্ক বলে, "অভিদার বউকে নিয়ে কী হয়েছে রে?"

পায়ে-পায়ে বিছানায় এসে বসল অলি। বলল, "সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড! আমাদের ফ্যামিলি এসব নোংরামির মধ্যে পড়বে, কেউ কোনও দিন ভাবেইনি। পরে তোকে সবই বলতাম, জেঠুর বাড়ি যাওয়ার জেদ করছিস শুনে ঘটনা জানতে এলাম।"

"ভাল করেছিস! এখন বল কী হয়েছে!"

"বলছি।" শুরু করে অলি।

দুই

ফাতনার দিকে ঠায় তাকিয়ে থেকে চুল এসে গিয়েছিল আদলার, পলক পড়ে যেতেই তাড়াতাড়ি চোখ খোলে, এ কী, ফাতনা তো পুতুলনাচ নাচছে! সঙ্গে-সঙ্গে আদলার নিখুঁত খ্যাঁচ! মাছ গাঁথায় সে একেবারে মাস্টার। মাছটা গাঁথল বটে, কিন্তু এমন টান মারছে ছিপে, যেন আদলার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে চলে যাবে! সম্পত্তি প্রায় কিছুই নেই আদলার। ছিপটাতে পর্যন্ত হুইল বসাতে পারেনি। এ মাছ না খেলিয়ে তোলা যাবে না। ছিপ ভেঙে দেবে। মাছ গাঁথা অবস্থায় ছিপ হাতে কুঁজো হয়ে পুকুরের পাড় ধরে হাঁটতে থাকে আদলা। খাঁড়াদের পুকুর, ওরা দেখে ফেললেই কেলো! এক্ষুনি এসে মাছ কেড়ে নেবে। ঝোপের আড়ালে বসে ছিপ ফেলেছিল আদলা। মাছটাই ওকে ঝোপ থেকে বের করে আনল।

নিস্তেজ হতে সময় লাগে, ছিপে টান এখন অনেক কম, খাঁড়াদের বাড়ি দিকে চোখ বুলিয়ে নিতে আদলা জলের প্রাণীকে পাড়ে তোলে। কালবৈশাখ, এক কেজির উপর তো হবেই। মাছ-ছিপ সুদ্ধ সুপারিগাছের আড়ালে চলে যায় আদলা। মনে চাপা আনন্দ। রুই, মৃগেল, হাঙেশাই পাওয়া যায়, কালবৈশাখ খুব কমা। বর ভালই পাবে।

মুখ থেকে বড়শি খুলে মাছটা গামছায় জড়িয়ে নেয় আদলা। গ্রামের ডাকাবুকোদের থেকে আড়াল করা হল এর কাজ। তারা যা দাম বলবে, তাই নিতে হবে। দাম না দেওয়ারও চান্স আছে। এক হাতে ছিপ, বগলে মাছ নিয়ে নদীদের জমিতে নেমে এল আদলা। মাছটা জোর ঝটকা মারছে। আদলা আকাশের দিকে তাকায়, বেলা অনেকটাই গড়িয়ে গেছে। কাদের বাড়িতে বেচবে মাছটা? লোকের তো খাওয়াদাওয়ার সময় হয়ে গেল। বেশির ভাগ বাড়িতেই ফ্রিজ আছে, কেটে রেখে দিতে অসুবিধে নেই। কিন্তু টাকা খেতে পারবে না বলে দামও দেবে না তেমন। কয়েকটা ভরবাড়ি বাছার চেষ্টা চালায় আদলা। প্রথমেই মাথায় আসে ঘোষাল ডাক্তরের কথা, আজ পর্যন্ত আদলা ও বাড়িতে যা নিয়ে গেছে, হাঁসের ডিম, নারকেল, সজনে ডাঁটা, মাছ, ওল, কচু... ডাক্তরবাবু ফেরাননি। উচিত দাম দিয়েছেন। মাঝে-মাঝে শুধু বলেন, "জানি, চুরির মাল। তবে লোভে পড়ে যাসনি আদলা। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যেভাবে চালাচ্ছিস, সলিয়ে যা।" ডাক্তরবাবুকে বিক্রি করার আর-একটা সুবিধে হচ্ছে, যাদের জমি-পুকুরের জিনিস, তারা ডাক্তরবাড়িতে গিয়ে বলবে না, 'আমাদের মাল ফেরত দিন।' ডাক্তরবাবুকে সবাই খুব মান্যি করে। সম্মানও দেয়ছে, ডাক্তরবাবুর বউকে নিয়ে। ঘোষালডাক্তর যদি বাড়ি না থাকেন, কত্তামা কিছুতেই বেশি দাম দেবেন না। অল্প টাকা হাতে ধরিয়ে বলবেন, "এত দাম কী করে চাস আদলা! কোনও ভরসাতো নেই তোর? তোর মা, তোর চিকিৎসায় ডাক্তরবাবু একটা টাকাও নেয় না! জিনিসগুলো তো বিনা পয়সায় দিয়ে যাওয়া উচিত!"

ন্যায্য কথা। আদলা অনেকবার ভেবেছে, ডাক্তরবাবুকে কিছু জিনিস ফ্রি-তে দেবে। দেওয়া হয়ে ওঠেনি। আসলে টাকার দরকার না পড়লে আদলা এটা-সেটা জোগাড় করতে বেরয় না। টাকার দরকার তার পড়েও না বড় একটা। মা ঘরে বসেও বাড়ি কাজ করে আর জমির সবজি বেচে সংসার চালায়। জমি অবশ্য খুবই কম। সংসারে মাত্র দু'জন, সে আর মা। সংসার বাড়তেই পারত, দু'জন থেকে তিনজন, চারজন, পাঁচজন... বিয়ে করতে রাজি হয়নি আদলা। বউ এসে যদি মাকে না দেখে! আদলার দাদা এবং ভাই মাকে দেখেনি। বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। আদলা রয়ে গেছে মায়ের সঙ্গে। মা বিয়ের কথা তুললেই আদলা দুই ভাইয়ের উদাহরণ দেয়। মাকে ভীষণ ভালবাসে আদলা। তাদের জন্য মা কত কষ্টই না করেছে! আদলাদের বাবা মারা গেছে ছেলে-মেয়ের জন্ম হওয়ার পরেই। বোন তো বাবাকে মনেই করতে পারে না। ঘেটে রোজগার করে বোনের বিয়ে দিয়েছে মা। বয়স হচ্ছে মায়ের, দেখাশোনার জন্য একজন কাউকে তো পাশে চাই। মা বলে, "তুই পাশে থাকিস কোথায়! চৌপর দিন তো টো টো করে ঘুরে বেড়াস!"

আদলা উত্তর দেয়, "খুব দূরে যাই না। একবার হবি পেড়ে দেখো, তক্ষুনি সামনে এসে হাজির হয়ে যাব।"

মা হাসে। আশকারার হাসি। সেই মা যখন বলে, "হাতে টাকা-পয়সা বাড়ন্ত। মাসটা কীভাবে চলবে বুঝতে পারছি না।" তখনই আদলা এটা-সেটা কুড়োতে বা চুরি করতে বেরিয়ে পড়ে। নয়তো বাঁক সময় দেউলপুর বাজারে, নবুবার লটারির দোকানে, চন্ডীমন্ডিরে, শীতলের চা দোকানে... আরও নানা জায়গায় ঘুরে, বসে কেটে যায়। রাতে মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমা। শান্তির জীবন। বউ-বাচ্চা থাকলে এত শান্তিতে কি থাকতে পারত আদলা? মনে অশান্তি শুরু হয় মায়ের হাতে টাকা না থাকলে। মায়ের মনমরা ভাব সে সহ্য করতে পারে না। আজ সকালেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বলেছে, "এবার তুই একটা কাজে ঢোক। এ মাসেও হাত ফাঁকা আমার। সামনে পুজো। তোর বোনের বাড়িতে জামা-কাপড় পাঠাতে হবে। কোনও কাজের বাড়িই এখনও পুজোর টাকা দেয়নি। দেবে হয়তো ষষ্ঠী-সপ্তমীর দিন। অত দেরি করে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠালে কি ভাল দেখায়?"

ব্যস, মন অস্থির হয়ে উঠল আদলার। সামনের ক'দিন রোজ কিছু করে টাকা তুলে দিতে হবে মায়ের হাতে। কোথাও চাকরি করা আদলার পোষাবে না। দু'-চারবার করে দেখেছে চা-দোকান, গ্রিল ফ্যাক্টরি, কোল্ড স্টোরেজ। সারাটা দিন এক জায়গায় আটকে থাকতে হয়। তারপর মালিকের গালিগালাজ তো আছেই, হাঁদা, পাগলা, ডামনা... আরও খারাপ-খারাপ কথা। কে বসে-বসে মুখঝামটা শোনে অত! বাইরে কত কী ঘটে যাচ্ছে! কিছুই দেখা হচ্ছে না! আদলার একার খাওয়া-পরার জন্য কতই বা খরচ? মা তো কাজকম্ম করছে। মাঝে-মাঝে একটু হেল্প করে দিলেই চলবে। এই মাছটার জন্য অনায়াসে দেড়শো টাকা পেতে পারে আদলা। সকালে বাজারে ঘোরে বলে সব জিনিসের দামগুলব তার জানা আছে। ডাক্তারবাবু বাড়ি থাকলে ন্যায্য দাম পাবে। না থাকলে কতটা কী জুটবে ঠিক নেই। মায়ের হাতে এখন দেড়শো টাকা দিতে পারলে অনেক। কাজের বাড়ির পনেরো-কুড়িদিনের মাইনে, চিন্তা কমবে মায়ের। ডাক্তারবাবু না থাকলে ওবাড়িতে মাছটা বেচবে না আদলা। তার পরের ভরবাড়ি কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই চ্যাটার্জিবাড়ির বড় ছেলের নাম মনে আসে, সমর চ্যাটার্জি। রইস লোক। মনাটাও উদার। ব্যাঙ্কে কাজ করত। ওবাড়িতে কিছু জিনিস নিয়ে গেলে কখনও ফেরত আসতে হয়নি। ঠিকঠাক দামও পেয়েছে আদলা। কিন্তু এখন একটা সমস্যা হয়েছে ওবাড়িতে। তাদের মন-মেজাজ ভাল নেই। দিন পনেরো আগে ওবাড়িতে দুটো নারকেল নিয়ে গিয়েছিল আদলা। পাছদুয়ারে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ল, কেউ বেরোল না। সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে ওরা ছুটকো-ছাটকা জিনিস কেনে না। সাহেবি বাংলোর মতো সামনেটা। সেখানে তালা নেই। বাড়িতে কেউ না-কেউ ছিলই, সাড়া দিচ্ছিল না। নারকেল বাড়ি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল আদলা, চেঁচিয়ে সেকথাও বলল। কেউ আসেনি।

ও বাড়ির বউকে নিয়ে জোর ফিসফিসানি চলছে পাড়ায়, বেপাড়ায়, বাজারে। এলাকার অনেকের মোবাইলেই নাকি বউটার গা-খোলা ফোটো আছে। কী করে এত লোকের মোবাইলে বউটার ফোটো দেখা যাচ্ছে, বুঝতে পারে না আদলা। মোবাইল জিনিসটাই তার কাছে খেলনার মতো লাগে। পুরো ফক্কিকারি ব্যাপার। টর্চ জ্বালানো যায়, গান শোনা, ফোটো তোলা, সবই হয়। এর মধ্যে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল চ্যাটার্জিবাড়ির নতুন বউয়ের খারাপ ফোটো। কেউ বলছে বুল্ ফিল্মিম। সেটা ঠিক কী জিনিস জানে না আদলা। লোকের থেকে শুনে যতটুকু বুঝতে পারে, ন্যাংটো সিনেমা। এলাকার কিছু লোক ছ্যা ছ্যা করছে, অনেকে মজা পাচ্ছে, হাসাহাসি করছে চ্যাংড়া ছেলেগুলো। আদলার মনে হচ্ছে, গোটাটাই কারও কারসাজি। চ্যাটার্জিবাড়ির কোনও শত্তুর এটা করেছে। পাড়ার লোকের মোবাইলে ছড়িয়ে দিয়েছে ওই নোংরা ফোটো। মোবাইলে অনেক কিছু করা যায়। ফোটো যদি খবরের কাগজে বেরত, তা হলে নাহয় কথা ছিল। আদলার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, ওসব ফোটো অভিজিতের বউয়ের। কারও সঙ্গে তর্কে যায় না আদলা, দূর থেকে আলোচনাগুলো চলতে দেখে। কাছে গিয়ে বলতে পারে না, মেয়েটা ওরকম নয় গো, ওর মধ্যে একটা লক্ষ্মীমন্ত ব্যাপার আছে। অভিজিতের বিয়ের পর আদলা যতবার ওদের বাড়ি গেছে, বউটা কিছু না কিছু খাইয়ে ছেড়েছে। যা নিয়ে গেছে, তাই কিনে নিয়েছে। আগে ওর শ্বশুর কিনত। আদলার বাড়ির খবর, কীভাবে চলে ওর, জানতে চেয়েছে বউটা। এবার একটা বিয়ে করে নাও, তোমার মাকে দেখবে। শেষ বয়সে তুমিও সেবা পাবে, পরামর্শ দিয়েছে অভিজিতের বউ। যে পরের জন্য এত ভাবে, সে কখনও খারাপ হতে পারে? এসব কথা এলাকার লোকেদের বলতে গেলে কানেই তুলবে না।

AMARBOI.COM

আদলাকে গ্রাহ্যি করে না কেউ। আদলা পাগলা বলে ডাকে।

নন্দীদের জমি, মামাপাড়া হয়ে খেলার মাঠ হবে আদলা এখন ঘোষাল ডাক্তারের বাড়ির পাশে। পাঁচিলের দরজা দিয়ে ঢুকবো ওটা দিয়েই বাড়ির লোক যাতায়াত করে, সামনে ডিসপেনসারি।

ছিপটা বাইরে রেখে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে আদলা। উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ে, "গিন্নি মা, মা গো!"

ঘোষাল ডাক্তারের বউ বেরিয়ে আসে বারান্দায়। বলে, "কী রে, কিছু এনেছিস নাকি?"

উত্তর এড়িয়ে আদলা বলল, "ডাক্তারবাবু নেই?"

"না। কলে গেছে। কেন?"

"ওই, মায়ের শরীরটা খারাপ। দেখতে এলাম ডাক্তারবাবু আছেন কি না।"

"তা, মাকে সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন? একেবারেই কি শয্যাশায়ী? তোর বগলে ওটা কি?"

শেষ কথাটা দরজার বাইরে এসে শুনল আদলা। আর ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে! পুরো লসে বিক্রি করতে হবে মাছটা! এখন সমর চ্যাটার্জি ভরসা।

ছুটির দিনে দু'বার বাবার মুখোমুখি হতেই হচ্ছে অভিজিৎকে, দুপুরে ও রাতে খাওয়ার সময়। অফিসের দিনে শুধু রাতে। বাবার সামনে এলেই ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে তার। হওয়ার কিন্তু কথা নয়। বাবা দেখাশোনা করে বিয়ে দিয়েছে, অভিজিৎ শুধু চোখের দেখায় আর দুটো কথা বলে পছন্দ করেছে পর্ণাকে। হিসেবমতো বাবার পছন্দে সায় দিয়েছে। বাবাও নিশ্চয়ই ছেলের সামনাসামনি হয়ে অপরাধবোধে ভোগে। বাবার হাঁটাচলায়, কথা বলায় যে-কম্যান্ডিং ভাবটা ছিল, তা প্রায় নিভু-নিভু। দেউলপুরের কোনও পুরনো লোক, যে একবছর বাবাকে দেখেনি, প্রবল ব্যক্তিত্বশালী সমর চ্যাটার্জিকে হঠাৎ দেখলে চিনতে পারবে না। বাবার কাঁধবুঁটো এখন ঝুলে গেছে, হাঁটে মাথা নিচু করে। মা মারা যাওয়ার পরও বাবার ব্যক্তিত্বে এত পরিবর্তন আসেনি। মাসখানেক একটু চুপচাপ ছিল, ধীরে-ধীরে ফিরে এসেছিল স্বমহিমায়। পর্ণার ঘটনাটায় অভিজিতের শরীরী ভঙ্গিতে নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন এসেছে, যা সহজে লোকের চোখে পড়ার কথা নয়। বিয়ের অনেক আগেই বিজনেসে পরপর ঝড় খেয়ে অভিজিৎ লোকজনের থেকে নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছিল, এই ব্যাপারটার পর এলাকার মানুষজনকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলছে। এখনও তার অফিসে কেজ্জাটা পৌঁছয়নি। কিন্তু পৌঁছতে কতক্ষণ! ঠান্ডা মাথায় ভাবলে, তাদের স্যামিলির বিপর্যয়ের পিছনে বাবার নির্বুদ্ধিতাকে দায়ী করা যায় না। অন্য যে-কোনও পিতা, পাত্রী পছন্দ করতে গিয়ে একইভাবে ঠকতে পারত। তবু বাবার মুখোমুখি হলেই অভিজিতের শরীর জুড়ে বিরক্তিকর অস্বস্তি শুরু হয়। বাবার স্নিগ্ধমা চেহারাটা সে সহ্য করতে পারে না। এই মুহূর্তে সহ্য করতে হচ্ছে। টেবিলে বাবার সামনে বসে দুপুরের খাওয়া সারছে অভিজিৎ। বাবা খুব চিমেতালে খাচ্ছে, কিছু বলবে মনে হচ্ছে। ঠিক তাই, ভাতে ডাল মাখতে-মাখতে বাবা বলে উঠল, "নীলুকে বললি কিছু?"

একটু সময় নিয়ে অভিজিৎ বলল, "না। বলার সুযোগ হয়নি।"

"এতটা রাস্তা একসঙ্গে এলি, ওকে এয়ারপোর্ট থেকে আনতে গেলি, ঘটনাটা আগে থেকে জানিয়ে রাখার জন্যেই তো? তাও বললি না কেন?"

নিরুত্তর থাকে অভিজিৎ। খাওয়া চালিয়ে যায়। বাবা যেটাকে ঘটনা বলছে, অভিজিতের কাছে সেটা চরম লজ্জা। প্রিয় ভাইটির মুখের সামনে লজ্জাটি অতিক্রম করতে পারেনি সে।

বাবা ফের বলে উঠল, "মা-বোনের থেকে ব্যাপারটা শুনবে নীলু, আসলে কী হয়েছে বুঝতেও পারবে না। এত দিন পর বাড়ি ফিরল বেচারা, মনটা খারাপ করে থাকবে। তুই যদি আগে থেকে সত্যি ঘটনাটা বলে রাখতিস, ও পাক্কুলড় হত না। ঠান্ডা মাথায় বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে পারত।"

"সত্যি ঘটনাটা ঠিক কী, তুমি জানো?"

"বউমা যা বলেছে, সেটুকুই জানি। ভিডিয়োর মেয়েটা ও নয়। অন্যের শরীরের উপর বউমার মুখটা বসানো হয়েছে। ওর কথা আমি অবিশ্বাসও করতে পারব না। দেড় বছর হল তোদের বিয়ে হয়েছে, আমাদের বাড়ির বউয়ের মধ্যে কোনও বেচাল দেখিনি। বিয়ের আগে একবার নয়, বারবার ওদের বাড়ি গিয়েছি। ভদ্র পরিবার, পাড়াটাও ভাল। বউমার সম্বন্ধে খোঁজখবর করে নেগেটিভ কিছু শুনিনি। তুইও তো এত দিন ঘর করলি, একবারও মনে হয়েছে, বউমা ওই চরিত্রের?"

সত্যিই মনে হয়নি অভিজিতের। প্রথম যে-দিন কথাটা কানে এল, পায়ের তলার মাটি ধসে গিয়েছিল যেন। প্রায় দৌড়ে চলে এসেছিল বাড়িতে। পর্ণাকে কোনও প্রশ্নই করে উঠতে পারেনি। স্বাভাবিক ছন্দে ঘর সংসারের কাজ সামলাচ্ছিল সে। ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা শুনে এল, মিথ্যে। তুচ্ছ রটনা মাত্র। ক'দিন পরেই মিলিয়ে যাবে। পর্ণার মধ্যে এমন কোনও লক্ষণ ছিল না, কখনও দেখা যায়নি, যে-সূত্রে জিজ্ঞেস করা যায়, তুমি কি কোনওদিন ব্লু ফিল্মে অভিনয় করেছ? জিজ্ঞেস অবশ্য পরে করতেই হয়েছে। কেন না ততদিনে কেজ্জাটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

"বউমা যদি সত্যিই ভিডিয়োর মেয়েটা হত, তা হলে কি থানায় কমপ্লেন করতে পারত? তুই তো ছিলি সঙ্গে?"

"থানায় জানিয়ে লাভ তো কিছু হয়নি। মুখ বন্ধ করা যায়নি গ্রামের লোকের। পুলিশ এখনও ধরতে পারেনি অপরাধীদের।"

"তুই আর-একবার থানায় যা।"

টেবিলের কাছে বাঁহি হাতে দাঁড়াল পর্ণা। বলল, "বাবা, তরকারিটা আর-একটু দিই?"

থালার উপর হাত নেড়ে বাবা বোঝাল নেবে না। পর্ণা এবার বলে, "তোমাকে দেব?"

Sarod Shubhechha

BIM HOLIDAYS

amazing THAILAND

'Amazing Thailand
A Women Friendly
Destination'

Registered Office : +91 3340036852 / 7044489924 / 7044489925 / 7044489926 / 7044489928

Kolkata Office :
391/131 Prince Anwar Shah Road,
Kolkata- 700 068
Ph. : 3340017918 / 7044489924

Saltlake Office :
GC 171, Ground Floor, Near GD Island,
Sector-3, Saltlake, Kolkata - 700 097
Ph. : 033 40016433 / 9836006888

Durgapur Office :
2/1 Uday Shankar Bithi, Non Company,
City Center, Durgapur- 713216
Ph. : 9836046363 / 9073386567/68/69

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দেখছ মাছ খাচ্ছি, এখন আবার তরকারি!" ঝাঁঝের গলায় বলল অভিজিৎ।

সরে গেল পর্ণা। রাগটা তরকারির জন্য নয়, আলোচনার মাঝে পর্ণার এসে দাঁড়ানোর কারণে। অভিজিৎকে এই ব্যাপারটা খুব অবাক করে, কেন্তাটা নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে যখন কথা হয়, পর্ণার আচরণে কোনও আড়ষ্টতা ধরা পড়ে না। তখন একবার মনে হয় এ মেয়ে নির্লজ্জ, এ সব কিছু করতে পারে। পরক্ষণেই উলটো যুক্তি মাথায় আসে, ও কোনও দোষ করেনি বলেই এত ফ্রি থাকতে পারছে। কোন সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করবে, ঠিক করতে পারে না অভিজিৎ।

বাবা বলতে শুরু করেছে, "নীলু তো এখনও দেখা করতে এল না। এসেছে সেই সকালে। ঘটনা শোনার পর আসতে হয়তো হিধা করছে। আমার সামনে সহজভাবে কথা বলতে পারবে না। আমারও অস্বস্তি হবে। বউমা যদি বাড়িতে না থাকত, এতটা সমস্যা হত না। অন্তরার খাতিরে নীলু রঞ্জনার প্রসঙ্গে যেতই না। আমিও ওর সঙ্গে নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারতাম। বউমা বাড়ি থাকলে সেটা পারব না।"

"তা হলে তুমি কী করতে বলছ?" জানতে চাইল অভিজিৎ। খাওয়া হয়ে গিয়েছে তার। বাবার মূল বক্তব্যটা বুঝে নিতে চাইছে।

"বউমাকে তুই ক'টা দিনের জন্য বাপের বাড়ি রেখে আয়। এখানকার লোকজনকে বলে দে বউকে তাড়িয়ে দিয়েছিস। আত্মীয়স্বজনদেরও একই কথা বলবি।"

"তাতে কী সুবিধে?"

"কত দিন পর নীলু ফিরল। আনন্দ করে পাড়ায় ঘুরবে, এর তার বাড়ি যাবে। অনেকেই এর সামনে বউমার কথা তুলবে। আমরা যেহেতু বউকে তাড়িয়ে দিয়েছি, খুব বেশি বিষ ঢালতে পারবে না ওর কানে। তেমন অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হবে না নীলুকে।"

প্ল্যানটা মন্দ নয়, সবে ভেবেছে অভিজিৎ, কিচেনের দরজায় এসে দাঁড়াল পর্ণা। বলল, "আমি যাব না ও বাড়ি। এ কথা আগেও বলেছি। ওরা খরচা করে বিয়ে দিয়েছে, ওদের দায়িত্ব শেষ।"

"টাকার কথা চিন্তা কোরো না বউমা। তোমার জন্য যা খরচ হবে, দিয়ে আসবে অভি। মাত্র দুটো মাস। নীলু ফিরে গেলেই তুমি চলে এসো।"

"একদিনের জন্যে হলেও, বাপের বাড়িতে আমি যাব না," সাফ জানিয়ে দিল পর্ণা।

চড়াং করে মাথায় রাগ উঠে গেল অভিজিতের। চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে পর্ণাকে বলে, "তা কেন যাবে! তোমার সমস্ত বন্ধনমের ভাগীদার হতে হবে আমাদের। যেহেতু বিয়ে করে এনেছি। এবার আমরা যদি তোমাকে ঘাড় ধরে বের দিই, কোথায় যাবে? নাকি সেরকম কোনও ব্যবস্থা করা আছে? আমাদের থেকে শুধু নোটের অপেক্ষা করছ। বলো, কত দিতে হবে?"

এমন সময় পাছদুয়ার থেকে ভেসে আসে আদলার হাঁক, "ও বউমা! লক্ষ্মীমা আমার! এসে দেখে যাও, বড় একটা কালবোস এনেছি তোমাদের জন্য।"

"দূর হ এখান থেকে। লাগবে না আমাদের।" চেঁচিয়ে বলে ওঠে অভিজিৎ।

পাছদুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা আদলার কানে লাগে ভর্ৎসনাটা। অভিজিৎ তাকে কখনও তুই করে কথা বলে না, এরকম চেঁচায়ও না সাধারণত। বউটার বদনামের কারণে বেচারির মাথাটা গেছে। ধাতানি গায়ে না মেখে আদলা ফের গলা তোলে, "ও অভিজিৎ, রাগ করছিস কেন ভাই! মায়ের সাইজটা একবার দ্যাখ। পুকুর থেকে সোজা তোদের বাড়ি চলে এসেছি। অন্য কোনও বাড়িতে যাইনি।"

"তুই যাবি, না মেরে বের করে দেব?" আবারও চিৎকার করে বলে ওঠে অভিজিৎ।

বাবা বলে, "আহা, ওর উপর রাগ করছিস কেন! বোস তোকে আর-একটা উপায় বলি।"

চেয়ারে বসতে-বসতে অভিজিৎ লক্ষ করল পর্ণা খিড়কির দরজার দিকে যাচ্ছে, তাড়িয়ে আসবে পাগলাটাকে।

বাবার সঙ্গে আলোচনা একটু গড়াতেই ফিরে এল পর্ণা। বলল, "বাবা, দেড়শো টাকা দিন তো।"

"কী হবে?"

"আদলা মাছটা ভালই এনেছে।"

"টেবিলে আমার পার্সটা আছে। ওখান থেকে নাও।"

পর্ণা বাবার ঘরে ঢুকে গেল। অদ্ভুত নির্বিকার থাকতে পারে মেয়েটা! যথেষ্ট বাজেভাবে খেঁচিয়ে ছিল অভিজিৎ, কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। বাবা প্রসঙ্গে ফেরে, মন দিয়ে শুনতে থাকে অভিজিৎ।

পিছন দরজার বাইরে আদলা কালবোসটা পর্ণার হাতে তুলে দিয়ে টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজল। বলল, "মাছটা জমিয়ে রেঁধো তো বউমা, অভিজিতের মাথাটা যাতে ঠান্ডা হয়। বাইরের লোকের কথায় কান দিতে বারণ করো ওকে। তোমার মতো বউ হয়েছে দেখে সবাই হিংসেতে পুড়ে মরছে।"

ঘাড় কাত করে ঘরে ঢোকে পর্ণা। ডাইনিং স্পেসে এসে খুশির হাসি সহ মাছটা তুলে স্বামী এবং শ্বশুরের উদ্দেশে বলে, "মাছটা কী বড় না! সত্তাতেই দিল। একেবারে টাটকা মাছ।"

"এত বড় মাছটা নিয়ে কী হবে? তিনটে তো মাত্র প্রাণী! বাবা রাতে মাছ খায় না," বলল অভিজিৎ।

পর্ণা বলে, "বাড়িতে মাছ নেই। কেউ বাজারে যাচ্ছে না। বিকেল বা সন্ধেতে যদি নীলু ঠাকুরপো এসে পড়ে, তাকে তো রাতে খেতে বলতে হবে। রাত্তি হয়ে গেলে কী রাঁধব তখন?" রান্নাঘরে ঢুকে গেল পর্ণা। ওর যাওয়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অভিজিৎ, কে বলবে এই মেয়েটাকে নিয়ে বাইরে ঢিঢি পড়ে গেছে। ওর চরিত্র নিয়ে রঙ্গ তামাশা করছে লোকে।

অভিজিৎ আর শ্বশুরমশাইয়ের খাওয়ার পর রান্নাঘরেই খেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছে পর্ণা। এখন ঘরে এসে শুয়েছে। এ ঘর তার এখন একার। যেদিন থেকে ভিডিয়ো ক্লিপিংস-এর খবরটা জেনেছে অভিজিৎ, এ ঘরে আসে না। অন্য ঘরে শোয়। এ বাড়িতে অনেকগুলো ঘর, বাড়ি ঘিরে জমিও অনেকটা। শেওড়াফুলির তিন কামরার স্যাঁতসেঁতে ভাড়াবাড়ি থেকে এসে নিজের শ্বশুরবাড়িতে রাজবাড়ি মনে হত পর্ণার। সে একা কব্রী দশ সেকেন্ডের একটা ভিডিয়ো ফুটেজ তার সমস্ত অহিকার কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিয়েছে। হানাবাড়ির মতো করে দিয়েছে এই বাড়িটাকেও। পর্ণার এখনও মনে হয়, সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে, এখনই ভেঙে যাবে ঘুম। আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে। এবাড়িতে লোক কম হলে কী হবে, চ্যাটার্জি পরিবার মনে অনেকজন। গায়ে-পিঠে থাকে সকলে। বিয়ে হয়ে যখন এল পর্ণা, অত লোক দেখে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল। শ্বশুরমশাই বলেছিলেন বটে "আমাদের বিরাট পরিবার। সকলকে নিয়ে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হবে কিন্তু।" পর্ণা তার আগে জেনেছে এদের হাঁড়ি আলাদা। তাই ভেবেছিল 'বিরাট পরিবার' কথাটা পুরনো দিনকে ভুলতে না পেরে বলেছেন শ্বশুরমশাই। যৌথ পরিবার তো একটা গর্বের ব্যাপার! এখানে এসে টের পেল শ্বশুরমশাইয়ের কথার যথার্থতা। হাঁড়ি আলাদা হলেও এরা সব একজোট হয়ে থাকে। জোটের খুঁটিটি হচ্ছেন অভিজিতের বাবা। সকলের আশ্রয়স্থল। পরিবারের যার যা অভিযোগ, সমস্যা, করণীয় সবকিছু জানতে হলে আসে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে। এই পরিবারের প্রথম বধূর হিসেবে পর্ণার আদর খাতির হয়েছিল খুব। বউ বরণের সময় রীতিমতো লাইন পড়ে গিয়েছিল। তেমনই কোনও উপলক্ষে পর্ণাকে যখন বাড়ির বড়দের প্রণাম করতে হয়, ব্যথা হয়ে যায় পিঠ। আর হবে না ব্যথা। ওই শারীরিক কষ্টটা এখন সুখস্মৃতি। মাসদুয়েক হল পরিবার বা পাড়ার কেউ আসে না এবাড়িতে। শ্বশুরমশাইও কারও কাছে যান না। মাঝে-মাঝে বেরোন, আগের মতো চণ্ডীমন্দিরের লাইব্রেরিতে যান বলে মনে হয় না, ওখানে একটা আড্ডা ছিল ওঁর। ওই আড্ডায় ভিডিয়োটার প্রসঙ্গ এসে পড়বেই, অপমানিত হবেন শ্বশুরমশাই। উনি এখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় বা কার কাছে যান, তা জানে না পর্ণা। জিজ্ঞাসা করার মুখও নেই তার। অভিজিতের যেহেতু অফিস থাকে, পাড়া-পরিবার এড়িয়ে থাকতে পারে। বাড়িতে এসেও বউ আর বাবাকে এড়িয়ে চলে। এত কিছুর কারণ একমাত্র পর্ণা। এবাড়ির খুঁটি টিকটিক আওয়াজে তাকে বলে, তুমিই দায়ী, তুমিই...

পর্ণা ভাল গেলে এরা রেহাই পাবে। কিন্তু কোথায় যাবে সে? এদের থেকে মাসোহারা নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকতে পারবে না, সে তো ভিক্ষার শামিল। বাপের বাড়ি গরিব, পাড়ায় কোনও দাপট নেই। এখানকার ঘটনা ও পাড়াতে পৌঁছবেই। এখানে যেমন লোকে বাইরে নিন্দেমন্দ করছে, শ্বশুরমশাইকে সম্ভ্রম করে বলে বাড়ি ঢুকে আসছে না। ওখানে কিন্তু আসবে। মা-বাবা-দাদা-বোন কেউ আটকাতে পারবে না। পর্ণার জন্য ইতিমধ্যে একটা বাড়ি অন্ধকারের দিকে চলে গেছে। আর একটা বাড়ি আলো নিভিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। লোকে ভাবতে পারে পর্ণা পক্ষপাতদুষ্ট, বাপের বাড়িকে রক্ষা করছে। তা কিন্তু নয়, ও বাড়িতে গেলে পর্ণা নিজেও বাঁচবে না। রটনার সঙ্গে-সঙ্গে ভিডিয়ো ক্লিপিংসটাও চলে যাবে বাপের বাড়ি পাড়ায়। পরিবেশ একেবারেই ভাল না। ভিডিয়োর গা-ঘোলা ছবি দেখে পর্ণাকে সস্তা মনে করবে লোকে। মহল্লার শয়তানগুলো দরদস্তুর করতে চলে আসতে পারে। ওরা যে কতটা হৃদয়হীন ভালমতোই জানে পর্ণা। তুলনায় এবাড়িতে সে অনেক নিরাপদ। কিন্তু মনে সব সময় একটা ভয় কাজ করে, এই বুঝি এরা ঘাড় ধরে বের করে দিল। আজকেও সেই হুমকি দিয়েছে অভিজিৎ। আগেও বেশ কয়েকবার বলেছে। ভাগ্যিস, এখনও বের করে দেয়নি। পর্ণা নিজের ভয়টাকে প্রকাশ করে না। তা হলে এরা তাকে দুর্বল ভাববে। প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে। যেন রটনারটা কোনও গুরুত্বই নেই। স্বাভাবিকতা অভিনয় করতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য হলেও মাঝে-মাঝে স্মরণ হয় নিজের বিপদের কথা। গত ক'দিন ধরে একটু বেশিই হচ্ছিল। ভয়-ভাবনার আবহের মধ্যে নতুন একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে, অভিজিতের কাকার ছেলে আসছে বিদেশ থেকে। বিয়েতে সে ছিল না, আসতে পারেনি। এ পরিবারের সকলে খুব আক্ষেপ করছিল। প্রায়শই কানে আসছিল, 'নীলু থাকলে এই করত, সেই করত। এটা করতে তিত না।' পর্ণা টের পাচ্ছিল, চ্যাটার্জি পরিবার কারুকাজ করা সোনার আংটি, নীলু নামক রত্নটা বিহনে অনুপস্থিত। অভিজিতের কাছে নীলুর অনেক গল্প শুনেছে পর্ণা। ভাইয়ের কথা বলতে গেলেই গর্বে ওর চোখমুখ অনারকম হয়ে যেত। নীলুর বেশ কিছু ফোটো পর্ণা দেখেছে, বিভিন্ন বয়সের। কখনও গুরুজনের কোলে, একটু বড় হয়ে বাগানে, বারান্দায়। অভিজিতের সঙ্গে ছবি আছে। এখানকার ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনে ডিগ্রি নেওয়ার ফোটো... সব মিলিয়ে টিপিকাল লেখাপড়ায় ভাল ছেলেগুলোর মতোই দেখতে লেগেছিল নীলুকে। আজ ছাদে কাপড় মেলতে গিয়ে পর্ণা একবার নীলুর ঘরের জানালার দিকে তাকিয়েছিল। অভিজিৎ রিপোর্ট থেকে নিয়ে এসেছে ভাইকে। নীলুকে জানালার সামনে দেখে অদ্ভুত একটা শান্তির ছোঁয়া লেগেছিল পর্ণার মনে। না, ছেলেটা সত্যি বেশ অন্যরকম! নব্যসন্ন্যাসীর মতো দেখতে। এতটাই বেমানান নীলু, পর্ণা যে তাকে দেখছে, দেখা থামাতে পারছিল না, ঘেন্নাও করেনি। শেষমেশ নীলু তাকে দেখেছিল কি না, জানে না পর্ণা।

নিজেকে একপ্রকার জোর করে পাটিদের ধার থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল। নীলুকে দেখার পর থেকেই মনের দমঘাণা ভাবটা একটু আলগা হয়েছে পর্ণার। মনে হয়েছে, ছেলেটা পড়াশোনা জগতের বাসিন্দা। বিদেশে থেকেছে এতদিন, পাড়ার নোংরা রটনায় প্রভাবিত হবে না। অভিজিতের থেকে শুনেছে নীলু বরাবরই পাড়ার পাঁচজন ছেলের থেকে আলাদা। লেখাপড়ায় যেমন তুখোড় তেমনই খুব মিশুকে। পাড়ার সব ভাল কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত। কালচারাল ব্যাপারগুলোয় মূল উদ্যোগ ছিল ওরই। পাড়ার যেসব গিন্নি নিজেদের নাচ-গান-অভিনয়ের দক্ষতা চাপা দিয়ে সংসারের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে রয়েছে, তাদের বের করে মহড়ায় নিয়ে যেত। পাড়ার ছোট-ছোট স্টুডেন্টদা সময়ে-অসময়ে পড়া দেখাতে চলে গেলে বিরক্ত হত না। যে-ছেলে এই

More than 100 years of Educational Excellence

National High Schools

Wishes a Happy Festive Season to all

Facilities • Well equipped library • ICR (Interactive classroom) • Computer lab • Maths Lab
• In house Medical Facilities • Counselling Cell • One touch academics- track your child

National High School (Boys)
42/1, Hazra Road Kolkata - 700019
Ph : 83369 35290/033-24755596 /24742916
Email : nhsboys@gmail.com

National High School For Girls
164, Sarat Bose Road Kolkata - 700029
Ph : 83369 35291/033-24640327 /24645211
Email : nhgirls@cal3.vsnl.net.in

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্রের, সে নিশ্চয়ই বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন বউদিকে দেখতে চলে আসবে। পর্ণাকে নিয়ে রটনাটা মা-বোন-বাবার থেকে জানার পরও আসতে দ্বিধা করবে না। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলবে, 'কই গো বউদি, দেখা করতে এলাম। বিয়ের সময় আসতে পারিনি, সরি...' একই সঙ্গে পর্ণা এটাও জানে, যা আশা করছে, সেটা হওয়ার নয়। সে আসলে ডুবন্ত মানুষের মতো খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইছে। নীলু আসবে ধরে নিয়ে বাছাই করে শাড়ি পরেছে, মাছ কিনে রাখল। আসলে এ সবই নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। নীলু এতক্ষণ ধরে তার সম্বন্ধে যা শুনেছে, নিশ্চয়ই ঘেন্না তৈরি হয়েছে বউদির উপর। ভাবছে, কেন যে আপদটা হুটহাট চ্যাটার্জি পরিবারে। যত উদার মনেরই হোক নীলু, আদতে তো একজন সমাজ-সংসারে জড়ানো মানুষ, ভগবান নয়। পর্ণাকে নিয়ে যা ঘটছে বাইরে, পাড়ার অনেকের ফোনেই যে-দৃশ্য ধরা আছে তাকে অগ্রাহ্য করা ভারী কঠিন! নীলুর সঙ্গে যার বিয়ে হবে, তনয়া, কেচ্ছা রটার আগে পর্ণার কাছে প্রায়ই চলে আসত। গল্প করত কত! ওদের কীভাবে প্রেম হয়েছে, বলেছে সব। ক'দিন পর পর্ণা তো ওর জা হবে, বন্ধুত্বটা পাতিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যেদিন থানায় কমপ্লেন করে পর্ণা অভিজিতের সঙ্গে রিকশায় চেপে ফিরছে, তনয়ার সঙ্গে দেখা হল মুখোমুখি, ও ছিল সাইকেলে। পর্ণা ওকে দেখে হাসতে গেল, ঘেন্নায় মুখ সরিয়ে নিয়েছিল তনয়া। মেয়েটাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, বড় হয়েছে ভদ্রবাড়িতে। বিয়ে হবে জলার ছেলের সঙ্গে। হবু শ্বশুরবাড়িকে যদি কেউ কালিমালিপ্ত করে, তার উপর ঘেন্না, রাগ দুটোই হবে। পর্ণারও তো নিজের প্রতি ঘেন্না হয়েছিল তার আগে একদিন। যেদিন সন্ধেতে অভিজিৎ এসে বলেছিল ভিডিয়ো ফুটেজের কথা, পর্ণার মনে হয়েছিল বোধ হয় গুজব। তবু মনে কু তো ডাকছিলই। ব্যাপারটা পরখ করার জন্যে পরের দিন সকালে কেনাকাটার ছুতোয় বাইরে বেরিয়েছিল। স্কুল মোড়ের কাছে যখন এসে পড়েছে, পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া দুটো স্কুল স্টুডেন্টের একজন সহপাঠীকে বলে উঠেছিল "দ্যাখ, দ্যাখ সেই বউদিটা! মোবাইলে যার ভিডিয়োটা দেখিয়েছিলাম তোকে।"

ফুলপ্যান্টের ইউনিফর্ম ছেলেদুটোর। এগারো-বারো ক্লাসে পড়ে। লজ্জায় যখন মরে যেতে ইচ্ছে করছিল পর্ণার। টের পাচ্ছিল, তার পিঠে সেঁটে রয়েছে দু'জোড়া লোভী চোখ। যে-দৃষ্টিতে ক'দিন আগেও ছিল কৈশোরের সারল্য। নিজের প্রতি ঘেন্নায় গা পাক দিয়ে উঠছিল পর্ণার। মোড় থেকে রিক্শা ধরে সোজা বাড়ি আসে। বেসিনে গিয়ে ওয়াক তুলেছিল বেশ কয়েকবার। বমি হল না। গা-পাক-দেওয়া ভাবটা এখনও রয়ে গিয়েছে শরীরে।

"ঘুমিয়ে পড়লে?"

অভিজিতের গলা! ধড়মড় করে উঠে বসে পর্ণা। অভিজিৎ এ ঘরে এল কেন হঠাৎ? মারধর করবে নাকি? আজই বের করে দেবে বাড়ি থেকে? মনে হচ্ছে সেরকম কিছু ঘটবে না। খাটের কোনায় এসে বসল অভিজিৎ। বলল, "তুমি তো বাপের বাড়িতে যাবে না। বাবা বলছে এখান থেকে দূরে কোনও ভাড়াবাড়িতে গিয়ে থাকতে। খরচটা বাবা দেবে।"

"আমি একা ভাড়াবাড়িতে গিয়ে থাকব? একা একটা বউকে দেবে ভাড়া?"

"মাঝে-মাঝে হয়তো একা থাকতে হবে। বাড়িটা ভাড়া নেব দু'জনে থাকব বলে।"

"যে-দিনগুলোয় দুজনেই এখানে থাকব না, বাবার দেখাশোনা কে করবে?"

মুখটা বিকৃত হল অভিজিতের, বলল, "তোমার মতো দেখাশোনা অবশ্য কেউই করতে পারবে না। তবে তুমি না-থাকলেই বাবা সবচেয়ে ভাল থাকবে। সে যাক, এখন কথা হচ্ছে, চাইলেই তো আর ভাড়াবাড়ি পাওয়া যায় না। খুঁজতে হবে। এদিকে বাবা চাইছে কালকের মধ্যেই তোমায় দূরে পাঠিয়ে দিতে। তুমি এখানে থাকা মানেই নীলুর অসুবিধে। পাড়ার লোকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেই বিব্রত হতে হবে ওকে। তোমাকে সরিয়ে দিয়ে বাবা লোকজনকে বলবে, বউমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, ছেলে তাকে বাপের বাড়ি দিয়ে আসতে গেছে।"

একটানা কথা বলে থামল অভিজিৎ। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে শুনে যাচ্ছে পর্ণা। এরা কি তাকে একেবারে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করছে? শ্বশুরমশাইকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে মানতে ইচ্ছে করছে না। একবছরের উপর তো দেখছে মানুষটাকে। অভিজিতের পক্ষেও ঠান্ডা মাথায় খারাপ কাজ করা বোধ হয় সম্ভব নয়। ফের বলতে শুরু করল অভিজিৎ, "আমি ভাবছি, কাল তোমাকে নিয়ে কলকাতার কোনও হোটেলে গিয়ে উঠি। ওখান থেকে ভাড়ার বাড়ি খুঁজব। কলকাতায় বাড়ি নিলে অফিস যাতায়াতে অনেক সুবিধে।"

"হোটেলে গিয়ে থাকতে হবে!" বিস্ময়, উৎকণ্ঠা মিশিয়ে বলে ওঠে পর্ণা।

অভিজিৎ বাজিয়ে ওঠে, "কেন? হোটেলে গিয়ে থাকতে অসুবিধে কোথায়? কোনও দিন থাকোনি বুঝি?"

থাকেছি। বেড়াতে গিয়ে। কিন্তু কলকাতার হোটেল কেমন হবে..."

"হোটেল যেমন হয়। তেমনই হবে। কলকাতাতেও লোকে বাইরে থেকে বেড়াতে আসে।" কথা শেষ করেই অভিজিৎ কপাল কুঁচকে জানতে চাইল, "কলকাতার হোটেলে এত ভয় কেন তোমার?"

ভিডিয়োটার সূত্রে সন্দেহ করছে অভিজিৎ। পর্ণা নিজের আশঙ্কাটা নষ্ট করার জন্য বলে, "হোটেলের ঘরে আমাকে একা রেখে তুমি তো অফিসে যাবে, ভয় লাগবে না আমার? তার চেয়ে কোনও ধর্মশালা বা আশ্রম-টাশ্রমের ব্যবস্থা করো।"

"সে-সব খুঁজতেও সময় লাগবে। ব্যাগপত্তর গুছিয়ে নাও। কাল ভোর-ভোর বেরিয়ে গিয়ে শিয়ালদার ট্রেন ধরব। স্টেশন থেকে দু'পা গেলেই প্রচুর হোটেল।"

"দুটো দিন গুয়েট করে দেখা যায় না? এমন তো হতেই পারে নীলুঠাকুরপো পাড়ার রটনাকে পাত্তাই দিল না। দিব্যি এ বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগল।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হতে পারে, তবে শুধু নীলু তো নয়, সামনে পুজো আসছে। গতবার তো দেখলে ভক্তীমন্দিরের পুজোয় বাবা কতটা ইনভল্ভ থাকে। তুমি থাকলে সেটা পারবে না এবার। 'বউমাকে বিদেয় দিয়েছি' বললে বাবাকে পাড়ার লোকের ট্যারাবেঁকা প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না।"

অভিজিতের যুক্তিতে কোনও ফাঁক নেই। পর্ণা বুঝতে পারে, ঠাঁইহারা তাকে হতেই হবে। অসহায় গলায় বলে, "তোমরা আমাকে ভিরকালের মতো বিদায় করে দিচ্ছ না তো?"

"দিতে পারলে তো ভালই হত। কিন্তু তুমি তো ছাড়বার পাত্রী নও। যেখানেই রেখে আসি, ঘুরেফিরে চলে আসবে এখানে। এরকম ভদ্র ভালমানুষের বাড়ি তো আর পাবে না। তা ছাড়া এখানকার ধানায় কমপ্লেন করেছ তুমি, পুলিশের যদি কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে, তারা এবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তখন যদি তোমার হদিশ না দিতে পারি, আমরাও পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে যাব।"

শরীরের ভিতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল পর্ণার, অভিজিতের কথার জন্য নয়, সম্পূর্ণ যান্ত্রিক কারণে। বালিশ চাপা মোবাইলটা ভাইব্রেট করছে। সেই কলটা নয় তো? অভিজিৎ যেহেতু বিছানাতেই, টের পেল কম্পন। বলল, "কী হল, ফোনটা ধরো!"

"দরকার নেই। বাড়ির ফোন।"

"বাড়ির ফোন ধরছ না কেন?"

"ধরে কী হবে, জানতে চাইবে ভাল আছি কি না? কতবার মিথ্যে করে বলব, ভাল আছি। আর ইচ্ছে করে না।"

"ফোনটা না-দেখে কী করে বুঝছ বাড়ির ফোন? ভাইব্রেট মোডটা রেখেছ কেন? দেখি ফোনটা।"

"আমার দিকে তো আজকাল ঘুরেও তাকাও না, ফোনটা দেখে কী করবে! মন থেকে যখন ঝেড়ে ফেলেছ আমাকে পুরোটাই বাদ দিয়ে দাও।"

কথার মাঝে ভাইব্রেশন থেমে গিয়েছে ফোনের। অভিজিতের রাগ কমেনি। বলে ওঠে, "কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে ব্যাপারটা আড়াল করার চেষ্টা কোরো না। মোবাইলটা দাও, দেখি কে ফোন করেছে?"

হাত বাড়িয়েছিল অভিজিৎ, পর্ণার ফোনটা দেওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই দেখে, ঝুঁকে পড়ে বালিশের নিচ থেকে নিতে গেল। দপ করে জ্বলে উঠল পর্ণা। হাত দিয়ে অভিজিতের অগ্রগমন রুখে বলে উঠল, "খবরদার আমার ফোনে হাত দেবে না।"

তিন

দীর্ঘ চুম্ব অনেকটা পুকুরের ডুব সাঁতারের মতো। প্রকৃতির গোপন নিবিড় গন্ধে নেশা লেগে যায়, এদিকে দমবন্ধ হয়ে হাঁকপাঁক করে শরীর। নীলার্কর এখন সেই অবস্থা। বোধ হয় দু'মিনিট হতে চলল তনয়া বক্ষলগ্ন হয়ে ঠোঁটে-ঠোঁট রেখেছে, এখনও ছাড়ার নাম নেই। নীলার্কর কেমন ঘোর লেগে গেছে। শ্বাস কি নিচ্ছে সে? নয় তো এতক্ষণ টিকে আছে কী করে! তবে এবার একটু হাঁসফাঁস লাগছে।

অবশেষে ছাড়ল তনয়া। ওর সিঙ্গ ওষ্ঠ একটু বেশিই ফোলাফোলা লাগছে। নিচু করে আছে মাথা। নীলার্ক বলল, "গিনেস-এ নাম তোলার ইচ্ছে ছিল নাকি? এতক্ষণ ধরে..."

"আড়াই বছরের তেষ্টা মেটালাম।"

"এইটুকুতেই মিটে গেল! তেষ্টা তার মানে খুব একটা পায়নি বোঝা যাচ্ছে।"

"বোঝাচ্ছি তোমাকে। দু'মাস তো আছ এখন।" বলে চেয়ারের দিকে এগোল তনয়া। যেখানে একটু আগে বসেছিল নীলার্ক। তনয়া দোতলার ঘরে ঢুকতেই উঠে এসেছিল চেয়ার ছেড়ে। কোনও কথা না বলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তনয়া। ঠোঁট রেখেছিল নীলার্কর ঠোঁটে। দু'দিন হয়ে গেল নীলার্ক বাড়ি ফিরেছে, তনয়ার সঙ্গে এই প্রথম দেখা। চেয়ারে বসে টেবিলে নীলার্কর খুলে রাখা ল্যাপটপের ডালা নামিয়ে দিল তনয়া। নীলার্ক গিয়ে বসল নিজের বিছানায়, জানালা দিয়ে আসা সকালের ঝলমলে রোদের পাশে। এখনও ধাতস্থ হয়নি তনয়া, নিমেষহারা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে নীলার্কর মুখের দিকে। গলা খাঁকি দিয়ে নীলার্ককেই শুরু করতে হয়, "চমক দেওয়ার ঝোঁকটা এখনও যায়নি দেখছি, আমি ফিরেছি, তুমি বসে রইলে মাসির বাড়ি গিয়ে। অদ্ভুত!"

"বসে রইলাম মানে কেন গিয়েছিলাম তুমি জানো না?" বলার পর নিজেকে সংশোধন করে তনয়া বলল, "অবশ্য তুমি কী করে জানবে, গত দু'দিনে একবারও আমার বাড়িতে যাওয়ার সময় পাওনি। আমারও মুড ছিল না অলিকে ফোন করে মাসির শরীর খারাপের খবরটা জানানোর। তুমি ফোন করছ না, সে জন্যও রাগ হচ্ছিল।"

"যেদিন ফিরেছি, সন্ধেবেলাই গিয়েছিলাম তোমাদের বাড়ি। কাকিমা বললেন তুমি মাসির বাড়ি গেছ। কেন গেছ, বলেননি।"

চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে তনয়ার। বলে, "তুমি এসেছিলে, মা তো বলেন না একবারও। মাসির শরীর খারাপ সেইটাই বা কেন বলল বাবা? মায়ের মাথাটা গেছে। সারাক্ষণ যে কী চিন্তা করছে মা-ই জানে!"

ঘেমে গিয়ে ফের তনয়া বলে উঠল, "আচ্ছা, হঠাৎ মাসির বাড়ি কী দরকারে গেলাম, তুমি কেন জিজ্ঞেস করলে না মাকে? এত দিন পর তুমি ফিরলে আর আমি নেই, এটা তো স্বাভাবিক ঘটনা নয়। তোমার ভাবা উচিত ছিল, নিশ্চয়ই এর পিছনে বিশেষ কারণ আছে।"

"ভাবলাম, আমার সঙ্গে মজা করার জন্য পালিয়েছ। আগেও তো এরকম করেছ বহুবার। তা ছাড়া কেন গেছ, জিজ্ঞাসা করার তেমন সুযোগও পাইনি। কাকিমা দরজা খুলে বললেন, 'ও তুমি! আজই ফিরলে, তাই না? তনয়া তো বাড়ি নেই। ডোমজুড়ে মাসির বাড়ি গেছে।'"

"সে কী, মা তোমাকে ঘরে বসতেও বলেনি!" বিস্ময় প্রকাশ করার পর তনয়া বলল, "বসতে বললে, মায়ের সঙ্গে তোমার আর-একটু কথা হলে, বোধ হয় মনে রাখতে পারত তুমি এসেছিলে। মায়ের যে ঠিক কী

HOLY CHILD PUBLICATION

এখন সব বই-ই রঙিন

ঈশপের গল্পসমগ্র -৮০
পঞ্চতন্ত্রের গল্প -৮০
কথামালার গল্প -৮০
ফেয়ারী টেলস্-৮০
(বাংলা ও ইংরেজি একত্রে)
সম্পাদনা-দেবাশিস দে
সচিত্র সহস্র এক আরব্য রজনী-৬০০
জুলেভার্ন রচনা সমগ্র-২০০
শার্লক হোমস রচনা সমগ্র-১৮০
নির্বাচিত আগাথা ক্রিস্টি-১৫০
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর-৪৫
শিক্ষক কুলের রবি রাখাকৃষ্ণণ-৬০
বিজ্ঞানীদের ছেলেবেলা (জীবন কথা)-৭০
বিপ্লবীদের ছেলেবেলা (জীবন কথা)-৭০
বিদ্রোহী কবি নজরুল-৫০
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ-৫০
মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন-৫০
ভারতরত্ন ড. আম্বেদকর-৫০
সুভাষ থেকে নেতাজি (গোপন ফাইল সমেত) -২০০
শাশ্বত ভাষণ সমগ্র -২০০
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক গল্প-২০০
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প-২০০
শেক্সপীয়ার রচনা সমগ্র-২০০
জিমকরবেট রচনা সমগ্র-২০০
বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র(১,২)-১৮০
সম্পাদনা ও ভাষান্তর পৃথ্বিরাজ সেন

টুনটুনির বই (রঙিন সংস্করণ)-৮০
সব সেরা হাসির গল্প (রঙিন সংস্করণ)-৮০
ঠাকুরমার ঝুলি (রঙিন সংস্করণ)-৮০
ছোটোদের আবৃত্তির কবিতা-৮০
ছোঃ আবৃত্তি ছড়া ও কবিতা-৮০
আবৃত্তির শ্রেষ্ঠ কবিতা-১০০
আমার শৈশব স্মরণিকা-১৫০
বিবাহ স্মরণিকা-১৬০
বাজল ছুটির ঘন্টা-৮০
বাজল ছুটির সানাই-৬০
জানা-অজানা বিবেকানন্দ-১৫০
শতবর্ষের বাছাই মামার গল্প- ১০০
ছোটোদের রবীন্দ্রনাথ-৫০
ভূতের সেরা গল্প-৬০
হাসির সেরা গল্প-৫০
সব সেরা শিকারের গল্প-৫০
শরৎ রচনাবলি(১,২,৩)-১৮০
দুশো বছরের শ্রেষ্ঠ গল্প-১৫০
সম্পাদনা-কালিদাস ভদ্র
কিশোর নাটক সংগ্রহ-১৫০
ছোঃ রামায়ণ (রঙিন সংস্করণ)-৮০
ছোঃ মহাভারত (রঙিন সংস্করণ)-৯০
দেড়শো বছরের শ্রেষ্ঠ গল্প-১৮০
সম্পাদনা-উত্থানপদ বিজলী

Everyman's Concise Dictionary (E-B) 230
Everyman's Medium Dictionary (B-E) 180
Everyman's Medium Dictionary (E-B) 160

বাংলা অভিধান -২৫০
ত্রি-ভাষা অভিধান-২৫০
(হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি)
Edited by- Deb-O' Brien

ভালো কাগজে ঝকঝকে ছাপা

HOLY CHILD PUBLICATION
S.B.S.PUBLICATION
30/1,32,Beniatola Lane, Kol-09
Ph:-8648851504/8648882977

হচ্ছে বুঝতে পারছি না। ইদানীং অনেক কিছুই মনে রাখতে পারছে না। অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে প্রায়ই। ডাক্তার দেখাতে হবে নাকি?"

তনয়ার দুশ্চিন্তা কাটাতে অন্য প্রশ্নে যায় নীলার্ক। জিজ্ঞেস করে, "মাসির কী হয়েছিল?"

"আর বোলো না, তোমার আসার আগের দিন বিকেলে মেসোর ফোন, 'একবার আসতে পারবি তনু? তোর মাসি বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এখন ঠিক আছে। ডাক্তার দেখে ইসিজি করে বলেছে হার্টে কোনও প্রবলেম পাওয়া যাচ্ছে না। ওষুধ দিয়েছে। ওয়াচ করতে বলেছে আমাকে। বেশ নার্ভাস ফিল করছি।... সব শুনে দৌড়ালাম। মাসিদের ছেলেমেয়ে নেই। আমাকে সন্তানের মতো ভালবাসে। ছোটবেলায় এইজন্যে খুব আনন্দ হত, বড় হয়ে ঠ্যালা বুঝছি।"

"এখন ঠিক আছেন তো?"

"হ্যাঁ, তবে কেন অজ্ঞান হয়েছিল বোঝা যায়নি। অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে। হস্টার ইসিজি, ইকো কার্ডিয়োগ্রাম, সবই। যাক ওসব ছাড়ো। এখানে এসে আর কার-কার বাড়ি গেলে?"

উত্তর দিতে যাচ্ছিল নীলার্ক, ফের তনয়া বলে ওঠে, "তোমার জেঠুর কাছে গিয়েছিলে নাকি?"

দৃষ্টি নামিয়ে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে নীলার্ক। তনয়া বলল, "না গিয়ে ভালই করেছ। ওদের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিত।"

"কেন একথা বলছ?"

"বউটার নামে যা রটেছে, তারপরও যদি ওবাড়ি যাও, লোকে ভাববে তুমি ওর কাজটাকে সাপোর্ট করছ।"

"ভিডিয়ো ফুটেজটা তুমি দেখেছ?"

"না, অত খারাপ রুচি আমার নয়।"

"তা হলে কী করে বুঝছ ওটা বউদিরই, কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সুপার ইম্পোজ নয়?"

"হাতে খাতিরে ধরে নিলাম তাই হয়েছে। কিন্তু এত দিন এ গ্রামের অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে ও ঘটনা ঘটেনি কেন? পর্ণাকউদির নিশ্চয়ই আগে কোনও ব্যাড অ্যাসোসিয়েশন ছিল। তাদের সঙ্গে গন্ডগোলের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে।"

তনয়ার কথার উত্তরে চুপ করে থাকে নীলার্ক। আলোচনাটা চালাতে ভাল লাগছে না। অথচ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবাড়ির জন্য। নীলার্ক জানালার দিকে ঘাড় ফেরায়, গাছের ফাঁকে বিয়ে জেঠুদের ফাঁকা ছাদটা দেখা যাচ্ছে। গত দু'দিন বউদি কাপড় শুকো দিতে আসেনি। ছাদে ওগাঁও কি বন্ধ করে দিল জেঠুরা? বাইরে বেরোনো তো সম্ভবই নয়, লোকে যা তা বলবে, বিচ্ছিরিভাবে তাকাবে। দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে নীলার্ক বলে, "এগুজ্যাক্টলি বউদির সঙ্গে কী হয়েছে, কেন এমন খারাপ ব্যাপার ঘটল, সেটা জানা তো দরকার। তার আগেই বাড়িয়াকে বয়কট করে দিলে, অবিচার করা হবে। বিশেষ করে আমাদের বাবা-কাকাদের এই ডিসিশন নেওয়া উচিত হয়নি। ছেড়ে এই পরিবারের গার্ডিয়ান। সবার বিপদে-আপদে পাশে থেকেছে সবসময়। তার সমস্যায় আমরা ছুটে যাব না কেন?"

বোঝানোর সুরে তনয়া বলে, "এটা তো আর-পাঁচটা সমস্যার মতো নয়। খুবই নোংরা বিষয়। কারও ইচ্ছে করবে না এসব ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যেতে।"

"ন্যাখো, কোনও মানুষের পাশে যদি দাঁড়াতে চাও, তা হলে তার সমস্যার প্রব্যারভেন্ড করা উচিত নয়। তাকে বিপদ থেকে বাঁচানোটা আগে দরকার।" একটু থেমে ফের নীলার্ক বলে, "আমি জেঠুর বাড়ি যেতে চাইছি, বাড়ির সকলে বারণ করছে। মা আবার দিব্যি-টিব্যি দিয়ে বসল। ওসব তো মানি না, কিন্তু জোর করে যদি যেতে চাই, মা ব্যাপারটা সেন্টিমেন্টালি নিয়ে নেবে। ভাববে, মাকে কম ভালবাসি।"

চুপ করে গেল নীলার্ক। মুখে বিষণ্ণভাবটা ঘন হয়ে উঠছে। তনয়া বুঝতে পারছে, বড় অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়েছে বেচারা। জেঠু-অন্ত প্রাণ ছিল সে। পাড়ার কোনও পুজো বা ক্লাবচারাল ফাংশনে টাকা টান পড়লেই নীলুদা, মানে নীলার্ক বলত, চিন্তা করিস না। জেঠুর থেকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেব। কখনও বাবার কথা বলত না।

ফের বলতে শুরু করেছে নীলার্ক, "মা আবার এখন একটা নতুন বায়না ধরেছে। বলছে, আমি যে ক'দিন দেশে আছি, তার মধ্যে অন্য কোথাও ফ্ল্যাট কিনতে। তারপর থেকে মা-বাবা-অলি ওখানেই থাকবে। তালা মারা থাকবে এবাড়ি।"

"এটা আবার বেশি-বেশি। ঘটনাটা ঘটেছে তোমার জেঠুর বাড়ি ঘিরে। তোমরা এলাকা ছাড়বে কেন?"

"ওর পিছনে যুক্তি আছে মায়ের। অলির বিয়ে নিয়ে ভাবছে। দেখাশোনার সময় রটনা যদি পাত্রপক্ষর কানে যায়, অলিকে পছন্দ করেও পিছিয়ে যাবে। অলরেডি একপক্ষ গেছে বলেই মায়ের বিশ্বাস। কথা খানিকটা এগিয়েছিল। হঠাৎই ওরা আর যোগাযোগ করছে না।" আবারও ঘম মেরে গেল নীলার্ক। তনয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে নীলার্কর গা ঘেঁষে বসল। ওর হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। বলল, "অত চিন্তা কোরো না তো। সব ঠিক হয়ে যাবে। এই দু'দিন কি ঘরে বসেই কাটাবে? আমাদের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যাওনি?"

"গিয়েছিলাম। যেদিন এলাম, পরের দিন জয়ের সাইকেল নিয়ে গেলাম মার্টিনরেলের রাস্তার পাশের মাঠটায়। একই রকম আছে সব। উঁচু রাস্তাটার ধারে সার দিয়ে কাশফুল। তোমার কথা খুব মনে হচ্ছিল।"

"ভাগ্যিস!" প্রসন্নভাবে কটাক্ষ করল তনয়া।

হাসি ফুটল নীলার্কর ঠোঁটে। বলল, "ওখান থেকে ফিরে সাইকেল রাখতে গেলাম পুরনো বাড়িতে। সেনকা বলল, সাইকেলটা তোর কাছেই রেখে দে। যখন মনে হবে এদিক-ওদিক যাবি। জয় আমার সাইকেলে বাজ চালিয়ে নেবে। কাল আর গ্রাম ঘোরা হয়নি, ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলাম। প্রফেসর পিকি-র বার্থডে ছিল। ফেসবুকে মেসেজ দিয়েছিলেন, 'শুনলাম তুই দেশে ফিরছিস। খোলো তারিখে মনে করে চলে আসিস। ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পিনে ট্রিট দেব।' আমার খুব প্রিয় স্যার, না গিয়ে..."

কথা কেড়ে নিয়ে তনয়া বলল, "ও ভাল কথা, ফেসবুক বলতে মনে পড়ল। ট্র্যান্সফোর্ড বেড়াতে যাওয়ার যে-ছবিগুলো তোমার ওয়ালে দিয়েছ, তোমার পাশে ওই রোগা মেয়েটা কে গো?"

"রোগা!" বলে একটু থামল নীলার্ক, মনে করে নিয়ে বলল, "ও তো সুতপাদি! ওর কাছেই তো গিয়েছিলাম।"

"আরে বাবা, সুতপাদিকে আমি অনেকদিন আগে থেকেই চিনি। যাবপুরে তোমার সিনিয়ার। সুতপাদি ছাড়াও ফোটোতে আর-একটা মেয়ে ছিল আর দুটো ছেলে। ট্র্যান্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে বেশ ক'টা গ্রুপ ছবি আছে তোমাদের।"

নীলার্ক বলতে যাচ্ছিল মেয়েটার নাম, তার আগেই তনয়া ভেবে নিয়ে বলল, "হেয়েস, তুমি ও কেঃ ওই ইউনিভার্সিটিতেই পড়েঃ ট্র্যান্সফোর্ড বেড়াতে যাওয়ার গল্প যখন বলেছিলে, ওর কথা তো বলোনি!"

"স্বীইপে কি অত ডিটেল গল্প করা যায়! তা মেয়েটার নাম জানলে কী করে?"

"না জানার তো কিছু নেই। ফোটোটা সুতপাদি তোমাকে ট্যাগ করেছিল, তোমাদের দু'জনের নাম ছাড়া লেখা ছিল থ্রি আদার্স। সেখানে ট্যাগ করে পোলাম বাকি তিনজনের। দু'জন যেহেতু ছেলে, তুষা নামটা ওই মেয়েটারই। কিছু নাম থাকে খট করে মনে পড়ে না, এটা সেরকমই।"

"হঠাৎ তুষার ব্যাপারে জানতে চাইছ কেন?" বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে নীলার্ক।

"সব ক'টা ফোটোতেই তোমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা। মুখে কী হাসি! ওর প্রোফাইল খুলে ফেললাম। দেখলাম মেয়েটা মদ, সিগারেট সবই খায়। হট ড্রেস পরে। ফোটোতে সেক্সি পোজ দেয়। দেখতেও তো সুন্দরী। তাই একটু ভয় হচ্ছিল।"

"যদি আমি ফেঁসে যাই?"

সাহিত্যম্-এর নতুন বই।

শিবশংকর ভারতী

কি করা উচিত কি নয়? ২০০

বাংলার প্রাচীন কালীকথা ৫০০

ভারতের মন্দিরে মন্দিরে ৩০০

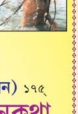

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবি ও সে

(রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রেমজীবন) ১৭৫

ঠাকুরবাড়ির গোপনকথা

(দ্বারকানাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ) ১৫০

রস (জীবন স্বাদে-গন্ধে-বর্ণ-স্বাদে ভরপুর) ২০০

ইমরানের দেশে ১০০ অন্য থেকে ভিন্ন ১৫০

ঈশ্বরকে ছুঁয়ে ১০০ রোববার লাইব্রেরী

খোলা ১ ২ প্রতিটি ১২৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতি উপন্যাস সমগ্র ১ম, ২য় প্রতিটি ৪০০

বিভূতি গল্প সমগ্র ১ম, ২য় প্রতিটি ২৫০

অসীমপদ চক্রবর্তী কাকাতুয়া (রহস্য উপন্যাস) ১৫০

বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত বিবেকানন্দ বন্দনা ২০০

সাহিত্যম্-এর নতুন বই।

বুদ্ধদেব গুহ'র

কুমুর চিঠি ১০০

পাঁচ মিশেলি ১৫০ স্পর্শ স্বর ১৫০

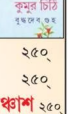

স্বামী বেদানন্দ রচিত

গীতা-ভাবনামৃত ১ ২৫০

গীতা-ভাবনামৃত ২ ২৫০

সুচিত্রা ভট্টাচার্য নির্বাচিত পঞ্চাশ ২৫০

সমরেশ মজুমদারের

গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি ১ ২ ৩ প্রতিটি ২০০

অনীশ দেব সম্পাদিত

খুনির রং ২০০

জীবনানন্দ দাশ

কাব্য সমগ্র ২৫০

শংকর

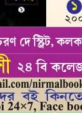

ভ্রমণ সমগ্র ১ ২০০ ২ ৩০০

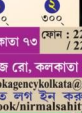

ভ্রমণ সমগ্র ৩

সাহিত্যম ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ ফোন : 2241-9238 / 2241-4003

নির্মল বুক এজেন্সী ২৪ বি কলেজ রো, কলকাতা ৯

ই-মেল nirmalsahityam@gmail.com/nirmalbookagencykolkata@gmail.com

অনলাইনে আমাদের বই কিনতে লগ ইন করুন।

nirmalsahityam.com/boi 24×7, Face book/nirmalsahityam.com

আমেরিকায় আমাদের একমাত্র পরিবেশক মুক্তধারা, নিউইয়র্ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা উপর-নিচ করল তনয়া। নীলার্ক বলে, "তুইা আইআইটি পাস আউট। গোমড়ামুখে পড়াশোনা করে না, বিন্দাস থাকে। আমেরিকায় গুরুত্ব বিন্দাস মুওইই থাকা ভাল। আত্মীয়-পরিজনের থেকে দূরে থাকার জন্য চট করে ডিপ্রেশন গ্রাস করে। আর হট ড্রেসের কথা বলছ, আমেরিকায় গরমের জায়গাগুলোতে কিছু লোকজন আদৌ কিছু পরে আছে কি না, তোমাকে খুঁজে দেখতে হবে।"

"ধেৎ!" বলে নীলার্কর পিঠে আদরের চড় কষায় তনয়া।

নীলার্ক হাসছে। হাসি থামিয়ে বলে, "আচ্ছা, তুমি তো সাইকেলে এসেছ, তাই না?"

"হ্যাঁ, কেন বলো তো?"

"আমার কাছে জয়ের সাইকেলটা আছে। চলো, দু'জনে মিলে নাহারবিলে যাই। এখনও যাওয়া হয়নি।"

"তোমাদের বাড়িতে আসাছি, বলে আসিনি মাকে। তাই বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। মায়ের ওষুধ কিনতে বাজারে আসছিলাম, ঠিক করেছিলাম তোমাকেই আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। যেহেতু এখানে আসার পর থেকে একটাও ফোন করোনি। প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেল, তোমাদের গলিটা যেন টেনে নিল আমাকে। এখানে তো এসে শুনছি, তুমি গিয়েছিলে আমাদের বাড়ি।"

"কাকিমাকে ফোন করে বলে দাও, ফিরতে দেরি হবে। আমার সঙ্গে আছ।"

"আর মায়ের ওষুধটা কে নিয়ে যাবে শুনি? খাওয়ার টাইম হয়ে গিয়েছে। খেতে গিয়ে বলল, 'যাঃ, ফুরিয়ে গিয়েছে। এক্ষুনি নিয়ে আয়। প্রেশারের ওষুধ টাইমে খাওয়া উচিত। আর হ্যাঁ, নাহারবিল শুধু আমি-তুমি মিলে যেতে পারব না। দলবল নিয়ে যেতে হবে।"

"কেন?"

"পরিবেশ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। জলাগুলোর ঢোকার রাস্তায় সকাল-বিকেল মদ খাওয়া চলছে। বাইক বা সাইকেলে আসে ছেলেগুলো। প্লাস্টিকের পাউচে ওখানে মদ বিক্রি হয়। চল্লু না কী, কি বলে! প্রেমিক-প্রেমিকারা ওদিকে ঘুরতে গেলে ভীষণ উত্ত্যক্ত করে ওরা। টাকাপয়সা চায়, নোংরা কথা বলে। আজকাল আর কাপ্‌লে কাপ্‌লে নাহারবিলে যায় না।"

"সে কী, এত খারাপ হয়ে গেছে জায়গাটা! লাস্টবার যখন এসেছিলাম আমরা দু'জন তো অনেকক্ষণ নাহারবিলে কাটিয়েছি। তখন তো এসব চোখে পড়েনি।"

"তখন হয়তো ছিল না। তবে সেটা আড়াই বছর আগে। মাঝে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তা ছাড়া আমরা গেছিলাম অনেক সকাল-সকাল। তবে এবারও যাব, তোমার গাড়ি চেপে। আমি ছাড়াও আরও দু'জনকে সঙ্গে নেব। গাড়ি আর দলবল দেখলে ওরা ঝামেলা করার সাহস পাবে না।"

"নাহারবিলে যেতে গেলে এত গার্ড নিয়ে যেতে হবে!" বলে চুপ করে গেল নীলার্ক। ফের বলল, "আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল ওই জলা অঞ্চলটা। কতরকম খেপামি করেছি! মাদুর-বই-খাতা নিয়ে সাইকেলে চেপে চলে যেতাম ওখানকার মাঠে। কেউ ডিসটার্ব করার নেই। চারপাশে শুধু মাছের ভেড়ি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকটা চালাঘরে থাকে জেলেদের পরিবার।"

"ওখানে বসে বেশ ক'টা কবিতা লিখেছিলে। পরে পড়িয়েছ আমাকে।"

"ওই বয়সে অনেকেই কবিতা লেখে। ওগুলো যে কিছু হয়নি আমিও জানি। বিলের পাশে মাঠে বসে ফিজিক্সও পড়েছি, অঙ্ক করেছি। অদ্ভুত একটা ফিলিং হত। কানেকশন তৈরি হত প্রকৃতির সঙ্গে। গোটা পৃথিবীটাকে নিজের ঘর-বাড়ি মনে হত। বিলের মাছরাঙা, বক, অন্যান্য পাখিদের যেমন স্থায়ী বাসা নেই, আমি যেন ওদেরই মতো। বিনেশে বসে এগুলোই তো মিস করি। ওখানে এখন যাওয়া যাবে না?"

"খুব বাবা, যাওয়া যাবে না কে বলল! তুমি একা যেতেই পারো। তবে মাঠে বসে লেখাপড়া শুরু করে দিলে মুশকিল। ছেলেগুলোর কাছে কৈফিয়ত দিতে হতে পারে।" হতাশা মেশানো হাসি হাসে নীলার্ক। তনয়ার গলা পাশ থেকে নেমে মেঝেয় দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়। নীলার্ক দু'কাঁধে নিজের দু'হাত রেখে তনয়া বলে, "এরকম মুড অফ করে থাকলে চলবে না কিন্তু। কতদিন পর দেখা হল, কোথায় হাসি-মজা করব, তা নয়। যত সব সিরিয়াস কথাবার্তা।" নীলার্ক কাঁধ থেকে হাত দুটো তুলে নিয়ে বলে, "আচ্ছা, শোনো না। আজ সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে একবার এসো। বাবা অফিস থেকে ফিরবে তারপর।"

"কেন? কাকাবাবু আসার সঙ্গে আমার যাওয়ার কী সম্পর্ক?"

"আমাদের বিয়ের কথাটা তুলতে হবে না? নিজের বাড়িতে বলেছ?"

মাথা নেড়ে 'বলেনি' বোঝাল নীলার্ক। বলল, "এখন কী করে বলব! শুনলে তো অলির জন্য দেখাশোনা চলছে। ওর ব্যাপারটা ফাইনাল হয়ে যাক। তারপর কথা বলা যাবে। বাড়িতে বিবাহযোগ্য বোন থাকতে কোন মুখে নিজের বিয়ের কথা তুলি? অলির বিয়েটা তো আগে দিতে হবে।" ঠোঁটের কোণে হাসি রেখে কথা শেষ করল নীলার্ক। তনয়া বলল, "যাঃ বাবা! অলি তো আমাকে বলেছে দাদার বিয়েতে ঘুটিয়ে আনন্দ করে তারপর নিজে বিয়ে করবে। শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে আনন্দ ঠিক জমবে না। বরটা সং-এর মতো পাশে থাকবে। পরিস্থিতি হঠাৎ পাল্টে গেল কেন?"

ঘর চোখে নীলার্কর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তনয়া। নীলার্ক বলল, "পরিস্থিতি তোমরা নিজেদের মতো তৈরি করেছ। তোমাদের কথা শুনে তো বড়রা চলবে না। বিয়ের বয়স হয়ে যাওয়া মেয়েকে পাত্রস্থ করে, ছেলের বিয়ে নিয়ে ভাববে।"

খোলা দরজায় 'ঠকঠক'। তারপর অলির গলা, "আসতে পারি?"

নীলার্ক থেকে পিছিয়ে এসে ফের চেয়ারটায় বসল তনয়া। অলি ভেতরে ঢোকে। হাতের ট্রেতে তিনটে ধোঁয়া ওঠা কাপ। তনয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "অনেক বকেছিস। এবার একটু চা খা।"

তনয়া গম্ভীরমুখে ট্রে থেকে একটা কাপ তুলে নিল। বলল, "তোর দাদা কী সব উলটোপালটা বকছে। বলছে তোর বিয়ের পর আমাদেরটা হবে। আইবুড়ো বোন বাড়িতে থাকতে ও বিয়ে করবে না।"

দাদাকে চা দিয়ে নিজে ছিলে অলি। বিছানায় বসে বলে, "ছাড় তো দাদার কথা। আমার এখনও পাত্রই পাওয়া যায়নি। তোরেদ তো সব ঠিক হয়ে বসে আছে। ডেটটা ফিক্স কর।"

চা খাওয়ার ফাঁকে তনয়া বলে, "সেই জন্যই তো তোর দাদাকে সন্ধেবেলা আমাদের বাড়ি যেতে বলছি। প্রাইমারি একটা আলোচনা করুক আমার মা-বাবার সঙ্গে।"

"আলোচনা তো হবে দু'পক্ষের মা-বাবার সঙ্গে। দাদা বলবে কোন সময় বিয়েটা করবে। পরের বার আসবে কবে নাদাদা।" বলল অলি।

পরপর দু'ঢোঁক চা খেল তনয়া। একটু চুপ করে থেকে বলল, "একটা প্রবলেম হয়েছে, জানিস। কিছুদিন আগেও মা-বাবা বিয়ের ব্যাপারে খুব তাড়া দিচ্ছিল। বলছিল, এমএস তো হয়ে গেল। এবার যা পড়াশোনা করার, ওদেশে গিয়েই করো। বিয়েটা সেরে নাও। আমি বলেছিলাম, ঠিক আছে, নীলার্ক আসার পর ওবাড়িতে গিয়ে তোমরা কথা বলো। আমি একে যা বলার বলে রেখেছি। পরে আর-একদিন বাড়িতে বিয়ের কথা উঠতে, বাবা দেখছি উলটো সুর গাইছে। বলছে, পোস্ট ডক্টরেট তো চাকরি নয়। নীলু চাকরি করলে বিয়ে করিস।"

"ঠিকই তো বলেছেন। হিসেব মতো আমি তো এখনও স্টুডেন্ট। ছাত্রাবস্থায় কেউ বিয়ে করে?" মজা পাওয়া হাসিসহ বলল নীলার্ক।

তনয়া রাগের গলায় বলল, "হেসো না। আমার মনে হয় বাবাকে ভুলভাল কেউ কিছু বুঝিয়েছে। অথবা আমার অত দূরে চলে যাওয়াটা বাবা-মা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। একমাত্র সন্তান তো। ভাবছে, পোস্ট ডক করার পর তুমি আমার টানে ভারতে এসে কোনও ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করবে। তাই যদি হয়ও, সে তো এখনও তিন-চার বছরের ব্যাপার। আমি বাবা অত দিন ওয়েট করতে পারব না। দূরে থাকাটা এত দিন অনেক কষ্ট করে সহ্য করে যাচ্ছি।"

AMARBOI.COM

"তোমাদের বাড়িতে গিয়ে আমি এগ্‌জ্যাক্টলি বলবটা কী?"

"এটা-সেটা গল্প করার ফাঁকে জানিয়ে দেবে তুমি এখন রেডি। গোস্ট ডন করাকালীন কীরকম পয়সাকড়ি পাবে, সেটাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে দেবে। বাবার হয়তো ঠিক ধারণা নেই। রিসার্চ ওরিয়েন্টেড প্রফেসারিয়ে সুযোগ-সুবিধে ওদেশেই বেশি। যদি পরে মনে হয় দেশে ফিরে আসব, পড়াশোনার জন্য ইউনিভার্সিটির অভাব হবে না। মানে আমি বলতে চাইছি..."

কথা কেড়ে নিয়ে অলি বলে ওঠে, "বাদার ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল সেটা ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে আসবে, তাই তো?"

"একদম ঠিক। আর বিয়ের কথা তোলাতে বাবা-মা বুঝে যাবে এরা আর আমাদের কথা শুনবে না। বিয়ে না দিলে নিজেরাই করে নেবে।"

"বার বিয়ের কথা হচ্ছে রে?" বলে ঘরে এল নীলার্ক-অলির মা অলকা। অলি তনয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, "বল, কার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে?"

লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিয়েছে তনয়া। অলকা বলে, "হ্যাঁ রে তনয়া, হাত খালি কেন? চাট দিস্‌ফুটা এখনও দেয়নি নীলু!"

"ও, তাই তো! আসলে এসে থেকে বকে যাচ্ছে, ফিস্‌টের কথা ভুলেই গেছি..." বলে নীলার্ক বিছানা থেকে নামে। আলমারিতে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। বোনকে বলে, "হ্যাঁ রে, ফিস্‌টো তোর কাছে, না আমি রেখেছি?"

"আমিই তো রাখতে দিলাম তোকে। বললাম, তুই হাতে করে দিলে ভাল লাগবে ওর!"

অলির কথার মাঝে ফোন বেজে উঠেছিল তনয়ার। এখন কথা বলছে ও প্রান্তের সঙ্গে, "অলির বাড়িতে আছি... হ্যাঁ, কেনা হয়েছে ওষুধ।... এতক্ষণ যখন যাওনি আধঘণ্টা দেরি হলে কিছু হবে না।... এই তো যাচ্ছি। উঠে পড়েছি..." বলে ফোন কাটল তনয়া। ঘরের অন্যদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "ওষুধ এখনও কেনাই হয়নি। যাই তাড়াতাড়ি। পরে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে গেল ফিস্‌টো নেব।"

ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল তনয়া। গত এভাবে হুটহাট করে চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল অলকা। কেন যেন একটু খারাপ লাগল তার মনে।

চার

বিষ্টু সাঁতরা ভগবানের সঙ্গে কথা বলছে। মহাদেবতলায় দাঁড়িয়ে অনেকেই ভগবানের সঙ্গে কথা বলে, কান-নাক মোলে। বিস্টু সাঁতরার মতো গলা তুলে কেউ কথা বলে না। আলগাই অনেক দিনের ইচ্ছে, বিষ্টু সাঁতরা ভগবানের সঙ্গে কী কথা বলে, সেটা শোনার। অন্যদেরটাও শুনতে ইচ্ছে করে, যেহেতু তারা বিড়বিড় করে, বোঝার উপায় নেই।

বিশাল বটগাছ, তার তলায় ছোটবড় গোল-গোল অনেক পাথর। এটাই দেউলপুরের মহাদেবতলা। যাদের তাড়া থাকে সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পেন্নাম ঠোকে।

বিষ্টু দুখি মানুষ, দুটো চাকরি গেছে। প্রথম বউটা পালিয়ে গেছে তিনটে বাচ্চা রেখে। পরের বউটা অসুস্থ। বিয়ের পর থেকেই বিছানায় প্রায় শোয়া। বিষ্টু কিন্তু ভেঙে পড়েনি। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া করাচ্ছে, ডাক্তার দেখাতে বউকে নিয়ে যায় কলকাতায়। রোজগার করে ট্রেনে হকারি। রুমাল, মোজা বিক্রি করে। হকারির মাল বোঝাই কবিবাগান, পায়ের চটি পাশে রেখে বিষ্টু জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহাদেবতলায়। কথা বলে অনেকক্ষণ ধরে, একটু থামে ফের বলে। বিষ্টুর সঙ্গে ভগবানের ঠিক কীরকম বোঝাপড়া জানার খুব ইচ্ছে হয় আলগার। ভগবানের সঙ্গে সটি না থাকলে, এত বিশ্বাস কেউ করে সোজা থাকে বিষ্টুর গ্রামের কারও কাছে নিজের দুঃখের কথা গেয়ে বেড়ায় না। সাহায্য চায় না এক পয়সা। এর আগে একবার কথাগুলো শোনার জন্য বিষ্টুর পিছনে টুপটি করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল আলগা। কী করে যেন টের পেয়ে না-ঘুরে বেমক্কা হাত চালিয়ে দিয়েছিল বিষ্টু। বহুত লেগেছিল আলগার। আজ তাই সে ভীষণ সতর্ক। রাস্তার ওপারে ভঁত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিষ্টু খানিকটা করে কথা বলে, চোখ বুজে কপালে জোড়হাত ঠেকাচ্ছে। ঠিক এরকম একটা সময়ে পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

আর-এক দফা কথা বলে জোড়হাত তুলছে বিষ্টু, আলগা এগোতে যাবে, কী করে এসে পড়ল মোটরবাইক। 'আই বাপ!' বলে ছিটকে পিছিয়ে এল আলগা। একটা নয়, পরপর চারটে বাইক। ধুলো উড়ছে, তার মধ্যে দিয়ে আলগা লক্ষ করল বিষ্টু চৌহাতে-চৌহাতে দৌড়ে যাচ্ছে বাইকগুলোর দিকে। কী হল ব্যাপারটা? আলগাও দৌড়য়। খানিকটা যেতেই স্পষ্ট হল বাইক চাপা চ্যাংড়া ছেলেগুলোর বদমাইশি। প্রথম বাইকের পিছনে বসা ছেলেটা বিষ্টুর হকারির ব্যাগটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে কিছুটা দূর গিয়ে ফেলে দিয়েছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে মোজা, রুমাল। বিষ্টু এখন গাল পাড়তে-পাড়তে সেগুলো কুড়োচ্ছে। আলগাও এগিয়ে গিয়ে কুড়োতে থাকে। বিষ্টুকে বলে, "ছেলেগুলো বড্ড বেড়েছে বিষ্টুদা! এদের শায়েস্তা করা দরকার।"

"কে করবে? এদের মাথায় পার্টির নেতা আছে। আমি কারুর সাতে-পাঁচে থাকি না, আমার পিছনেও লাগছে।"

"তোমার তো আজ ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলা কমপ্লিট হল না।"

"আর কথা বলা! মানুষ একটু শান্তিমনে ভগবানকে ডাকবে, তা পর্যন্ত হতে দেবে না বেয়াদপগুলো।" বলার পর ব্যাগটা নেড়েচেড়ে সাইজ করে নিল বিষ্টু। জিনিসপত্র সব ঢোকানো হয়ে গেছে। ফের বলে, "কে জানে আজ দিনটা কেমন যাবে! প্রথমেই বাধা!"

ব্যাগ কাঁধে তুলে মহাদেবতলার দিকে ঘুরল বিষ্টু। একহাত দিয়ে দু'-তিনবার পেন্নাম ঠুকে রওনা হল কাজে। আলগা ফেরার পথ ধরল। চোখ গেল মহাদেবতলায়। মনে হল, গাছটা মনখারাপ করে তাকিয়ে রয়েছে বিষ্টুর যাওয়ার দিকে। শীতলের দোকানে বসে এখন চা খাবে আলগা। পাড়ার কিছু লোককে পেয়ে যাবে, বলবে এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাটা। দিন-দুনিয়ার ছেলেগুলোর সৌরাত্ম বাড়ছে। ভাবনা শেষ করে মাথা তুলল আলগা দেখল, একটা সাহেব মতো ছেলে এগিয়ে আসছে। কারে? নীলু না? মনের কথাটা মুখ ফুটে বেরিয়ে গেল আলগার। মৃদু হেসে নীলার্ক বলল, "কেমন আছ, আলগাদা?"

অনেকদিন পর বাদ সম্বোধনটা শুনল আলগা। কানে যেন আরামের সুড়সুড়ি লাগল। মনটা তবু ভাঙা হল না। বলল, "কী করে ভাল থাকব বলো? পাড়ার ছেলেগুলোর এমন বাড় বেড়েছে, একটু আগে..."

"দেখেছি।"

"দেখেছ? তা হলেই বলো। কোনও মানে হয়! বিষ্টুর মতো ঠান্ডা লোক, কারও সঙ্গেই ঝামেলায় যায় না। তার পিছনেও লাগছে।" কথা বলতে-বলতে নীলার্কর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছে আলগা। নীলার্ক জানতে চায়, "সবক'টা ছেলেই কি এপাড়ার?"

"না, আশপাশের গ্রাম থেকেও আসে। দু'একটাকে আবার চিনতেও পারি না। কোন চুলো থেকে আসে কে জানে! মেয়েদের স্কুলের কাছে রথতলার রকে ওদের আড্ডা। রকেচটা মেয়ে আছে, তেমনই বেহায়া। ওদের ওখানে দাঁড়িয়ে গল্পো মারে। আসলে মোটর সাইকেলে চড়ে ঘোরার ধান্দা। যাক, ওদের কথা ছাড়ো। তুমি তো বিলেতে থেকে একেবারে সাহেবের মতো দেখতে হয়ে গেছ, আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি।"

মুখে চেষ্টা করে হাসি ফোটায় নীলার্ক। আলদা ফের বলে, "বিলেত দেশটা শুনেছি, খুব পরিষ্কার, ঝকঝকে। রাস্তায় ভাত রেখে খেয়ে নেওয়া যায়। আকাশে নাকি এত প্লেন ওড়ে যে ঠোকাঠুকি লেগে যাওয়ার জোগাড়!"

এবার সত্যিই হাসি পেয়ে যায় নীলার্কর। আলদাদার মাথায় ছিট আছে, একবার যখন বকতে শুরু করেছে, সহজে থামবে না, তাই সে বলে, "তুমি তো আমার উলটোদিক থেকে আসছিলে, যাচ্ছিলে কোথায়?"

"শীতলের দোকানে। বিষ্টুর সঙ্গে যে-ব্যবহার করছিল ছেলেগুলো, বলতাম সবাইকে।"

AMARBOI.COM

"যাও তা হলে, পাড়ার লোকদের ব্যাপারটা জানানো উচিত," বলে হাঁটা থামাল নীলার্ক। দাঁড়িয়ে পড়ল আদলাও। বলল, "সেই ভাল, এখনই গিয়ে বলি। দোকানে ভিড় থাকে। তোমাদের বাড়িতে যাব একদিন। বিলেতের গল্প শুনব।"

"আচ্ছা এসো," বলে এগোল নীলার্ক। অন্য সময় হলে হয়তো আদলার সঙ্গে আরও কিছু কথা বলত। সকাল থেকেই নীলার্কর মনটা অস্থির হয়ে আছে। একটু আগে ছেলেগুলোর চ্যাংড়ামি দেখে বিরক্ত হল খুব। নীলার্ক এখন যাচ্ছে তন্ময়দের বাড়ি। গতকাল সন্ধেবেলা যাওয়ার কথা ছিল। তন্ময়ই বলেছিল সময়টা। বিকেলে ফোন করে বলল, "আজ আসতে হবে না। অফিস থেকে ফিরতে রাত হবে বাবার। কাল সকাল দশটা-এগারোটার মধ্যে এসো। বাবা ছুটি নিয়েছে, হয়তো তোমার সঙ্গে কথা বলবে বলেই।"

প্রোগ্রাম ক্যানসেল হয়ে যাওয়াতে সন্ধেবেলাটা ফাঁকা পেয়ে গেল নীলার্ক। গিয়েছিল পাড়ার সায়েন্স ক্লাবে। ক্লাবের নিজস্ব বিল্ডিং আছে। টিমটিম করছিল চারটে ছেলে। নীলার্ক যখন স্কুল কলেজে পড়েছে, বিজ্ঞান ক্লাব ছিল তার একটা বড় কাজের জায়গা। সেমিনার, এগজিবিশন, বনমহোৎসব কতরকম কর্মকাণ্ড! প্রচুর উৎসাহী ছাত্রছাত্রী, পাড়ার বড়রাও জড়িয়ে থাকত ওই কাজে। আড়াই বছর আগে শেষ যেবার এসেছিল, তখনই দেখেছিল সায়েন্স ক্লাবে ভাটার টান। কাল ক্লাবঘরে কাটাল তিনটি ঘণ্টা। প্রথমে একটি ছেলে ছিল সমীরণ, নিয়ম করে রোজ সন্ধেবেলা ক্লাবঘরটা খোলে সে। সমীরণই ফোন করে বাকি তিনবন্ধুকে ডেকে পাঠিয়েছিল। ওরাই জানাল, ক্লাবের অ্যাক্টিভিটি বলতে এখন আর প্রায় কিছুই নেই। ভাল স্টুডেন্টরা এগিয়ে আসছে না। সবাই নিজের কেরিয়ার গোছাতেই ব্যস্ত। কলকাতার বড় প্রতিষ্ঠান বা নামী টিচারের কাছে কোচিং নিতে যায়। তাতেই দিনের অর্ধেকটা সময় শেষ। এগজিবিশন সেমিনার বিজ্ঞানমেলা আরও অন্যান্য অনুষ্ঠান টাকা খরচ করে প্রফেশনাল লোকজনের মাধ্যমে করাই যায়। সে ক্ষেত্রে টাকার জন্য হাত পাততে হবে রাজনৈতিক দলের কাছে। বদলে ওদের দলের সমস্ত অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে হবে। আসলে তারা নিজেদের প্রচারে ব্যবহার করবে সায়েন্স ক্লাবকে। সব শুনে নীলার্ক বলেছিল, "তা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। অল্প করে হলেও কাজ শুরু করো। আমি যে-ক'টা দিন আছি, স্কুলের স্টুডেন্টদের নিয়ে সেমিনারের অ্যারেঞ্জ করো। যাদবপুরের আমার দু'-চারজন স্যারকে বলব এখানে এসে স্পিচ দিতে। বিদেশের বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে আমিও কিছু বলব, এলাকার লোকের কাছে চাঁদা তোলো। তাদের ইনভল্ভ করো এই কাজে। জানি, চাঁদা সাফিশিয়েন্ট উঠবে না। বাকি যা লাগবে আমি দেব।"

আশ্বাস পেয়ে ওরা রীতিমতো চার্জড হয়ে গেছে। নীলার্ক জানে এই উৎসাহ বেশিদিনের নয়। তবু কিছু কাজ তো হোক। হতেই পারে, ওদের উদ্যম দেখে নীলার্কর মতো অন্য কেউ এগিয়ে আসবে।

কালকের সন্ধেটা মোটামুটি ভালই কেটেছে নীলার্কর। বাড়ি থেকে যখন সায়েন্স ক্লাবের উদ্দেশে বেরোচ্ছে, মা জানতে চেয়েছিল, "চললি কোথায়?"

নীলার্ক বলেছিল, "যাই একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসি।"

মা সতর্ক করেছিল এই বলে, "যেখানেই যাও, মনটাকে তৈরি রেখো। জেঠুর বাড়ি নিয়ে কথা শুনতে হতে পারে।"

সায়েন্স ক্লাবে শুনতে তো হয়ইনি। রাস্তায় পাড়ার কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গটা তোলেনি কেউ। সেটা বোধ হয় নীলার্ক এখন দূরের মানুষ হয়ে গেছে, পাড়ার সঙ্গে সেভাবে সম্পৃক্ত নয় বলেই। বাড়ি ফিরতেই মা যথারীতি জিজ্ঞেস করল, "কেউ কিছু বলল?"

ড্রয়িংরুমের সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়ে নীলার্ক বলেছিল, "কেউ কিছু বলেনি। অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। তোমরা বড্ড বেশি ভাবছ।"

"তুমি গ্রামের গর্ব, আমেরিকায় থাকো, প্রথম দেখায় তাই কেউ কিছু বলেনি। ক'দিন যেতে দাও, আবার যখন এদের সঙ্গে দেখা হবে,

এলাকার অনেকের মোবাইলেই নাকি বউটার গা-খোলা ফোটো আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা তখন ঠিক তুলবে।" বলার পর মা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মনে করায়, "অন্য কোথাও ফ্ল্যাট নেওয়ার ব্যাপারে খোঁজখবর নে। এখানে থাকলে আমাদের অনেক কাজ কিন্তু আটকে থাকবে।"

ভিতর দরজার পরদা একহাতে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অলি। শুনছিল মা-বাবার কথোপকথন। নীলার্ক বোনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চেয়েছিল, "তোর কী মত? একটা বাজে রটনার কারণে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কি কোনও মানে আছে?"

অলির উত্তর ছিল, "আমার বিয়ে আটকে যাওয়ার ভয় পাচ্ছে মা। আমি সেটাকে ভত গুরুত্ব দিচ্ছি না। পাত্রপক্ষ যদি সংকীর্ণ মনের হয়, তা হলেই জেঠুর বাড়ির ঘটনার সঙ্গে আমাদের জড়াবে। এরকম ফ্যামিলিতে আমার বিয়ে না হওয়াই ভাল। আমার বা বাবা-মায়ের অন্য একটা সমস্যা হচ্ছে। এ পাড়ায় খোলা মনে ঘুরতে পারছি না, যেতে পারছি না কারুর বাড়িতে। সব সময় চিন্তা হচ্ছে, এই যদি অভিদার বউয়ের কথা তোলো এরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শেষে নতুন জায়গায় ফ্ল্যাট নিয়ে থাকা ভাল।"

ভলিউম কমিয়ে টিভির নিউজ চ্যানেল দেখছিল বাবা। নীলার্ক বাবার উদ্দেশে বলে, "মা-অলি কী বলছে শুনলে? তোমারও কি তাই মত?"

মুখ ফিরিয়ে ছিল বাবা। বিমর্ষ গলায় বলল, 'এখানে জমেছি, বড় হলাম। এখন হাট পেরিয়ে বুড়ো। নিজের জায়গা ছেড়ে আর কি কোথাও মন চায়? কিন্তু আমার আবেগ তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। তোমার মা বিয়ে হয়ে এখানে এসেছে। বিয়ের পর অলিকেও অন্য কোথাও থাকতে হবে। লেখাপড়ার পর তুমি এখানে থাকবে কি না, কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলে ডিসিশন যা নেওয়ার তোমরাই নাও। আমি অমত করব না।"

এরপর আর কথা বাড়ায়নি নীলার্ক। সিঁড়ি ধরে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। এবার এখানে আসার পর থেকেই জেঠুর বাড়ির ঘটনাটা গলায় থাকার আটকে যাওয়ার মতো রয়ে গেছে। কিছুতেই সরছে না। ছুটিটা কীভাবে কাজে প্ল্যান করতে পারেনি। সামনে পুজো তো আছেই, তারপর মা-বাবা-বোনকে নিয়ে দেশের মধ্যেই দূরে কোথাও বেড়াবে ভেবে এসেছিল। এই পরিবেশে ট্যুর নিয়ে আলোচনা করা ইচ্ছে করছে না নীলার্ক।

রাতে যখন খেতে বসেছিল, মা হাসি-মজার কথা বলছিল, সঙ্গ দিচ্ছিল অলি-বাবা। কিন্তু ওদের স্বাভাবিক থাকার প্রয়াসটা ধরা পড়ে যাচ্ছিল বারবার। এই সময়ই অলি জানতে চেয়েছিল, "তনয়াদের বাড়ি গিয়েছিল? কী ঠিক হল?"

"যাইনি। সায়েন্স ক্লাবে সময় কেটে গেল।" মাথা নিচু করে খেতে খেতে বলেছিল নীলার্ক।

বিস্ময়, আক্ষেপ মিশিয়ে অলি বলল, "এ মা, গেলি না কেন? মেয়েটা অত করে বলে গেল। হয়তো বাড়িতেও বলে রেখেছিল, তুই আসবি।"

"কাল সকালে যাব।" এটুকুই বলেছিল নীলার্ক।

তনয়াই যে ফোন করে আজ সকালে আসতে বলেছে, তা বলেনি। বললেই বাড়ির আবহাওয়ায় একটা গুরুত্বর বিষয় যোগ হত।

অলির কথা ধরে মা বলতে শুরু করেছিল, "তনয়াদের বাড়ি থেকে এবার কিন্তু তোকে বিয়ের জন্য চাপ দেবে। সেই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে যাস। ওরা তো আর বাইরের লোক নয় যে, জেঠুর বাড়ির কেচ্ছা শুনে বিয়েতে পিছিয়ে যাবে। সবটাই চোখের সামনে দেখছে। তা ছাড়া তোর মতো পাত্র পাবে কোথায়? মেয়ে বুদ্ধি করে..."

বাকিটা বলতে দেয়নি অলি। হাসতে-হাসতে বলেছিল, "আগে থেকে দাদাকে পটিয়ে রেখেছিল বলতে চাইছ তো? এটা কিন্তু ভারী অন্যায়। মিছিমিছি নিন্দে করা হচ্ছে ওর। দাদা যে এতটা সহ্যিন করবে, আমরাই কি বুঝতে পেরেছিলাম? তনয়া সেই কোন ছোটবেলা থেকে দাদাকে ভালবাসে।"

এরকম খোলামেলা কথাবার্তায় বাবার অস্বস্তি হচ্ছিল। খাওয়া সেরে উঠে পড়েছিল তাড়াতাড়ি। নীলার্ক নিজের বিয়ের প্রসঙ্গটা এগোতে দেয়নি। মায়ের রাঁধা মাছের পদটার প্রশংসা করে কথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

আজ সকালে গোটা পরিস্থিতি অত্যন্তাশিত বাঁক নিল। অলির বলে দিনের প্রথম চা-টা মা নিয়ে এল নীলার্কর ঘরে। তখনই বলেছিল, "তোর জেঠু তো অভির বউকে তাড়িয়ে দিল।"

"মানে!" বলে বিছানায় শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসেছিল নীলার্ক। হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে মা যা জানাল, তা এইরকম, ভভিমাসি খবরটা এনেছে। মাসি বহুদিনের পুরনো কাজের লোক। নীলার্কর বাড়ির সঙ্গে জেঠুর বাড়িতেও কাজ করত। অভিদার বউকে নিয়ে কেচ্ছাটা রটার পর জেঠুর বাড়ির কাজ ছেড়েছে। অন্য কেউ ওই রটনার কারণে ওখানেতে কাজ করতে রাজি হয়নি। কাল জেঠু ভভিমাসিকে ডেকে বলেছে, বউমাকে তাড়িয়ে দিলাম। ভভি, কাল থেকে কাজ ধরে নাও। ভভিমাসি তখনই রাজি হয়নি। বলেছে, ভেবে জানাচ্ছি। আজ সকালে ভভিমাসি এসে মায়ের কাছে পরামর্শ চেয়েছে, জেঠুর বাড়ি কাজে লাগা ঠিক হবে কি না। ভভিমাসির ছিধা-সংশয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি নীলার্ক। মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তাড়িয়ে দিল বলতে, কোথায় গেল অভিদার বউ?"

"সে কি আর আমি জানতে যাব? তোর জেঠু যদি নিজে থেকে এসে বলে, শুনব।"

"তা হলে আমি যাই। জেনে আসি ব্যাপারটা," বলে কাপে ক্রত চুমুক মারছিল নীলার্ক।

মা বলেছিল, "এখনই যাওয়ার দরকার নেই। দুটো দিন যেতে দে। তাড়িয়ে দিয়েছি বললেই তো আর তাড়ানো যায় না। ও মেয়ে যাবে কোথায়? কে রাখবে তাকে? ভদ্র পরিবেশে ঠাঁই হওয়ার কথা নয়। যে কোনও দিন ফিরে আসতে পারে।"

একটু চুপ থেকে মা ফের বলতে শুরু করেছিল, "আমার তো মনে হচ্ছে, বাপের বাড়ি পাঠানো হয়েছে মেয়েটাকে। অভিকে দু'দিন ধরে দেখছি না। তেই বোধ হয় বউকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। টাকাপয়সা দিয়ে বউকে কোথাও রাখার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করে আসবে।"

অভিদার বাপের বাড়ির লোকজন কেমন? জানতে চেয়েছিল নীলার্ক।

উত্তরে মা বলল, "খুব বেশি আলাপ হওয়ার সুযোগ হয়নি। এমনিতে নিরীহ বলেই মনে হয়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার, তারপর জেঠুর বাড়িতে এলে একটু গুটিয়ে থাকে। ভাল টাকাপয়সা না পেলে ঠক করে ওরা মেয়ে ফেরত নেবে না।"

নীলার্কর চা খাওয়া শেষ। মা ফাঁকা কাপ নিয়ে নিচের তলায় চলে গিয়েছিল। একঘালক দেখা অভিদার বউয়ের পরিণতির জন্য বেশ খারাপ লাগছিল নীলার্কর। কী ঘটেছিল, বউদি কতটা দায়ী, ভাল করে বিচার করার আগেই শুধু রটনার ভিত্তিতে মেয়েটাকে বিদায় করে দেওয়া হল। বাকি জীবনটা সে কীভাবে কাটাচ্ছে, চ্যারিটি-ফ্যামিলির কেউ খোঁজ নিতে যাবে না। জেঠু এতটা নির্দয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানুষ নয়। পাড়ার লোক, আত্মীয়-স্বজনের থেকে প্রভাব হয়ে গিয়ে, এরকম একটা পদক্ষেপ নিল। জেঠুর মনটাও যে ভাল নেই, ভালই টের পাচ্ছে নীলার্ক। পাশে থেকে যিনি যে দাঁড়াবে, পথ আগলে দিচ্ছে মা। এই সমস্যায় নীলার্ক খুব একটা কিছু করতেও পারবে না। দু'মাসের ছুটিতে এরকমের ঝামেলা মেটানো সম্ভব নয়। এ এখন চলবে। নীলার্কর জেঠুর কাছে যাওয়াটা সান্ত্বনামাত্র। সেটুকুও করতে পারছে না বলে নীলার্ক অস্থিরতায় ভুগছে। মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক কথা। যেমন, পুরীর একটা হোটেল লিজ নিয়ে বিরাট লস খেল অভিদা। তারপরই জেঠুকে বলল, "দরি কিনব, টাকা দাও।" রাজি হয়ে গেল জেঠু। নীলার্ক জেঠুকে আলাদা করে বলেছিল, "কেন বারবার টাকা দিচ্ছ অভিদাকে? দেখছ, একটা বিজনেসও দাঁড় করাতে পারছে না। ওকে কোনও চাকরি-বাকরি দেখে দাও।"

জেঠুর উত্তর ছিল, "চাকরি যদি না করতে চায়, আমি কী করব বলো? তবে আমার এক ছেলেকে নিয়ে আক্ষেপটা পুষিয়ে যায় আর-এক ছেলের ব্যাপারে গর্ব করে।"

শেষ কথাটা নীলার্ক মাথায় হাত বুলিয়ে সহাস্যে বলেছিল। যে-মানুষটা তাকে এত আপন মনে করত, তার কাছেই যাওয়া হয়ে

AMARBOI.COM

উঠছে না। মনটা এমন বিক্ষিপ্ত ছিল, তনয়াদের বাড়িতেই যেতে ইচ্ছে করছিল না। তনয়াকে ফোন করে কিছু একটা বলে কাটিয়ে দিতে পারলেই ভাল হত। এদিকে তনয়ার বাবা আবার ছুটি নিয়ে বসে আছেন। নীলার্কর সঙ্গে কথা বললেন বলেই ছুটি নিয়েছেন, এমনটাই ধরে নিচ্ছে তনয়া। তা যদি না হয়, একবার কি ফোন করে দেখবে নীলার্ক? ব্রেকফাস্ট করতে বসে যখন নীলার্ক এসব ভাবছে, বাবা ফোনসেট নিয়ে এসে বলেছিল, "তনয়ার ফোন।"

সেট কানে নিয়ে 'হ্যাঁছি' বলে ফোনসেট বাবাকে ফেরত দিয়েছিল নীলার্ক। পুরনো মডেলের সেট। আমেরিকা যাওয়ার আগে ব্যবহার করত নীলার্ক। ওর নামেই সিমকার্ড। ফোনটা বাবার কাছেই থাকে, নিয়ম করে চার্জ দেয় ব্যাটারিতে। অল্প করে টাকা ভরে, একটা দুটো কলও করে, প্রোভাইডার যাতে লাইন না কেটে দেয়। ফোনটা যেন নীলার্কর ক্ষুদ্র সত্তা। বাবা ওইটুকু সঙ্গ যত্ন করে রাখে। ছেলেকে তো পায় না কাছে।

তনয়াদের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল নীলার্ক। শিউলির গন্ধে মনটা বারবার হয়ে উঠল। গেটের পাশে বাথানের গাছটা অনেক বড় হয়েছে। রাস্তায় গেটের স্ল্যাবে অজস্র ফুল পড়ে আছে। সাবধানে ফুল বাঁচিয়ে গেট খুলল নীলার্ক। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই খানিক দূরে খুলে গেল সদর-দরজা। তনয়া এসে দাঁড়িয়েছে, মুখে ঝিলিক মারছে হাসি। এতটাই ধবধবে, শিউলির সাদাকে ছাপিয়ে গেছে।

মিনিট কুড়ি কেটে গেল। তনয়াদের বসার ঘরে বসে গল্প করে যাচ্ছে নীলার্ক। মূলত তনয়ার বাবার সঙ্গেই কথা বলছে। কাকিমা মাঝে-মাঝে এসে যোগ দিচ্ছেন। তনয়াও টানা বসছে না, হয়তো নীলার্ককে সুযোগ দিচ্ছে বাবার সামনে বিয়ের কথাটা পাড়ার জন্য। তনয়ার উপস্থিতিতে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলে, বেজাই লজ্জায় পড়ে যাবে। কাকাবাবু কিন্তু ও ব্যাপারের ধারপাশ দিয়ে যাচ্ছেন না। আমেরিকার গল্প শুনছেন, এদেশের সঙ্গে তুলনা টানছেন। কিছুক্ষণ কাটানোর পর নীলার্কর স্থির বিশ্বাস হয়েছে, কাকাবাবু তার সঙ্গে কথা বলার জন্য ছুটি নেননি। স্কুলে কোনও কাজ আছে, নয়তো নিছক বিশ্রাম। ইতিমধ্যে কাকিমা একটা কাণ্ড করেছেন, ব্র্যান্ডেড কোম্পানির পাজামা-পাঞ্জাবি [illegible] কোট দিয়েছেন নীলার্ককে। হবু জামাইকে পুজোর গিফ্‌ট। এদিকে তনয়ার গিফ্‌টটা আনতে ভুলে গেছে নীলার্ক। আনলেও তনয়াকে দুর্বিধেয় দিতে হত। কাকাবাবু, কাকিমার জন্য আমেরিকা থেকে কিছুই আনেনি। আনা বোধ হয় উচিত ছিল। নানা ধরনের স্ন্যাক্স, মিষ্টি নিয়ে গেছেন কাকিমা, যার একের সারও খাওয়া হয়নি। কেক-পেস্ট্রিগুলো মনে হচ্ছে বড় কোম্পানির। ওরা কি আউটলেট খুলেছে দেউলপুরে, নাকি কলকাতা থেকে কারই এনে রেখেছেন কাকাবাবু? তা হলে তো ধরেই নেওয়া যায়, উনি জানেন নীলার্ক আজ সকালে আসবে, তাই ছুটি নিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ কিছু বলার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। এখন যেমন বলছেন, তুমি ভাবো, একটা দেশ, যারা ধর্ম, ধর্ম, জাত কিছুই মানেনি, সবকেই আপন করে নিয়েছে। যেটা মানুষকে আদর করে ডেকে, সুযোগ করে দিয়েছে কাজের, সেই দেশ তো তরতর করে এগিয়ে যাবেই...

কথার মাঝখানে ঘরে এল তনয়া। সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে চোখের ইশারায় নীলার্ককে বলছে বিয়ের প্রসঙ্গটা তুলতে। না তুললে পরে রাগারাগি করবে তনয়া। কাকাবাবুর বলা শেষ হতেই, নীলার্ক গলা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করে, "বুঝলেন কাকাবাবু, আমার তো পিএইচ ডি কমপ্লিট হল, পোস্ট ডকের জন্য ইউনিভার্সিটিও পেয়ে গেছি। এবার ভাবছি আমরা..."

"তোমাদের বিয়ের কথাটা বলছ তো?" নিশ্চিত হয়েও প্রশ্নটা করলেন কাকাবাবু।

আলতো করে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল নীলার্ক। কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ওই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করার আছে।"

তনয়া চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেশি তফাতে যাবে না, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনবে ঘরের কথা। কাকাবাবু বলতে শুরু করলেন, "তনয়ার হাবভাব দেখে বুঝতেই পারছি, চাইছে তুমি থাকতে থাকতে দু'বাড়ির মধ্যে তোমাদের বিয়ের কথাটা পাকা হয়ে যাক। ডেট ফাইনাল হোক তোমার সুবিধে অনুযায়ী, মানে পরের বার তুমি যখন আসবে। কিন্তু আমার মত, বিয়ে নিয়ে কথা বলার জন্য এটা রাইট টাইম নয়।"

"কেন বলছেন এ কথা?" প্রশ্নটা মুখে না বলে দৃষ্টিতে ঝুলিয়ে রাখল নীলার্ক।

সেটা পড়ে নিয়ে তনয়ার বাবা বললেন, "অভির বউয়ের ব্যাপারটা নিয়ে তোমাদের পরিবারের সকলেই এখন বেশ ডিসটার্বড। এই সময় বিয়ের মতো শুভকাজের বিষয়ে কথা বলতে গেলে খুব একটা স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারবেন না। পরিস্থিতি থিতোক, তারপর আমাদের প্রস্তাব নিয়ে যাব।"

একটু থেমে কাকাবাবু ফের বলতে থাকলেন, "সমস্যাটা তনয়াকে ভাল করে বোঝাও তুমি। শুধুমাত্র আমরা বললে বুঝবে না। বিয়েটা তো একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মধ্যেই হয় না, দুটো ফ্যামিলি জড়িয়ে পড়ে। তোমার আর তনয়ার সম্পর্কটা আমাদের গুটিকয়েক আত্মীয় জানে। বিয়ে ফাইনালের আগে বাকিদের জানাতে হবে। তারা যদি কৌতূহলবশত তোমার এবং তোমাদের পরিবারের খবর আলাদা করে নিতে যায়, রঞ্জনার কথাটা কানে চলে আসবে। আর এটা তো হাওয়ায় ভাসা কেচ্ছা নয়, এই এলাকার অনেকের মোবাইল রঞ্জনাটার সাক্ষী দেবে। এই সব আত্মীয় যদি আমাদের কাছে এরিহয়ে কোনও প্রশ্ন তোলে, আমরা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে যাব। তুমি থাকাকালীন, মানে এই দুদিন, পাড়ার এই চর্চা থামার কোনও ছান্স নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে।"

"কত দিন লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয়?" মাথা গরম হয়ে গেছে বলেই ট্যারা প্রশ্নটা করে ফেলল নীলার্ক। এবাড়ির সঙ্গে তার কত দিনের পরিচয়, এখন পাড়ার চর্চাটাই বড় হয়ে গেল!

কাকাবাবু প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছেন, "পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়াটা নির্ভর করছে তোমার জেঠু, মানে সমরদার ওপর। মেয়েটার ব্যাপারে সমরদা কী স্টেপ নিচ্ছেন, সেটাই এখান দেখার।"

"জেঠু বউদিকে তাড়িয়ে দিয়েছে!" বলে চুপ করে রইল নীলার্ক।

কাকাবাবুর চোখেমুখে হতভম্ব ভাব। বললেন, "তাই নাকি? আমরা তো কিছু জানতে পারিনি!"

শেষ বাক্যটায় একটু বেশ আপশোসের সুর। কাকাবাবু বোধ হয় চাইছিলেন জেঠু চেষ্টামেচি করুক, মুঠিতে পুত্রবধূর চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে রাস্তায় বের করে দিক। তবে না এলাকার লোক জানবে আপদ বিদেয় করা হয়েছে। চাপার্ডিবাড়ি নিয়ে চর্চাটা থামবে। নীলার্ক বলে ওঠে, "বউদিকে তাড়িয়ে দিলেই যে আমাদের পারিবারিক আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে যাবে, তা নয়। পাড়ার লোকেদের থেকে যতটা পরিমাণ উপেক্ষা-অপমান-উপহাস জুটেছে, ভুলতে সময় লাগবে। দশ-পনেরো-বিশ বছরও লাগতে পারে। আপনাকে মনঃকষ্টে-আত্মগ্লানিতে ভোগা মানুষগুলোর কাছেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যেতে হবে। এবার আপনি ঠিক করুন কবে যাবেন। বিয়ের ব্যাপারে আমার কোনও তাড়া নেই।"

ক্যাঁকাসে হয়ে গেছে কাকাবাবুর মুখ। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ট্রে-তে চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তনয়ার মা, সোফাসেটে টেবিলে চোখ যেতে বলে উঠলেন, "এ কী! তুমি তো কিছুই খাওনি দেখছি! আমি এদিকে চা নিয়ে এলাম!"

সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল নীলার্ক, বলল, "চা আর খাওয়া হবে না কাকিমা। দরকারি একটা কাজ আছে। এখনই বেরোতে হবে।"

তনয়ার মাকে মিথ্যে কিছু বলেনি নীলার্ক, অতি জরুরি কাজটা করতে চলেছে। যাচ্ছে জেঠুর বাড়ি। বিনা দোষে মানুষটা আজ সকলের থেকে ত্রাত্য, হয়তো নিজেকে অভিশপ্তও মনে হচ্ছে জেঠুর। আমেরিকায় থাকাকালীন বাড়ির কোনও খবরে যখনই একটু দুশ্চিন্তা শুরু হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীলার্কর, পরক্ষণেই ভাবে পাশে তো জেঠু আছে, ঠিক সামলে দেবে, এখন সেই জেঠুকে বেনামেও কেউ নেই।

নিজেদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে জেঠুর বাড়ির পিছনে চলে এসেছে নীলার্ক। এই পথেই চ্যাটার্জিবাড়ির সবাই জেঠুর বাড়িতে ঢোকে। ঝিড়কির দরজার পাশে ব্রিসঝেরা বারান্দা। জেঠু যদি দোতলায় থাকে, এখান থেকে ডাকলে আওয়াজ পৌঁছে যাবে উপর অবধি। নীলার্ক গলা তোলে, "জেঠু! ও জেঠু! কোথায় গেলে, জেঠু..."

পরদা সরিয়ে বারান্দায় এল জেঠু। থমকে দাঁড়িয়েছে। একলাফে বয়স বেড়েছে অনেক। কুঁচকে আছে কপাল, "কে নীলু! এসেছিস!"

গলা কাঁপল জেঠুর, চোখটা এমন কুঁচকে রেখেছে, নিজের দৃষ্টিকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। নীলার্ক বলল, "দরজাটা খোলো। এদিকটা খুলবেও নাকি ঝিড়কির দোর?"

"এদিকের চাবি কোথায় রেখেছি খেয়াল নেই। ঝিড়কির দোর দিয়েই আয়, খুলে দিচ্ছি।"

নীলার্ক দরজার মুখে পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গেই একটা পাড়া-ঘোরা কুকুর এসে দাঁড়াল। হয়তো এবাড়ি থেকে খাবার পায়, ইদানীং পাচ্ছে না। দরজা খুলে দিল জেঠু। নীলার্ককে বলল, "আয়, ভিতরে আয়।" কুকুরটাকে বলল, "যা এখান থেকে। যাঃ পরে আসিস।"

দরজা ভেজিয়ে নীলার্ক জেঠুকে অনুসরণ করল। হাঁটাটাও বদলে গেছে জেঠুর। দু'পাশে পা ফেলে ধীর গতিতে এগোচ্ছে। বলল, "ঘরে চ', অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।"

"এখানেই বলো। বলে জেঠুর কনুই ধরে ডাইনিংয়ের চেয়ারে বসিয়ে দিল নীলার্ক।"

অসহায় মুখ তুলে জেঠু বলল, "বাড়ির সব ঘটনা শুনেছিস তো?"

"শুনেছি। এখন বলো, কোথায় পাঠালে বউদিকে?"

"ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছি।" গলায় জোর আনার বৃথা একটা চেষ্টা করে জেঠু।

নীলার্ক বলে, "তুমি কাউকে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়ার লোক নও, আমি জানি। অভিজাও নেই কেন বাড়িতে? তুমি কোথায় পাঠালে ওদের?"

ফ্যালফ্যাল করে নীলার্কর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জেঠু। মুখের চামড়া কুঁচকে আসছে। হঠাৎই নীলার্কর হাত ধরে মাথা নামিয়ে নেয় জেঠু, হাউহাউ করে কাঁদতে থাকে।

পাঁচ

আবার দরজায় ঠকঠক, চমকে উঠল পর্ণা। অভিজিৎ অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পর এই নিয়ে তিনবার। বেশিক্ষণ ধরে বা ছিতীয় দফায় নক করছে না। বারান্দারেক দরজা ঠুকে থেমে যাচ্ছে। এটা নিছকই বন্ধুবিশ্বি, নাকি অন্য কিছুর ইঙ্গিত? প্রথমবার ভীষণই চমকে উঠেছিল পর্ণা, মনে হয়েছিল, সে বুঝি এখানকার কিথানা পেয়ে গেল! আওয়াজটা দীর্ঘস্থায়ী হল না দেখে কাঁচল ভয়। সে হলে নক করে-করে দরজা খুলিয়ে ছাড়ত পর্ণাকে। বেশ কিছু দিন ধরেই একা, অরক্ষিত অবস্থার পর্ণার মুখোমুখি হতে চাইছে সে। অভিজিৎদের বাড়ি ঢোকার সাহস হয়নি তার। ঢোকার মতো ভুল সে করবে না। ওই পাড়ার হানা দিয়ে বুঝে গেছে চ্যাটার্জি ফ্যামিলি বেশ শক্ত ঘাঁটি। কোনও ঝামেলা করতে গেলে গোটা পরিবার এবং প্রতিবেশীর থেকে বেধড়ক মার জুটবে। তখন সে যতই বলুক, মেয়েটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে, অধিকার আছে কথা বলার, কেউ শুনবেই না। তাদের প্রাথমিক কর্তব্য সমর চ্যাটার্জির বাড়িতে কোনও গন্ডগোল হতে না দেওয়া। পর্ণার শ্বশুরমশাই নিজের পরিবারের তো বটেই, পাড়ারও একজন মাথা। দেউলপুর কেন, সন্দনপুর স্টেশনে নেমে কেউ যদি সমর চ্যাটার্জির বাড়ি যাব বলে, লোকে রাস্তা চিনিয়ে দেবে। তবে ছেলেটাকে মেরে সাবিয়ে দিলেও, সে যে এসেছিল, খবরটা ছড়িয়ে যাবে চারদিকে। শ্বশুরমশাইয়ের যতই রেপুটেশন থাকুক, মানুষের কুৎসা রটানোর প্রবণতা ঠেকানো যাবে না। এই সারসত্যটা বুঝে নিয়ে ছেলেটা প্রথমে বাড়ি না ঢুকে ভিডিয়ো ক্লিপসেটা ছড়িয়ে দিয়েছে। যাতে আগে থেকেই বদনামের ভাগী হয়ে থাকে পর্ণা। ওই নোংরা দুশ্যের কারণে পর্ণা শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘাড়ধাক্কা খাবেই, তারপরই সে সামনে এসে দাঁড়াবে।

ঘাড়ধাক্কা খাচ্ছে না দেখে অস্থির হয়ে উঠছিল ছেলেটা। বারবার ফোন করত। ফোনসেট সাইলেন্ট মোডে রাখতে হয়েছিল পর্ণাকে। তাও তো ধরা পড়ে গেল অভিজিতের কাছে। এখন আর ফোন করে শিকারকে নাগালে পাচ্ছে না শিকারি। ফোনের সিমকার্ড খুলে রেখেছে পর্ণা। ছেলেটা নিশ্চয়ই হন্যে হয়ে পর্ণার হদিশ পেতে চাইছে। সহজে পাবে না। তবু দরজায় ঠকঠক শব্দ শুনে চমকে উঠছে পর্ণা। প্রথমত ছেলেটার কথাই মনে আসছে। তাই দরজা খুলে দেখছে না, কে নক করছে!

পর্ণার ঠিকানা এখন শিয়ালদা স্টেশনের অদূরে, একটা হোটেলের চারতলার ঘর। এই ফ্লোরের এটাই সবচেয়ে বড় রুম। ভাড়াও অন্যগুলোর ডবল। হোটেল কর্মচারীর সঙ্গে ঘর পছন্দ করতে এসে অভিজিৎ যখন এটা বাছল, পর্ণা বলেছিল, "কী হবে এত বড় ঘর নিয়ে, ভাড়া যখন দিচ্ছো। মাত্র দু'জন থাকব।"

"টাকা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না," বলেছিল অভিজিৎ, সেটা কর্মচারী সামনে ছিল বলে। লোকটা সরে যেতেই বলল, "এই ঘরটাতেই দুটো বেড আলাদা করা আছে। বাধ্য হয়ে তোমার সঙ্গে এক ঘরে থাকছি, এক বিছানায় শুতে পারব না।"

"আমি না হয় মেঝেতে শুতাম। রোজ ভাড়ার পিছনেই যদি এত টাকা চলে যায়, কত দিন টানতে পারবে তুমি? পছন্দমতো বাড়ি পেতে যদি সময় লাগে অনেক?" বলেছিল পর্ণা।

অভিজিৎ বলল, "খরচ তো আমি টানছি না, টানার ক্ষমতাও নেই। টাকা বাবা দিয়েছে, দরকার পড়লে আরও দেবে। কিন্তু তারও তো একটা লিমিট আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে নিতে হবে। রুমটা বড় নিচ্ছি শুধুমাত্র আলাদা বেডের জন্য নয়, তোমার কাছাকাছি থাকতেও আমার প্রচণ্ড বিরক্তি হয়।"

ভাগ্যিস 'ঘেন্না হয়' বলেনি অভিজিৎ! ঘেন্নার চেয়ে বিরক্তি অনেক সম্মানজনক। বড় রুম নিয়ে তাই আর কোনও ওজর-আপত্তি তোলেনি পর্ণা। গতকাল সকাল দশটা নাগাদ ঢুকেছে হোটেলে। এখন দুপুর এগারোটা। চব্বিশ-পঁচিশ ঘন্টাতেই ঘরটাকে খুব পরিচিত, খুব নিজের মনে হচ্ছে। এসি মেশিনও আছে এঘরে। ইচ্ছে করলে সুবিধেটা নেওয়া যায়, তবে ভাড়া আরও বেড়ে যাবে। এসি লাগবে না, বলে দিয়েছে অভিজিৎ।

হোটেলটা একশো বছরের পুরনো তো হবেই। আদলে প্রাচীনতার ছাপ। লিফট নেই। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়েছে চারতলায়। এর উপরেও আরও একটা তলা আছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে ভাতের হোটেল। চারতলার এই ঘরটাকে স্যুট বলা হচ্ছে, এতেই অনুমান করা যায় হোটেলের স্ট্যান্ডার্ড। এখানকার কোনও বোর্ডার বা স্টাফ বদমাইশি করে দরজা নক করলে, অবাক হওয়ার কিছু নেই। পর্ণা নেহাত একটা আতঙ্ক বয়ে বেড়াচ্ছে বলেই এতে চমকে উঠছে।

গতকাল এই উপরতলা হয়নি। অভিজিৎ আজকের মতো অফিস গিয়েছিল, একটু দেরি করে। ফিরেছিল রাত ন'টা নাগাদ। বলল, বাড়ির খোঁজ শুরু করে দিয়েছে। ব্রোকার তারাতলায়, পছন্দ হয়নি বাড়িটা। কাল যখন অফিস বেরচ্ছিল অভিজিৎ, পর্ণাকে বলেছিল, "আমার অ্যাডভেঞ্চার ঠিকানা দেউলপুরের হলেও, চাকরিসূত্রে কাঁচা রাখগেজ। অফিসের কাজ নিয়েই এসেছি এখানে। কাজের ফাঁকে বউকে কলকাতাটা ঘুরিয়ে দেখাব। আগে এসেছে, খুব বেশি জায়গায় ঘোরেনি। আমি যখন কাজে বেরব, ও একা থাকবে রুমে। একটু ঘোরাল রাখবেন।" এটা বলে নিচে অভিজিৎ বলল, "তোমাকে যদি ক্রশচেক করে রিসেপশনের ছেলেটা, আমার দেওয়া ইনস্ট্রাকশনগুলোই বোলো।"

এখনও অবধি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি। কেনই বা করবে? সন্দেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার মতো কোনও আচরণ প্রকাশ করেনি পর্ণা। এসে থেকে রুমের বাইরে যায়নি, নিজের বর ছাড়া অন্য কেউ আসেনি তার কাছে। হোটেলে রুমসার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। ঘরে খাবার আনিয়ে নিচ্ছে অভিজিৎ। আজ রুমে রেকফাস্ট সেরে অফিসে বেরল। দুপুরের ভাত অফিস ক্যান্টিনে খাবে। পর্ণারও যখন যা দরকার পড়ছে, বেল টিপে ডেকে নিচ্ছে সার্ভিস বয়কে। এরকম বন্দিশাস্য কাটাতে হবে অভিজিৎ পছন্দসই বাড়ি না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত। পছন্দ নিয়ে খুঁতখুঁতুনি বিলাস অভিজিৎ করবে না। ও খুঁজছে এমন জায়গা, যেখানে পর্ণা থাকবে অথচ দেখা যাবে না। এটা কিছুটা হলেও এরকম হোটেলেই সম্ভব। কিন্তু এই ধরনের বাড়ি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হোটেলে থাকতে গেলে জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাবে। এদিকে আবার অভিজিৎ রিসেপশনে বলেছে, বউকে কলকাতা দেখাতে নিয়ে এসেছে। পর্ণাকে যদি ঘর থেকে বের না করে, সন্দেহ হবে এখানকার স্টাফেদের। তখন কিন্তু রুশ্চেভের মুখে পড়তে হবে অভিজিৎকেই। তবু বউকে কলকাতা ঘোরানোর ঝুঁকি নেবে না অভিজিৎ। পর্ণারও সাহস হচ্ছে না বাইরে বেরনোর। তার চেয়ে এই হোটেলের চারতলার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে যতটা কলকাতা সে দেখতে পাচ্ছে, খারাপ লাগছে না। বেশির ভাগ সময়টা জানালায় দাঁড়িয়েই কেটে যাচ্ছে। খড়খড়ির পাল্লাগুলো বড়সড় জানালা, পাল্লা খুলে এখন দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই। পুরোপুরি জানা মেলতে পারছে না মনা কান বরজায়, যে-কোনও মুহূর্তে টোকা পড়তে পারে।

ঘরটা বড়রাস্তার গায়ে নয়। পাশের বিল্ডিংয়ের মধ্যে সরু গলি। এত উপর থেকে গলিটা দেখাও যাচ্ছে না। ওখানে দাঁড়িয়ে পর্ণাকেও কেউ দেখতে পাবে না। অওএব নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। দুষ্টিগুছে কোনও চারতলা বাড়ি নেই। অনেক দূর অবধি দেখতে পাচ্ছে পর্ণা। কিন্তু এটা কোন দিক, ধরতে পারছে না। কলকাতায় বড় একটা আসেনি সে। শেওড়াফুলিতে স্কুল শেষ করে শ্রীরামপুর কলেজে পড়েছে। কেনাকাটা, সিনেমা, ফাংশন সব ওই দুটো শহরের মধ্যে। ছোটবেলায় বাবা বারকয়েক কলকাতা ঘুরিয়েছে, সঙ্গে মা-ভাই-বোনও ছিল। যাওয়া হয়েছে মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানা... কমন যেসব জায়গায় লোক যায়। কলেজে পড়াকালীন মনীষার পাল্লায় পড়ে বাড়িতে মিনিয়ে দু'বার কলকাতায় এসেছিল। সঙ্গে ছিল মনীষার বয়ফ্রেন্ড দিব্যেন্দু এবং তার এক বন্ধু দিব্য। বন্ধুটির সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ। পরে মনীষা বলেছিল, দিব্যদা নাকি আগেই পর্ণাকে দেখেছে, পছন্দ হয়েছিল বলেই বেড়াতে যাওয়ায় যোগ দিয়েছিল। পছন্দটা অবশ্য ওই বেড়ানোয় টের পাচ্ছিল পর্ণা, ঘোর লাগা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল দিব্যদা, কথা বলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছিল। একটু ক্যাবলা টাইপের হলেও ছেলেটা দেখতে-শুনতে বেশ ভালই। সেদিন ঘোরা-বেড়ানোয় মজা হয়েছিল খুব। এমন তিনটে জায়গায় যাওয়া হয়েছিল, পর্ণা আগে কখনও যায়নি। প্রিন্সেপ ঘাট, নন্দন চত্বর আর কফি হাউস। শুনেছিল নন্দনের আশপাশ প্রেমিক-প্রেমিকাদের স্বর্গরাজ্য। সেখানে উদারমনস্ক পুলিশদের পোস্টিং দেওয়া হয়। তারা কখনওই যুগলদের বিরক্ত করে না। কিন্তু পর্ণা যা চাক্ষুষ করল, তা কল্পনাকে হার মানায়। একহাত অন্তর যুগলরা বসে আছে। তারা কখনও আদর, কখনও-বা শুধুই চুম্বনরত। পাশাপাশি বসে থাকা যুগলরা কিন্তু একে অপরকে চেনে না। পর্ণার মনে হয়েছিল, এ তো প্রায় বিদেশ। ক'দিন পর কলকাতার রাস্তায় প্রেমিক-প্রেমিকাদের কিস করতে দেখা যাবে।

তা কিন্তু হয়নি। ওই পাঁচদিছলা জায়গার বেড়া ডিঙোনোর সাহস করেনি কেউই।

কফিহাউস সম্বন্ধে কত গল্প শুনেছিল পর্ণা, অবাধ আড্ডা, প্রেম, বন্ধুত্ব। কোনও অশ্লীলতা নেই। সব মিলে গিয়েছিল, অসুবিধে হচ্ছিল একটাই, দেদার সিগারেট টানছিল ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে। অত বড় হলঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। তবে ওই বেড়ানোয় পর্ণার মনটা হয়ে গিয়েছিল পূর্ণিমার রাতের মতো পরিষ্কার। নারীজন্মের অদৃশ্য পুরনো চাদরটা কখন যেন খুলে পড়েছিল গা থেকে। বাড়ি ফেরার পথে পর্ণারা যখন হাওড়ার বাসে, দিব্যদা কিছু বলার জন্য উসখুস করছিল। পর্ণা বুঝতে পেরেও এড়িয়ে গেছে। মজা পাচ্ছিল দিব্যদার আকুতি দেখে। লোকাল ট্রেনে উঠে মরিয়া হয়ে উঠল দিব্যদা। কারণ ও নেমে যাবে শেওড়াফুলির আগে, কোন্নগরে। পর্ণার কানের কাছে এসে বলল, "এদের সঙ্গে নয়, আমাদের কি আলাদা করে দেখা হতে পারে?"

"পনেরো দিনের আগে তো নয়ই, আজকের আমেজটা কাটতে সময় লাগবে।" হাসতে-হাসতে বলেছিল পর্ণা।

দিব্য বলেছিল, "ঠিক আছে, পনেরো দিন বাদেই নাহয় ফোন করব।"

সমর্পণের ওই ভঙ্গি দেখে পর্ণার মনে হয়েছিল, আমি কি হঠাৎ খুব সুন্দরী হয়ে গেলাম? খুশি-খুশি ভাবটা উধাও হল ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামতেই। সঙ্গে গড়িয়ে গেছে অনেক আগেই। বাড়ি ফিরতে এত দেরি কখনও হয়নি। যদিও বিকেল নাগাদ মাকে ফোন করে বলেছিল, "বন্ধুর বাড়িতে নোট নিতে এসেছি। একটু দেরি হবে। চিন্তা কোরো না।..." কিন্তু রাত নেমে যাবে, কে জানত! ভেবেছিল গলির মুখে দাদা কিংবা বাবা অপেক্ষা করবে তার জন্য। কেউ ছিল না। পর্ণা বাড়ি ঢুকে দেখল, তার দেরি করে ফেরার চেয়েও বড় ঘটনা ঘটে গেছে। ঘণ্টাখানেক হল বাইরের লোকের হাতে মার খেয়ে ঘরে ঢুকেছে দাদা। মেরে মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে, ছিঁড়ে দিয়েছে শার্ট। কারা মেরেছে, কেন মেরেছে, কিছুতেই বলছে না দাদা। পর্ণা ফেরাতে একটু হলেও বাড়ির থমথাগ পরিবেশটা আলগা হয়েছিল। মা বলল, "যাক তুমি এসে গেছ। এখন পেয়ারের দাদার পেট থেকে বের করো, কেন মার খেয়ে এল।"

মারটা শুধু দাদার গায়ে পড়েনি, গোটা পরিবারের উপর পড়েছিল। আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ওই পিছিয়ে থাকা পাড়ায় বাস করেও বাড়িতে একটা রুচিশীল পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছিল বাবা। দাদা গ্র্যাজুয়েট, পর্ণা কলেজে যায়, বোন স্কুলে স্ট্যান্ড করে, মায়ের কাছে গান শিখতে যায় একাঙা-সেপাড়ার ছেলে-মেয়েরা। বোনের গানের গলাও খুব ভাল, নানা অনুষ্ঠানে ডাক পেত। পর্ণা টিউশন পড়াত বাড়ি-বাড়ি ঘুরে। দাদাও পড়িয়েছে, আবৃত্তি করত খুব সুন্দর। জীবনে কোনও বিন মারপিট করেনি। বৈভব না থাকলেও পর্ণাদের সংসারে শান্তি ছিল। তা নিয়ে একটু বুঝি গর্বও ছিল তাদের। দাদার মার খাওয়াটা সেসব কিছুর ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। কেন মার খেয়েছে পর্ণাকে পরে বলেছিল দাদা। পর্ণা ছিল ওপাড়ির অঘোষিত গার্জেন। কেন কে জানে, পর্ণার কথা ওপাড়ির সবাই খুব মানত, গুরুত্ব দিত। টানাটানি অবস্থা থেকে সংসারকে বের করে আনতে চাইছিল দাদা। বাবার উদ্যন্ত পরিশ্রমও সে সহ্য করতে পারছিল না। কলকাতার এক বড় ওষুধের কোম্পানে কাজ করত বাবা, এখনও করে। সকালে বেরিয়ে যায়, ফিরতে রাত। পাশ গ্র্যাজুয়েট দাদা তেমন্তু চাকরি খুঁজে হয়রান হয়ে, বাড়িতে না জানিয়ে দালালির কাজে নেমেছিল। কাজ শুরু করেছিল একটা ফ্ল্যাটবাড়ি বুকিংয়ের দায়িত্ব নিয়ে। বেশ কিছু ক্লায়েন্ট জোগাড় করেছিল দাদা। তাদের থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে বিল্ডিংয়ের মাথাপথে প্রোমোটার বেপাত্তা। মার খেয়ে গেল দাদা। পরে ব্যাপারটা পুলিশের আওতায় গেল। দালালি ছেড়ে দিয়ে অন্য ব্যবসার সন্ধান করতে লাগল দাদা। পর্ণা আরও ক'টা টিউশনি ধরে ফেলল। কিন্তু ততদিনে দিব্যদা জীবন থেকে সরে গেছে। কেন গেল, আজও জানে না পর্ণা। কথা শুনে পনেরো দিন বাদে ফোন করেছিল দিব্যদা। পর্ণা মিট করছিল ব্যান্ডেল চার্চে। সামনের গঙ্গায় নৌকোবিহারে অনেক স্বপ্ন বুনেছিল দিব্যদা। ইতিহাস সাক্ষাৎ চন্দননগরে, নতুন তৈরি হওয়া একটা পার্কে। সেদিন বড্ড শরীরখেঁষা হয়েছিল দিব্যদা। পর্ণা তাকে পুরোপুরি নিরাশ করেনি। একই সঙ্গে পরিবারের স্ট্যাগলের গল্পও শুনিয়েছিল। তিন নম্বর বেযাচ্চি ঠিক হয়েছিল বালি ব্রিজে, সেদিন এল না দিব্যদা। ফোন করলে ধরছিল না। পর্ণা মনীষাকে গিয়ে সব কথা বলল। জিজ্ঞেস করল, "সী ব্যাপার বল তো?"

মনীষা বলল, "দাঁড়া, খোঁজ নিচ্ছি।"

ক'দিন পর মনীষা জানাল, "দিব্যদা তোর প্রতি ইন্টারেস্টেড নয়।"

"কেন নয়? কেনইবা ইন্টারেস্ট দেখিয়েছিল?" জিজ্ঞেস করেছিল পর্ণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনীষা বলল, "অত কথা আমি জানতে চাইনি। চাইলে তোর নিন্দেই করত, শুনতে ভাল লাগত না আমার।"

এটা যে এড়িয়ে যাওয়া কথা, বুঝতে অসুবিধে হয়নি পর্ণার। মনীষা স্পষ্টই বিপদ পথ নিয়েছে। প্রেম তো জোর করে হয় না, বিপদ সঙ্গে সম্পর্ক বেশি দিন গড়ায়নি। তৈরি হয়নি কোনও দাবি বা অধিকারবোধ। পর্ণাকে ভুলে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছিল পর্ণা। কয়েকমাস যেতে না যেতেই দাদা হিতীয় ব্যবসাতে অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেল। এবার শুধু দাদা মার খেল না, জনতার হেনস্থার শিকার হল বাড়ির সকলে। প্রথমে ইট পড়ল বাড়িতে, টেনে বের করা হল এক-এক জনকে। আসবাবপত্র ছুড়ে ফেলা হল রাস্তায়। বাড়ির সবাই ভেঙে পড়লেও পর্ণা দুর্বল হয়ে পড়েনি। চোয়াল শক্ত করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। বাড়িওয়ালির সহানুভূতি পেয়েছিল পর্ণারা। নিজের ছেলেদের বিরুদ্ধে গিয়ে উমাজেঠিমা বলেছিলেন, "ওদের দোষটা কোথায়? মিছিমিছি অত্যাচার করে গেল লোকগুলো। এত দিনের ভাড়াটে এরা, প্রায় ঘরের লোক হয়ে গেছে। যখন যা ভাড়া বাড়াতে বলেছি বাড়িয়েছে। কোনও মাসের ভাড়া ফেলে রাখেনি... কোন মুখে তাড়াব এদের?"

জেঠিমার কারণে মনে আরও জোর পেয়ে গেছিল পর্ণা। পরিবারকে সমস্যা থেকে একাই বের করে আনতে পেরেছিল। স্বাভাবিক হয়ে গেছিল পরিস্থিতি। আবার মা গান শেখাতে শুরু করল। বাবা যে দোকানে কাজ করত, দাদা ঢুকে পড়ল সেখানেই। ঘটক সম্বন্ধ আনতে শুরু করল পর্ণার জন্য। বাবিবাওয়ায় বনছিল না বলে বাবা খবরের কাগজে দাবিহীন 'পাত্র চাই'-এর বিজ্ঞাপন দিল। ছবিসহ দিতে চেয়েছিল, পর্ণা বলেছিল, "কী হবে অত খরচ করে? ছবি দেখে তো বিয়ে হবে না? দেখতে তো আসবেই। ছবিতে অনেক ভেজাল মেশানো যায়।"

বিজ্ঞাপনের সূত্রেই দেখা করতে এসেছিলেন শ্বশুরমশাই। অভিজিৎ এল পরিবারের অন্যান্যরা দেখে যাওয়ার পর। প্রথম দেখাতেই অভিজিৎকে পছন্দ হয়েছিল পর্ণার। দিব্যরূপ থেকে অনেক ভাল দেখতে, অনেক স্মার্ট।

শ্বশুরবাড়িতে এসে অতীতজীবনকে ভুলতে বেসেছিল পর্ণা। কত আদর, হিসেব করে খরচা করতে হয় না। প্রাকৃতিক পরিবেশও পাল্লা গাছপালা, পুকুর। চারতলা স্কুলবাড়িটাই গ্রামের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। পুরীতে যিয়ে হানিমুন সেরে এল পর্ণারা। অভিজিৎ এমনিতে বেশ রোম্যান্টিক ছেলে, তবে খানিকটা বিরক্তিও বয়ে বেড়ায় কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের মতো। বলে, "বাবার কত টাকা নষ্ট করেছি, একটা বিজনেসও দাঁড় করাতে পারলাম না। অফিসে বসে পাতি যোগ-বিয়োগ করতে হচ্ছে।"

পর্ণা বোঝায়, "তা হোক, এতে তো আমরা অসুখী নই। আমার প্রাপ্তি অনেক। এতটা আশাই করিনি।" যেটা বলে না, তোমার বাবা বুদ্ধি করেই গরিবঘরের মেয়ে এনেছেন। যাতে এই স্বাচ্ছন্দ্যটাকেই স্বপ্ন বলে মনে হয়।

শাশুড়ি বেঁচে থাকলে কী হত কে জানে! না থাকাতে গোটা সংসার সামলাতে হয় পর্ণাকে। খারাপ লাগে না। সংসারের কাজে অদ্ভুত একটা ঘোর আছে, একেবারে নেশার মতো। আশ্চর্য এক মৌতাত। হোটেলের এই রুমটা একদিনেই নিজের ঘরের মতো হয়ে উঠলেও, কোনও কাজ নেই বলে হাত নিশপিশ করছে পর্ণার। শ্বশুরবাড়িটা তাকে যেন টানছে। হোটেলের সামনেটায় মহাত্মা গান্ধী রোড, কন্ডাক্টরে 'হাওড়া, হাওড়া' ডাক ভেসে আসছে। মাঝে-মাঝেই একটা ইচ্ছে চাগাড় দিচ্ছে পর্ণার। মনে হচ্ছে দৌড়ে গিয়ে বাসটায় উঠে পড়ে, তারপর সোজা শ্বশুরবাড়ি। কী এমন অসুবিধে হবেঃ বেশ তো ছিল সে। বারান্দায় পড়ে থাকা রোদ্দুরে ঝিলের নকশা, কখনও-কখনও চোখে ভেসে উঠত, সেখানে হাঁটা টানছে এক শিশু, পর্ণা-অভিজিতের সন্তান।

সেই সাংঘাতিক ফোনটা আসার পর থেকে আর শিশুটাকে দেখা যায়নি। এখন যদি বাস-ট্রেন ধরে শ্বশুরবাড়ি ফিরেও যায় পর্ণা, শিশুটাকে আর কোনও দিন দেখা যাবে বলে মনেও হয় না।

ফোনটা এসেছিল দুপুরবেলা। সংসারের কাজ, খাওয়াদাওয়া সেরে সবে বিছানায় পিঠ ঠেকিয়েছে, বমকে উঠে ফোনটা চলা কেউ নয়, শুধুই নাম্বার। 'হ্যালো' বলতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল, "বাজি বলছি, চিনতে পারছ?"

বিরক্তিও চিনেছিল পর্ণা। ছেলেটার গলার স্বর মাথায় গাঁথা আছে তার। তবু বলেছিল, "ওই নামে আমি কাউকে চিনি না।"

"চেনো-টেনো, চিনতে ইনকার করছ। তাও শিয়ার হওয়ার জন্য একবার বারান্দায় এসো, আমাকে দেখতে পাবে।"

"তুমি কোথা থেকে বলছ?" ঘমকে উঠে জানতে চেয়েছিল পর্ণা।

"এই তো চিনতে পারলে দিব্যি। তোমার শ্বশুরবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তোমার সঙ্গে কটা কথা বলতে চাই।"

"তুমি এবাড়ির ঠিকানা কোথায় পেলেঃ ফোন নম্বরই বা জোগাড় করলে কীভাবেঃ"

উত্তরে শাহরুখ খানের সিনেমার একটা ডায়ালগ বলেছিল বাজি।

যার বাংলা মানে করলে মোটামুটি এরকম দাঁড়ায়, মন-প্রাণ দিয়ে কাউকে চাইলে, বিশ্বচরাচরের কোনও বাধা তাকে আটকাতে পারে না।

মাথা ঠান্ডা রেখে পর্ণা বলেছিল, "তোমার সঙ্গে কেন কথা বলব? আমি তো বাধ্য নই।"

"আমি চাইছি বলে বলবে। যদি এই কলটার পর ফোনের সিম পালটে ফ্যালো, বিরাট ক্ষতি করে দেব তোমার। ভেবে রাখো, কবে, কোথায় দেখা করবে। আবার ফোন করব।"

হুমকি সত্বেও ঘাবড়ায়নি পর্ণা। ফোনসেটস্ট ফেলে দিয়ে এসেছিল পুকুরে। অভিজিৎকে বলেছিল ফোন হারিয়ে ফেলেছি। ফোন আমার দরকারও নেই। অভিজিৎ বলল, "তা আবার হয় নাকি? আজকের দিনে সঙ্গে ফোন থাকাটা ভীষণই জরুরি। তোমাকে নতুন সেট কিনে দেব, নাম্বার একই থাকবে। ফোন হারিয়ে গিয়েছে বলে থানায় লিখিত জানিয়ে দিইরির নাম্বারটা উল্লেখ করে ফোন কোম্পানির কাছে অ্যাপ্লিকেশন দিতে হবে, তাতে লিখতে হবে, আমার পুরনো নাম্বারটাই চাই।"

"পুরনো নাম্বার আমার চাই না। ওটা অনেক অদরকারি লোকের কাছে আছে। মাঝে-মাঝে তাদের ফোন আসে, বিরক্ত লাগে। তুমি নতুন নাম্বারের ব্যবস্থা করো, একদম কাছের কয়েকজনকে দিয়ে রাখব সেটা। ফোন কম ধরতে হবে," বলেছিল পর্ণা।

অভিজিৎ তাই-ই করল। অদরকারি লোকগুলো কারা, কেন তোমায় ফোন করে? এসব কিছু জানতে চায়নি অভিজিৎ। সেই নতুন নাম্বারেও ফোন এল বাজির। তার আগে এ পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে শুকে বাইকে ঘুরতে দেখেছে পর্ণা। দ্বিতীয় কলে পর্ণা জানতে চায়নি, নাম্বার কোথায় পেলেঃ আবার কোনও হিন্দি সিনেমার ডায়ালগ ঝাড়ত। বাজি বলল, "সিমকার্ড পালটে তুমি আমার নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। এখনও বলছি, ভেবে রাখো, কবে, কোথায় দেখা করবে। এটা আমার লাস্ট ওয়ার্নিং। পরের ফোনে জবাব চাই।"

"এই ফোনেই জবাবটা শুনে নাও। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে যাব না। তোমার যা কিছু বলার আছে, এ বাড়িতে এসে বলো। আমার শ্বশুর-শ্বাশুরি সামনেই।" বলে ফোন কেটেছিল পর্ণা। জানত ছেলেটার সেই সৎসাহস নেই যে, এই বাড়ির লোকদের মুখোমুখি হবে। কিন্তু তার যে এরকম অসৎ উদ্দেশ্য ছিল, পর্ণা ধারণাই করতে পারেনি। নোংরা ছবি ছড়িয়ে দিল পাড়ায়। পরের ফোনে বলল, "এখন তো শুধু দশ সেকেন্ডের ফুটেজ ছেড়েছি, যদি দেখা না করো, ফুটেজের টাইম বাড়বে।"

তখন থেকেই ফোনসেট ভাইব্রেট মোডে করে রেখেছিল পর্ণা। বুঝে গিয়েছিল বদমাইশটার ফোন তাকে ধরতেই হবে। কথা দিয়েই ঠেকিয়ে রাখতে হবে ওর অপকর্ম। ফোন ছেলেটার উপর রাগারাগি, অনুনয়-বিনয় দুই-ই করেছে। বলেছে, "আমি কী অন্যায় করেছি বলো? কেন তুমি আমার ক্ষতি করতে চাইছঃ ইতিমধ্যেই অনেকটা ক্ষতি করেছ। এবার রেহাই দাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও কথা না বলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তনয়া। ঠোঁট রেখেছিল নীলার ঠোঁটে।

বাজি শুনে শোনে না। কিছু দিন অন্তর ফোন করে যায়। পর্ণার কাছে সে কী চায়, তা-ও বলা হয়ে গিয়েছে। বাজি চাইছে পর্ণা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসুক। পর্ণার বাকি জীবনের ভার নেবে সে। পর্ণা বলেছে, কিছুতেই তা সম্ভব নয়। এ বাড়ি ছেড়ে সে যাবে না। স্বামী-সংসারকে ভালবেসে ফেলেছে। বাজিকে পর্ণা পছন্দ করে না। বাজির জীবনও নিরাপদ নয়।

বাজি বলছে, "সংসার, বিয়ে তোমার যেমন থাকছে থাক, তুমি মাঝেমাঝে আমার সঙ্গে মিট করো। শ্বশুরবাড়িকে লুকিয়ে।"

পর্ণা তাতেও রাজি হয়নি। ওদিক থেকে ফোন এসেই যাচ্ছে। এখানে আসার আগের দুপুরে একটা কল অভিজিৎ-এর সামনে এল। কার ফোন, জানতে চাইল অভিজিৎ। বাপের বাড়ির কল বলে কাটাতে চেয়েছিল পর্ণা। অভিজিৎ শোনেনি। মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে ওই নম্বরে কলব্যাক করতে যাচ্ছিল। পর্ণা প্রায় আর্ত চিৎকার করে বলে উঠেছিল, "না! ফোন করবে না তুমি। এই ছেলেটাই পাড়ায় নোংরা ছবি ছড়িয়েছে।"

যেন কারেন্ট খেয়েছিল অভিজিৎ। বেশ খানিকক্ষণ পাথরের মতো বসে থেকে ঠান্ডা গলায় জানতে চাইল, "ছেলেটা তোমার কাছে কী চাইছে? ছেলেটার নাম কী? কোথায় থাকে?"

"ছেলেটা আমায় বিয়ে করতে চায়। নাম বাজি, বাপের বাড়ির আশপাশের কোনও পাড়ায় থাকে, এগজ্যাক্ট ঠিকানাটা জানি না।" বলেছিল পর্ণা।

অভিজিৎ জানতে চাইল, "ছেলেটার সঙ্গে তোমার কী ধরনের সম্পর্ক ছিল?"

"কোনও সম্পর্কই ছিল না। ছেলেটা আমাকে ফলো করত। পছন্দ করে সেটাও আমাকে জানিয়েছিল। আমি কেন ওরকম একটা লোফার ছেলের প্রতি ইন্টারেস্টেড হব বলো তো?" বলেছিল পর্ণা।

অভিজিৎ বলল, "ছেলেটা পিছনে লেগে আছে। একদম বাজে টাইপের ছেলে। ওর ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলার পর বিয়েতে রাজি হতে পারতে। সমস্যাটা কাঁধে নিয়ে এবাড়িতে এলে কেন? যার মূল্য আমাদেরও চোকাতে হচ্ছে।"

"আমি তো ভেবেছিলাম সে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সরে গিয়েছে আমার জীবন থেকে। বিয়ের আগে ছ'-আট মাস ওকে আমার আশপাশে দেখিনি। কী করে বুঝব আমার বিয়ের পর এ পাড়ায় এসে হাজির হবে? ফোন করবে আমাকে!"

কথা কেড়ে নিয়ে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমার ফোন নম্বর সে পেল কী করে? এটা তো নতুন নাম্বার!"

"সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না। আগের নম্বরটাও ওকে আমি দিইনি। হতে পারে পুরনো পাড়ার আমার চেনাজানা কারও থেকে সেটা জোগাড় করেছে। কিন্তু নতুন নাম্বার ও কীভাবে জানবে? তুমি কি পাড়ার কাউকে দিয়ে ফোনটা আনিয়েছিলে? যেখান থেকে নাম্বারটা লিক হয়ে গিয়েছে? বাজি রথতলার ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, বাইক চেপে চক্কর কাটছে গোটা এলাকায়।"

এক হাত তুলে 'এক মিনিট' বলে পর্ণাকে থামিয়েছিল অভিজিৎ। তারপর বলতে থাকে, তার মানে আগের ফোনটা হারায়নি। বাজির ফোন পাওয়ার পর তুমি ফেলে দিয়েছিলে। নতুন নাম্বার চেয়েছিলে, যাতে বাজি আর না ফোন করতে পারে।

মাথা উপর-নিচ করে সমর্থন জানিয়েছিল পর্ণা। খানিক হতাশ গলায় অভিজিৎ বলেছিল, ছেলেটার কথা যদি তুমি আমায় প্রথম ফোনটা আসার সঙ্গে-সঙ্গে জানাতে, এত বড় কেলেঙ্কারিটা হত না। যাই হোক, এখন এসব ভেবে লাভ নেই। ছেলেটাকে কেমন দেখতে একটু ডিটেল দাও, চিনে রাখব। রথতলার রকের অনেক ছেলেকেই তো চিনি, একে আলাদা করে বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না।

বাজির চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল পর্ণা। মোটরবাইকের মডেল বলতে পারেনি। রংটা বলেছিল লাল। তারপর সাবধান করেছিল এই বলে, "তুমি আবার ওর সঙ্গে ঝগড়া করতে যেও না। ডেঞ্জারাস ছেলে! কলকাতার বারে বাউন্সারের কাজ করত। সঙ্গে চাকু-বন্দুক থাকতেই

AMARBOI.COM

পারে।"

"বাউন্দারের কাজ করত, তুমি কী করে জানলে?" সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল অভিজিৎ।

পর্ণা বলে, "ও তো নিজেই বলেছিল আমাকে। ও যে বেকার নয় সেটাই শোনাতে চেয়েছিল। এখন কী করে, কে জানে! শেওড়াফুলি থেকে এত দূরে আড্ডা মারতে আসে, এতেই তো অনেকটা সময় চলে যায়।"

একটু ভেবে নিয়ে অভিজিৎ বলেছিল, "আমি এখনই ওকে চেঞ্জ করতে যাব না। চোখমেখে হবে, আরও গায়ে কাদা লাগবে আমার। ছেলেটাকে চিনে রাখতে হবে অন্য কারণে। তোমার ফোন নম্বর যখন পাড়া থেকে বের করে ফেলেছে, আমার অফিসের ঠিকানাও পেয়ে যাবে। তারপর আমাকে ফলো করে পেয়ে যাবে তোমার হদিশ। একবার যদি ওকে চিনে নিই, এড়াতে পারব। যাক, তুমি এখনই ফোনের সিমকার্ড খুলে ফেলো। ব্যাগে আমাদের জামাকাপড় গুছিয়ে নাও। কাল ভোর-ভোর বেরিয়ে যাব।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল অভিজিৎ। ও বাড়িতে না-থাকাটা নিশ্চিত হয়ে গেল পর্ণার। নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে তার। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে মনখারাপ করছিল খুব। আর কি কোনও দিন ফেরা হবে? সিমকার্ড খুলতে গিয়ে মায়ের কথা মনে পড়ছিল। বাপের বাড়ি থেকে মা-ই একমাত্র ফোন করে মাঝেমাঝে, বাকিরা এড়িয়ে চলে। তার কারণও আছে, ভিডিয়ো কেলেঙ্কারির পর অভিজিৎ একদিন রেগেমেগে শেওড়াফুলির বাড়িতে গিয়েছিল। বাবা-মা-দাদা-বোনের সামনে বলেছিল ঘটনাটা। একইসঙ্গে ভর্ৎসনা করেছিল এই বলে, "আমাদের মতো ভালমানুষ পেয়ে একটা বাজে চরিত্রের মেয়েকে ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। কালই ওকে এখানে রেখে যাব।"

বাড়ির তিনজনেই স্তম্ভিত। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে অভিজিৎকে বোঝানোর চেষ্টায় নেমেছিল। বলেছিল, "মেয়ের কেমন চরিত্র, পাড়ার লোকের থেকে খবর নাও তুমি। কোন এমন হল, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ওই ছবি পর্ণার হতে পারে না। নিশ্চয়ই আমাদের কোনও শত্রুর কারসাজি।"

"শত্রুকে খুঁজে বের করুন। না পারলে মেয়েকে ফেরত নিয়ে যাও। ওকে আর ও বাড়িতে রাখতে পারব না আমরা।" সাফ জানিয়ে দিয়ে এসেছিল অভিজিৎ।

শত্রু খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাড়ির লোক তাই পর্ণার খোঁজ নিয়ে না, পাছে সংসারে একটা পেট বাড়ে। শুধু সংখ্যায় বাড়বে যে, তা নয়। ঘাড়ে করে বদনামও নিয়ে আসবে। মা কিছু দিন অন্তর ফোন করে, সম্ভবত বাড়ির বাকিদের না জানিয়ে। নিশ্চয়ই জানতে চায়, "কেমন আছিস রে? সব ঠিক আছে তো?"

পর্ণা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রতিবারই যা বলে তা হল, "এই প্রশ্নের কোনও মানে হয়! আমার কি ভাল থাকার কথা?"

প্রতি ফোনেই অপর প্রান্তে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মা বলে, "বড় চিন্তা হয় রে। তোর উপর যা ঝড়ঝাপটা যাচ্ছে, কীভাবে আছিস, কী করছিস... প্রতিবারই ফোন করার সময় মনে হয় গলাটা শুনতে পাব তো? ভগবানকে ডাকি, বলি, কোন অপরাধে মেয়েটাকে অত বড় শাস্তি দিলে? কী অন্যায় করেছে সে? একসময় যাকে আশ্রয় করে আমাদের সংসারটা টিকেছিল, সে-ই এখন আশ্রয়হীন।"

মায়ের বিলাপ ফুরনোর আগেই পর্ণা বাড়ির সকলের খবর নেয়। বলে, "আমাকে নিয়ে যামোখা চিন্তা কোরো না। যা হওয়ার তা হবেই। কিছু তো করার নেই।"

ফোনের ওপারে মায়ের ফোঁপানির শব্দ পায় পর্ণা। মা হয়তো ইতিমধ্যে চোখ করেছে, মেয়েকে না দেখে চিন্তা করছে খুব। পর্ণা সাহস করে সিমকার্ড লাগাতে পারছে না ফোনসেটে। অভিজিৎ বলেছে, "কোনও চান্স নেবে না। ফোনে সিম লাগানো থাকলে, ট্র্যাক করে লোকেশন পাওয়া যায়। বাড়ির দৌড় যে অনেকটা, ওর ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়া থেকেই বোঝা গিয়েছে। ফোন ট্র্যাক করার সোর্স থাকতেই পারে। যদি একান্তই কোনও দরকার পড়ে আমার সঙ্গে কথা বলার, তখন সিমটা লাগিয়ে কথা বলে, ফের খুলে ফেলবে।"

অভিজিতের কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছে পর্ণা। একপ্রকার বন্দি অবস্থায় কাটলেও, বাড়ির কাজায় নেই বলে ভালভাবে শ্বাস নিতে পারছে। কাল সন্ধে নামার পর, তখনও অভিজিৎ ফেরেনি, প্যাসেজ ধরে সামনের বারান্দায় গিয়েছিল পর্ণা। হোটেলে ঢোকার মুখে প্রত্যেক তলার ঝুলবারান্দাগুলো বেশ লেপেছিল। উপর থেকে বড় রাস্তা, লোকজন, বাস-ট্রাম দেখা যাবে। তাকে যাতে দেখা না যায়, সেইজন্যই অন্ধকার নামার পর তাদের চারতলার বারান্দায় চিয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুঁয়োপোকার মতো হেলেদুলে যাচ্ছিল ট্রাম, ঘণ্টি বাজাতে-বাজাতে। বাস ধরার জন্য মানুষের হুটোপাটি, বাড়ি ফেরার তাড়া। হাতভর্তি ব্যাগ, একমুখ হাসি নিয়ে শপিং সেরে বেরিয়েছে স্বামী-স্ত্রী। সব কিছু কত স্বাভাবিক, শুধু পর্ণার বুকেই চাপ হয়ে বসে আছে আতঙ্ক। এর থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। যখনই চেয়েছে এই কথা, বাইকে চাপা একটা ছেলে হঠাৎ উপরের দিকে তাকিয়েছিল, পর্ণার মনে হল যেন ছেলেটা বাজি। হেলমেট পরা থাকলেও চিনতে অসুবিধে হয়নি। দৌড়ে চলে এসেছিল রুমে। দরজা বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল ঠকঠক শব্দের। না কেউ উঠে আসেনি। ছেলেটা বাজি ছিল না। অত নিচ থেকে পর্ণাকে দেখতে পেলেও, অন্ধকারের জন্য নিশ্চিত পারার কথা নয়। আতঙ্কই কাহিল করে দিচ্ছে পর্ণাকে। তার অনেক পরে ফিরেছিল অভিজিৎ, নক করার পর যখন বলল, "আমি, খোলো..." গলা চিনে দরজা খুলেছিল পর্ণা।

আজ যে তিনবার দরজায় নক করল কেউ, অভিজিৎকে ফোন করে জানানো উচিত কি? ভাবনাটা মাথা থেকে তাড়ায় পর্ণা। মিছিমিছি বিরক্ত করা হবে। বেলুরি এমনিতেই কত টেনশনে আছে।

দূরে কোথাও মাইকে গান শুরু হল। এখন মাইক বাজাচ্ছে কোন? বিশ্বকর্মা পুজো চলে গেল ক'দিন আগে। এর পরে সোজা দুর্গাপুজো। গ্যাঙ্গুলিরা খুব আনন্দ হয়েছিল দেউলপুরে। চণ্ডীমন্দিরের পুজো তো ক'বারে বাড়ির পুজোর মতো। সবচেয়ে বেশি মজার ব্যাপারটা হয়েছিল, শ্বশুরমশাইয়ের হাতের রান্না খাওয়া। চণ্ডীমন্দিরের পুজোয় অষ্টমীর ভোগ রাঁধেন উনি। এবার সে সব আনন্দ থেকে দূরে থাকতে হবে। এখানকার আকাশটাও পুজোর সাজে সেজে উঠেছে। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে খেয়ালখুশি মতো। পর্ণার কেমন জানি আনন্দ হচ্ছে, যেদিকে এখন তাকিয়ে আছে সে, ওখানেই কোথাও কফি হাউস, ইউনিভার্সিটি, সংস্কৃত কলেজ। মনে পড়ে যাচ্ছে সেদিনের আড্ডা, দিব্যার সঙ্গে যদি আবার কখনও দেখা হয়ে যায়, পর্ণা জিজ্ঞেস করবে, হঠাৎ আর দেখা করলেন না কেন? আগের দিন বাড়ি সমস্যা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করছিলাম বলে? অথচ সেদিনই আমাকে আদর করার জন্য কেমন পাগল হয়ে উঠেছিলেন।

ছেলেরা মেয়েদের থেকে ঠিক কী চায় বোঝে না পর্ণা। শুধুই কি শরীর? বিয়ের পর পর্ণার মনে হয়েছিল অভিজিৎ তাকে খুব ভালবাসে। যখনই কেচ্ছাটা রটল পাড়ায়, অভিজিৎ সরে গেল দূরে। আর এক বিছানায় শোয় না। পর্ণা মানে যেন শুধু শরীর। কেন, মাথার কাছে বসে দুটো সান্ত্বনার কথা বলা যায় না? মনের কষ্ট কেন একা বইতে হচ্ছে পর্ণাকে? এই যে অভিজিৎ বউকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সেটা মোটেই পর্ণার সুরক্ষার কথা ভেবে নয়। ওদের সম্মানও যে জড়িয়ে আছে পর্ণার সঙ্গে। সুযোগ পেলেই বউকে ঝেড়ে ফেলে নিরুদ্দেশ হত অভিজিৎ, নেহাত ওর বাবা বেঁচে আছেন, তাই পালাতে পারছে না।

মাইকের গান থেমে গিয়ে ঘোষণা শুরু হয়েছে। কান পাতে পর্ণা, রক্তদান শিবির। পর্ণাকে চমকে দিয়ে দরজায় আওয়াজ ওঠে, আবার কেউ নক করছে। এবার তো আর থামছে না। নক করেই যাচ্ছে, ভয়ে সিঁটিয়ে যায় পর্ণা। ঘরের কোন জায়গায় লুকোবে বুঝতে পারে না। বাথরুমে ঢুকে যাবে কি? থামছে না আওয়াজ, বরং বাড়ছে। পা অসাড় হয়ে আসে পর্ণার, দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বসে পড়ে মেঝেতে।

MAHAPRITHIVI

ছয়

কলকাতার রাস্তায় যতক্ষণ কাটায় অভিজিৎ, বেশির ভাগ সময় নজর থাকে লরির দিকে। প্রথমে দেখে নিল টাটার ৪০৭ মডেল কি না? তারপর লরির পিছনটা দেখার চেষ্টা করে। ওই মডেলের একটা লরি ছিল অভিজিতের। ভাড়ায় খাটত। গণেশ চালাত গাড়িটা। অভিজিৎও চালিয়েছে, যখন ডুব মারত গণেশ। ওইরকমই একটা টিপে, গণেশ শরীর খারাপ বলল সেবারে। গাড়ি যাবে কেওনঝাড়, অভিজিতের আলসেমি লাগল। খোকনের গ্যারেজে ফোন করে বলেছিল, "একটা ড্রাইভার দিতে পারবি? বুকিং নিয়ে ফেলেছি। আমার একটা বিয়েবাড়ি আছে।"

"দেখছি।" বলে সময়মতো একজন ড্রাইভার পাঠিয়ে দিয়েছিল খোকন, নাম নন্দু। সেই যে গাড়ি নিয়ে গেল ছেলেটা, আর ফিরল না। পুলিশে জানিয়ে কাজ হল না কিছু। খোকনও নন্দুকে ভাল করে চেনে না। ওর গ্যারেজে মাত্র ক'দিন গিয়েছে। অন্য লোকের ট্যাক্সি চালাত। অভিজিৎ যখন ড্রাইভার চেয়ে ফোন করেছিল, নন্দু এসেছিল গাড়ি সারাতে। হাতের কাছে নন্দুকে পেয়ে খোকন জিজ্ঞেস করেছিল অভিজিতের টিপটা খাটবে কি না, নন্দু রাজি হয়ে যায়। সে যে এত বড় কাণ্ড করবে, খোকন এতটুকু আভাস পায়নি। এমনিতে খোকন যথেষ্ট চালাকচতুর ছেলে। গাড়ি মালিক হিসেবে অভিজিৎ যেহেতু তৃতীয় ব্যক্তি, এই লাইনের পরিভাষায় থার্ড পার্টি, ইনশিয়ারেন্স ক্লেম খুবই কম পাওয়া গেল। প্রচুর টাকা লস হয়েছিল অভিজিতের। ওটাই তার শেষ বিঙ্কনেস। তারপর বাবার সুপারিশে বিষ্টুর কোম্পানির চাকরিতে ঢুকল। সেই হারিয়ে যাওয়া লরিটাকে আজও রাস্তায় খোঁজে অভিজিৎ। যেহেতু কলকাতায় অফিস তার, এখানকার রাস্তায় নজর চলে বেশি।

অভিজিৎ জানে, চুরির পর সেই লরির রং, নাম্বারপ্লেট সব পালটে ফেলা হয়েছে। পার্টস খুলে লরিটাকে টুকরো করে বিক্রি করবে না। কারণ, কন্ডিশন যথেষ্ট ভাল ছিল। লরিটা চেনার একটাই রাস্তা, কেনার পর গ্যারেজে গাড়িটার যখন কাজ করিয়েছিল, পিছনের সাফারি কেনে ওয়ান্ডারগার্ড লাগিয়েছিল। রাবারগার্ড দুটোর নিচটা [illegible] ডিজাইন করে ঝাটিয়েছিল গ্যারেজের মিস্ত্রিকে দিয়ে। নতুন বিঙ্কনেসে নামার আগেও থেকে ওয়ান্ডারগার্ডটাকে দেখতে সুন্দর করতে চেয়েছিল। সেটাই এখন লরিটাকে চেনার উপায়। তিল-আঁচিলের মতো জন্মদাগ। চুরির পর যতই ভোল বদলানো হোক গাড়িটার, ওয়ান্ডারগার্ড সরানোর কথা মাথায় আসবে না। অভিজিৎ একথা জানে, লরিটাকে কলকাতার রাস্তায় দেখতে পাওয়া একটা চান্স ফাইভ। সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। সে গাড়ি এখন হয়তো খাটছে বিহার, ওড়িশা, হরিয়ানা কিংবা অন্য কোনও রাজ্যে। তবু লরিটাকে খোঁজে অভিজিৎ, মনে হয় আচমকা একদিন দেখতে পেয়ে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গে ইনফর্ম করবে পুলিশকে। ক'দিনের মধ্যেই ফেরত পাবে গাড়ি। ব্যর্থতার ক্ষতে প্রলেপ পড়বে। কখনও আনমনে অভিজিৎ স্বপ্ন দেখে হারিয়ে যাওয়া নিজের সেই লরি চালিয়ে পাড়ায় ঢুকছে সে। বাবা একমুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দায়।

ক'দিন হল স্বপ্নটা আর দেখে না। যেদিন থেকে বাজির কথা জানল, পর্ণার দেওয়া বর্ণনা মেলাতে অভিজিৎ সেদিন বিকেলেই রথতলার রকের সামনের রাস্তায় সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করেছে। রকের জটলার মধ্যে শনাক্ত করেছে ছেলেটাকে। এখন লরির বদলে কলকাতার রাস্তায় বাজিকে খোঁজে অভিজিৎ। সতর্ক নজর বোলায়, দেখে ছেলেটা তাকে ফলো করছে কি না। অভিজিৎকে ঠিকঠাক ফলো করলে পর্ণার হদিশ পেয়ে যাবে, যা কিছুতেই পেতে দেওয়া যাবে না।

অভিজিৎ এখন বাসে চেপে মহেশতলা যাচ্ছে। খোকনের গ্যারেজ ওখানেই। আজ অফিসে ঢুকে বসকে বলেছিল, "আজ হাফ ডে ছুটি পেলে ভাল হয়। পিজিতে এক রিলেটিভ ভর্তি আছে, দেখা করতে যেতে পারি।"

বস না করেনি। অফিস ক্যান্টিনে লাঞ্চ সেরে নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটের মুখে এসে বাস ধরেছিল। বাস ধরতে আসার আগে হঠাৎ-হঠাৎ পিছন ফিরে দেখে নিচ্ছিল, কেউ ফলো করছে কি না। বাজি নিজে ফলো না করে চর লাগাতে পারে। বাসটায় উঠেছে স্টপ ছেড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে। তারপরও দৌড়তে-দৌড়তে এসে বিভিন্ন বয়সের তিনজন উঠেছিল বাসে। তাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল অভিজিৎ। একটা ছেলেকে তো খুবই সন্দেহ হচ্ছিল। বাস যিদিরপুর পৌঁছনোর আগেই তিনজন আলাদা-আলাদা স্টপে নেমে গিয়েছে। একটু রিল্যাক্সড ফিল করছে অভিজিৎ। বসার সিট পেয়েছে অনেক আগেই। রাস্তায় চোখ রাখছে মাঝে-মাঝেই, কোনও মোটরবাইক ফলো করছে না তো! বাজির বাইক হলে এক চান্সে চিনে যাবে। পর্ণা বলেছিল বাইকটার রং লাল। রথতলার আড্ডার পাশে চারটে বাইক ছিল, একটারই রং লাল। মডেল, গাড়ির নাম্বার সব এখন অভিজিতের জানা।

একটা নোংরা, লুচ্চা ছেলের ভয়ে এভাবে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে বলে খুবই আত্মগ্লানিতে ভুগছে অভিজিৎ। ঘটনাটায় যদি নিজের বউ জড়িয়ে না থাকত, ছেলেটাকে মেরে পাড়া থেকে তাড়ানো কোনও ব্যাপারই ছিল না। মারপিটে এক সময় যথেষ্ট হাতযশ ছিল অভিজিতের। বাজিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা পাড়ায় এখনও কয়েকজন লোকের আছে। তাদের কাছে গিয়ে কী বলবে অভিজিৎ? আমার বউকে বদনাম করার জন্য এইসব ভিডিয়ো বানিয়ে পাড়ায় ছড়িয়েছে ছেলেটা। পাড়ার সাহসী ব্যক্তি তখন যদি বলে, ভিডিয়োর বউটা যে তোর বউ নয়, প্রমাণ করতে পারবি? আর ভিডিয়োর মেয়েটা তোর বউই হয়, আর ওকে বদনাম করার কী আছে! ও যা সেটাই পাড়ার লোক জানছে।

নোংরা ভিডিয়োর মেয়েটা যে পর্ণা নয়, প্রমাণ করতে পারবে না অভিজিৎ। কারণ, ফুটেজটা সে দেখেনি। দেখে সহ্য করার মতো ক্ষমতা তার নেই। একদিন অফিস থেকে ফার কে বাড়ি ফিরছে, শীতলের চা দোকানে তখনও তিন-চারজন কাস্টমার। স্কুলের বন্ধু প্রণব উঠে এসেছিল তাদের মধ্যে থেকে। বলল, "দাঁড়া অভি, আমিও বাড়ি যাব।" কী বলে এড়াবে অভিজিৎ? নেমে পড়েছিল সাইকেল থেকে। দু'জনের বাড়ি একই রাস্তায়। প্রণব পাশে হেঁটে শুরু করেছিল। বলেছিল, "তুই মাইরি এভাবে ফেঁসে যাবি, ভাবতেই পারিনি। আমাদের মধ্যে তুই ছিলিস সবচেয়ে স্মার্ট। স্টার তোর ফেভারে যাচ্ছে না। তা এখন কী করবি ভাবছিস?"

"কী করব মানে?" অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল অভিজিৎ।

প্রণব বলেছিল, "বউটার কী ব্যবস্থা করবি? বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছিস তো? ডিভোর্স দেবে? নয়তো আবার কোর্ট-কাছারি করতে হবে তোকে।"

বেশ কিছু সিদ্ধান্ত প্রণবই নিয়ে ফেলেছে দেখে বিরক্ত হচ্ছিল অভিজিৎ। বলেছিল, "আমার বউয়ের দোষটা কোথায়, তা তো বুঝতে পারছি না। কেউ নুড ফিগারের উপর বউয়ের মুখটা বসিয়ে দিয়ে যদি ভিডিয়ো বানায়, তাতে ওর কী করার আছে?"

"তুই নিশ্চয়ই ভিডিয়োটা দেখেছিস। শিয়ার তোর বউ নয়?" কৌতূহল ভরে জানতে চেয়েছিল প্রণব।

"দেখিনি।" সাইকেল গড়িয়ে নিয়ে যেতে-যেতে রাস্তায় চোখ রেখে বলেছিল অভিজিৎ।

প্রণব বলল, "তা হলে থানায় কী দেখিয়ে কমপ্লেন করলি?"

"কিছু দেখাইনি। বলেছি, ভিডিয়ো ছড়িয়ে আমার বউয়ের চরিত্রহনন করা হচ্ছে। সাইবার ক্রাইম। কমপ্লেন অবশ্য আমার বউ করেছে। আমি পাশে ছিলাম।"

অভিজিতের কথা শেষ হতেই প্রণব পরামর্শ দেয়, "একবার ভিডিয়োটা দ্যাখা। যদি বলিস, আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তখন দুধ কা দুধ, পানি কা পানি ক্লিয়ার হয়ে যাবে।"

ঠকিতে অভিজিতের চোখ চলে গিয়েছিল প্রণবের হাতে, বড়সড় মোবাইল মুঠোয় ধরা, যেন কোনও বিষাক্ত সাপ। অভিজিৎ নিশ্চিত, ওতেও আছে ক্লিপিংসটা। প্রণব বহুবার দেখেছে। অভিজিৎ চাইলে এক্ষুনি দেখাবে। কেমন যেন নার্ভাস লাগছিল অভিজিতের। বলে উঠেছিল, "সিনেমার ওসব কারিকুরি আমি কী করে বুঝব! সব কিছু কত

BANGLADARSHAN.COM

অ্যাডভান্সড হয়ে গিয়েছে। পুলিশ একটা আলাদা ডিপার্টমেন্টই খুলে ফেলেছে। আমরা কমেন্স জানিয়েছি, ওদের কাজ ওরা করবে।"

"তা অবিশ্যি ঠিক।" বলে ঢেঁকি গিলেছিল প্রণব। অভিজিৎ পৌঁছে গিয়েছিল বাড়ির সামনে। প্রণবকে বলেছিল, "ঢুকি তা হলে? তোর বাড়ির সব ভাল তো?"

"হ্যাঁ, বাবা-মা ভালই আছে। যথেষ্ট সেবাযত্ন করে আমার বউ। ছেলেমেয়ের লেখাপড়াও ভালই। ওই দ্যাখো। টাকা রোজগার ছাড়া সংসারের জন্য আমাকে প্রায় কিছুই করতে হয় না। বউটা গ্রামের, দেখতে-শুনতে স্মার্ট না হলেও বেশ কাজের আছে।"

প্রত্যুত্তরে দেঁতো হেসে সাইকেলের হ্যান্ডেল বাড়ির দিকে ঘুরিয়েছিল অভিজিৎ। পর্ণাকে উদ্দেশ্য করেই খোঁচাটা মেরেছিল প্রণব। বন্ধুর বউ সুন্দরী, তাই নিয়ে হিংসে ছিল, এখন খুব মজা পাচ্ছে।

তবে প্রণবের কথায় একটা ইচ্ছে তীব্রভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, অভিজিৎ ভাবতে থাকে, কীভাবে জানবে ভিডিয়োটায় কারিকুরি আছে, না নেই? মেয়েটা কি গোটাটাই পর্ণা। চোখের দেখায় প্রাথমিক বিচার করার মতো মনের জোর অভিজিতের নেই। ভিডিয়োতে যদি এক সেকেন্ডের জন্যও উলঙ্গ পর্ণাকে দেখে, বিচারবুদ্ধি লোপ পাবে তার। হয় সে আত্মহত্যা করবে, নয়তো পর্ণাকে খুন। কিন্তু সত্যি-মিথ্যে জানাটাও তো দরকার। মাথায় এসে গিয়েছিল নিরুপমের কথা। অফিসে অভিজিতের জুনিয়র। সিনেমা-টিভি সিরিয়ালে মাঝে-মাঝে স্ক্রিপ্ট লেখে। অফিসে ঘটনাটা যেহেতু চাউর হয়নি, একদিন টিফিনটাইমে নিরুপমকে আলাদা করে ধরেছিল অভিজিৎ। নিচুগলায় জানতে চেয়েছিল, "হ্যাঁ রে, এই যে সব ব্লু ফিল্ম তৈরি হয়, যাতে কখনও-কখনও এর বউর সঙ্গে অন্যের মুখ জুড়ে দেয়। বানাতে খরচ হয় কেমন?"

চোখ প্রায় কপালে উঠেছিল নিরুপমের। বলেছিল, "তা তুমি এসব জেনে কী করবে? এ তো তোমার জগতের জিনিস নয়!"

"তুই বল না। আমার জন্য জিজ্ঞেস করছি না। বিশেষ দরকার আছে।" সিরিয়াস মুখ করে বলেছিল অভিজিৎ।

নিরুপম বলতে থাকে, "ব্যাখো, স্টিল ফোটোতে কম্পিউটারের ফোটোশপের সাহায্যে একটা ছবিতে এরকম সুপারইমপোজ সহজেই করা যায়। যে নিজে কাজ জানে, তার তো কোনও খরচই লাগছে না। কিন্তু একটা পনেরো-কুড়ি মিনিটের ভিডিয়ো মানে হাজার-হাজার ফ্রেম। প্রত্যেকটায় নিখুঁতভাবে জুড়তে হবে বডির সঙ্গে মুখ, মানে বিরাট কাণ্ড। একটা-একটা জোড়া প্রায় অসম্ভব। বাজারে তাই নতুন সফ্‌টওয়্যার আমদানি হয়েছে। কম পরিশ্রমে যাতে গোটা ভিডিয়োতে সুপারইমপোজ করা যায়, সেই সফ্‌টওয়্যারের দাম তেমনই।"

"কত হতে পারে?" প্রশ্ন করেছিল অভিজিৎ।

নিরুপম বলেছিল, "আমি তো ঠিক ওই লাইনে যুক্ত নই। এণ্ডুয়াই দাম বলতে পারব না। তবে বেশ কয়েক লাখ টাকা তো হবেই। তারপর যে-টেকনিশিয়ান ওই সফ্‌টওয়্যারটা ইউজ় করতে জানবে, তার রেটও হবে হাই। সে যদি নিজে ব্যবসাটা করে, তখন বানানোর খরচাটা বেঁচে যাবে। আসলে গোটা ব্যাপারটাই তো বেআইনি। টেকনিশিয়ানকে দিয়ে যদি কেউ বানায়, বিষয়টা গোপন রাখার জন্যও আলাদা করে টাকা দেবে। খরচের অবশ্য মা-বাপ নেই। তবে লাভ হয় বলেই না এই ধরনের কাজকারবার নেমে করে।"

সব শুনে অভিজিৎ বুঝে গিয়েছিল ভিডিয়োটা বানাতে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। তখন জানত না কে বানিয়েছে। এখন জানে। বাজির কি এত টাকা আছে? নিরুপম কথা শেষ করে জানতে চেয়েছিল, "এখন কি বিশেষ দরকারটা বলা যাবে?"

উত্তরে অভিজিৎ বলে, "আসলে এটা আমার এক বন্ধুর ব্যাপার। আমাকেও পুরোটা ভেঙে বলেনি। বিষয়টা জানতে বলেছিল। আমার থেকে শুনেছিল তুই সিনেমা-সিরিয়াল লাইনে আছিস।"

নিরুপম আর ঘাঁটায়নি অভিজিৎকে, হয়তো সৌজন্যবোধ থেকেই। এখন অভিজিতের মাথায় ঘোর। একটাই প্রশ্ন, ভিডিয়োটা বানানোর মতো টাকা বাজি পেল কোথায়? পর্ণার মুখে শুনেছে বাউন্সারের কাজ করত। তাতে এত ক'টাকা মাইনে? হয় ও খুব বড়লোক বাড়ির ছেলে, নয়তো দু'নম্বরি কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে। খোঁজ নিয়ে যদি জানা যায়, এর কোনওটাই নয়, তা হলে ভিডিয়োর মেয়েটা পর্ণা। কারিকুরি ছাড়া ভিডিয়োতে তেমন কোনও খরাপই নেই। কিন্তু পর্ণা কি এই কাজ করবে? একবছরের উপর হয়ে গেল মেয়েটাকে দেখছে অভিজিৎ, কখনও কোনও বেচাল চোখে পড়েনি। সেক্স করার সময়ও মনে হয়নি, পূর্বে কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। বরং একটু যেন আড়ষ্টই থাকে, এগুলো কি অভিনয়? ধরা যাক, তাই। ভিডিয়োটা লুকিয়ে তুলে পর্ণাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার তো কিছুতেই মিলছে না। পর্ণার মতো রুচিশীল মেয়ে কেন বাজির মতো একটা লোয়ার ক্লাসের ছেলের সঙ্গে সহবাস করতে যাবে? পর্ণার যদি সত্যিই গুরুকম কিছু করার অভিরুচি থেকে থাকে, তা হলে বাজির সঙ্গে ফাইট করারও ক্ষমতা থাকত। ছেলেটাকে অত ভয় পেত না। অভিজিৎ কাল তখন অফিসে, ফোন এল হোটেল থেকে। রিসেপশনের ছেলেটাই করেছিল। বলল, "স্যার, আপনার গুয়াহিফের কি কোনও প্রবলেম মানে মেন্টাল কিছু আছে? ওকে দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে আমাদের।"

বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল অভিজিৎ। জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন? কী হয়েছে?"

হোটেলের লোক এবং পরে পর্ণার থেকে যা জানা গেল, তা মোটামুটি এইরকম, অভিজিৎ যেহেতু রিসেপশনে বলে এসেছিল বউকে খেয়াল রাখতে, ওরা নির্দেশ মানতে গিয়ে দরজায় নক করেছিল, পর্ণাকে জিজ্ঞেস করবে, "ম্যাডাম, কিছু লাগবে?"

তিনবার নক করার পরও যখন সাড়া পাওয়া যায়নি, সার্ভিসবয় গিয়ে রিসেপশনে নিজের আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল, ম্যাডামের বোধ হয় কিছু হয়েছে। কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

রিসেপশনের ছেলেটা তক্ষুনি কোনও স্টেপ নেয়নি। ভেবেছিল, রোগীকে ডিসটার্ব করা উচিত হবে না। হয়তো ঘুমোচ্ছেন। ম্যাডাম, বাথানেকে বাদে মনে হয়েছে, না, যাই। স্যার বলে গিয়েছেন, খেয়াল রাখতে। রুমে এসে টোনা নক করেছিল ছেলেটা। সাড়া না পেয়ে হাঁকডাক শুরু করে। গলার শব্দ পেয়ে দরজা খুলেছিল পর্ণা। ম্যাডামের ভয়ার্ত চেহারা দেখে ছেলেটার লোকেরাই ভয় পেয়ে যায়।

পর্ণা স্বাভাবিক হতে সময় নিয়েছিল। দরজা খোলার পর অল্প সময়ের জন্য জ্ঞানও হারায়। মুখে জলটল ছিটিয়ে ওকে সুস্থ করে অভিজিৎকে ফোন করেছিল রিসেপশনের ছেলেটা। পর্ণা ঠিক কতটা চাপের মধ্যে আছে, বুঝতে না দিয়ে অভিজিৎ ছেলেটাকে বলেছিল, "চিন্তা করবেন না। ওর মাঝে-মাঝে নার্ভাস ব্রেকডাউন মতো হয়। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরার চেষ্টা করছি।"

অফিস শেষ করেই হোটেলে ফিরেছিল অভিজিৎ। কাল এক দালাল গড়িয়ার দিকে বাড়ি দেখাবে বলেছিল। সেখানে আর যাওয়া হয়নি। হোটেলের রুমে এসে অভিজিৎ পর্ণাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন এত ভয় পেলে হঠাৎ? কী হয়েছিল?"

উত্তর শুনে বোঝা গেল তেমন কিছুই হয়নি। বাজির আতঙ্ক সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে ওকে। দরজায় আওয়াজ শুনে মনে হয়েছিল, ওর হদিশ পেয়ে বাজি উঠে এসেছে উপরে। এই আচরণে কোনও অভিনয় নেই। দরজায় কেউ নক করবে, পর্ণা জানতই না। অভিনয়ের জন্য খানিক পরিকল্পনার দরকার হয়। এতেই মালুম হয় পর্ণা অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির মেয়ে। বাজি ওকে পছন্দ করেছিল। প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু ছেলেটা যে এরকম চরম শোধ তুলবে, পর্ণা ধারণা করতে পারেনি। মনের স্থিতি হারিয়ে ফেলেছে বেচারি।

রাতে পর্ণা একবার বলেছিল, "তোমার বিশ্বাসায় যাই? আমার বড্ড ভয়-ভয় করছে। ঘুম আসছে না।"

ভিডিয়ো নিয়ে সন্দেহটা এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি অভিজিৎ। পর্ণা কায়াকাছি থাকলেই শারীরিক অস্বস্তি হবে তার। তাই বলেছিল, "ঘুমনোর চেষ্টা করো। একই ঘরে তো আছি। দরজাও বন্ধ

আছে।"

পর্ণার আগে ঘুম ভেঙেছিল অভিজিতের, দেখেছিল মেয়েটা একেবারে কুঁকড়েমুকড়ে ঘুমোচ্ছে নিজের বিছানায়। মায়া লেগেছিল। তখনই অভিজিৎ স্থির করে, একবার খোকনের কাছে যেতে হবে। ওর সাহায্য নিয়েই বাজিকে পর্ণার জীবন থেকে তাড়ানো সম্ভব।

খোকনের সঙ্গে আলাপ পুরীতে, হোটেলের ব্যবসা করতে গিয়ে। খুবই চৌখস ছেলে। অভিজিতের মতো খোকনও পুরীর একটা হোটেল লিজ নিয়েছিল। হঠাৎই হোটেলের ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মহেশতলায় মামার গাড়ি সারাইয়ের গ্যারেজে ঢুকলে। অভিজিৎ অবাক হয়ে বলেছিল, "হোটেল মালিক থেকে একেবারে পাতি মেকানিক হয়ে যাবি?"

"হওয়ার কারণ আছে, পরে বুঝবি। আর হোটেলের ব্যবসায় যে খুব একটা উন্নতি করা যাবে না, সেটা মামার কাছে এখন পরিষ্কার।"

"প্রচুর ক্যাপিটাল থাকলে তবেই লাভের মুখ দেখা সম্ভব," বলেছিল খোকন। দুবছরই ছিল খুব। হোটেলের ব্যবসায় হালে পানি পেল না অভিজিৎ। লস করে সরে আসতে হয়েছিল। খোকনের লস হয়নি। ঠিক সময়ে লিজ ট্রান্সফার করতে পেরেছিল। মামার গ্যারেজে ঢুকল ছুঁড় হয়ে, এখন ফালা। মামা অবিবাহিত। কিউনির অসুখ ধরা পড়েছে শুনে খোকন সিদ্ধান্ত নেয় গ্যারেজে ঢুকবে। রোগশয্যায় মামার খুব সেবা করে গ্যারেজটা নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যেই মারা গেল মামা। খোকন এখন মালিক। হোটেল বিক্রনেসে লস খেয়ে অভিজিৎ যখন বেকার বসেছিল, মাঝে-মাঝে আসত খোকনের গ্যারেজে। অন্য কী বিজনেস করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করত। খোকনই একদিন খবর দিল, ভাল কন্ডিশনে একটা পুরনো লরি বিক্রি আছে। কিনে নিতে পারিস। আমি যখন এ লাইনে আছি, গাড়ির সার্ভিসিং-এ কোনও ফাঁকি থাকবে না, খরচাও কম পড়বে। ভাড়াও টুকটাক জোগাড় করে দিতে পারব। তারপর তোরও নিজস্ব একটা ফিল্ড তৈরি হয়ে যাবে।

গাড়ির বিজনেসের সবচেয়ে ঝুঁকির দিকটা নিয়ে দুই বন্ধুই ভাবনা ঘামায়নি। গাড়ি মানে, গোটা মুলুকটাই রাস্তায় গড়াচ্ছে। হারিয়ে গেলে সব গেল। লরিটা শুভাবে চোট খাওয়াতে খোকনের মনটাই আপ্সেট আছে। গাড়িটার খোঁজ পেতে অভিজিতের সঙ্গে খোকনও খুব দৌড়োদৌড়ি করেছিল। শুধু পুলিশের উপর ভরসা রাখেনি, অন্ধকার জগতের লোকদের কিছুও খোঁজ তল্লাশ চালিয়েছে। কলকাতার অনেক গুন্ডা-মস্তানকে চেনে খোকন। বাজিকে শায়েস্তা করার জন্য ওরকমই কোনও লোক চাই। খোকনকে ব্যবস্থা করতে বলবে অভিজিৎ। সমস্যা একটাই, খোকন জানতে চাইবে বাজির অপরাধটা কী? সেটা বলা যাবে না। অন্য কোনও গল্প বানাতে হবে। ব্যাপারটা বলে নিজের সম্মান আর খোয়াতে চায় না অভিজিৎ। গল্পটা কী বলবে, এখন অবধি ভেবে পায়নি।

"দাদা, আপনার ফোন বাজছে।" ডানপাশে বসা সহযাত্রী সামান্য ঠেলা দিয়ে বলল অভিজিৎকে।

শশব্যস্ত হয়ে শার্টের পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে অভিজিৎ। এতটাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, ফোন বাজছে শুনতে পায়নি। স্ক্রিনে নীলুর নাম। ওর এখানকার নাম্বার। নীলুই করেছে, নাকি মেজকার বাড়ির অন্য কেউ? বাবার ব্যাপারে কোনও খবর দেবে? ভাবনার মাঝে সেট কানে নিয়ে 'হ্যালো' বলল অভিজিৎ। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল, "অভিদা, নীলু বলছি।"

"জানি রে, নাম্বারটা সেভ করা আছে।"

"হ্যালো বললে দেখে ভাবলাম... যাই হোক, তুমি এখন কোথায়?"

"অফিসে।"

"অফিসের ভিতরে নেই মনে হচ্ছে, ট্র্যাফিকের আওয়াজ পাচ্ছি।"

"আজে বেরিয়েছি, অফিসেরই। তুইও বাড়িতে নেই মনে হচ্ছে, গাড়ি চালাচ্ছিস?"

"হ্যাঁ, তোমার কাছে যাচ্ছি। তোমাদের অফিস আগের বিল্ডিংটেতই আছে তো!"

"চিনতে পারবি বিল্ডিংটা? আগে কখনও এসেছিলি?"

"এসেছিলাম। ভুলে গিয়েছ তুমি।"

"তা আমার কাছে আসছিস কেন? হঠাৎ কী দরকার পড়ল?"

"দেখা করে বলব। ক'টা নাগাদ ফিরছ অফিসে?"

"আসলে অফিসে না গেলেই ভাল। হেরেছি। যে কাজ নিয়ে বেরিয়েছি, অনেকটা সময় লাগার কথা। আমার অবশ্য অতটা লাগবে না। তুই রবীন্দ্রসদনের সামনে এসে দাঁড়া, হয়তো একটু ওয়েট করতে হতে পারে। আমি আসছি।"

"ঠিক আছে।"

"আর হ্যাঁ, তুই কি নিজে..."

কথা শেষ করতে পারল না অভিজিৎ, ফোন কেটে দিয়েছে নীলু। অভিজিৎ জানতে চাইছিল নীলু একা আসছে? না সঙ্গে কেউ আছে? ড্রাইভার নিশ্চয়ই নিয়েছে, আমেরিকার ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে এদেশে গাড়ি চালানো যাবে না। এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার সময় চালিয়েছে, পাশে এদেশের লাইসেন্সওলা অভিজিৎ ছিল বলে। পুলিশ ধরলে যা হোক করে ম্যানেজ দেওয়া যেত।

ব্রিজের উপর উঠে পড়েছে বাস। 'খালপোল, খালপোল' বলে চেঁচাচ্ছে কন্ডাক্টর। অভিজিৎ ফের একবার ভাল করে প্যাসেঞ্জারদের উপর চোখ বুলিয়ে নেয়, এদের মধ্যে অনুসরণকারী নেই তো? দুটো স্টপ পরেই খোকনের গ্যারেজ। চকমারি স্টপে নেমে পড়ল অভিজিৎ। এটা গ্যারেজের স্টপ নয়। এর পরে জলকলে খোকনের গ্যারেজ। সতর্কতার কারণে আগের স্টপে নেমেছে, দেখবে কেউ ফলো করছে কি না। কেউ করছে না, চকমারিতে একা অভিজিৎ নামল। রাস্তার ধার ধরে হেঁটে চলেছে। খোকন অপেক্ষা করছে অভিজিতের জন্য। অফিস চুকেই খোকনকে ফোন করেছিল অভিজিৎ। বলেছিল, "তোর সঙ্গে কিছু আর্জেন্ট কথা আছে। ক'টা নাগাদ যাই বল তো গ্যারেজে?"

"তোর যখন সুবিধে, চলে আয়। আমি রাত অবধি থাকি।" বলেছিল খোকন।

"ঠিক আছে, বিকেল চারটের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছি।" বলে রেখেছে অভিজিৎ। এখন হাতঘড়ি বলছে তিনটে পঁয়তিরিশ। ভালই হয়েছে তাড়াতাড়ি চলে এসে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। নীলু অপেক্ষা করবে। কেন যে হঠাৎ দেখা করতে আসছে, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।

খোকনের গ্যারেজে বহুদিন পর এল অভিজিৎ। বেশ ঝকঝকে লাগছে। বেড়েছে কর্মচারী। সকলেই কাজে ব্যস্ত। খোকনকে নিয়ে গ্যারেজের প্রান্তে ফাঁকা জায়গা দেখে বসেছে অভিজিৎ। দুটো চেয়ার দিয়ে নিয়েছে খোকনের কর্মচারী। গ্যারেজে পা দিতেই, 'আয় আয়' বলে সাদরে ডেকে নিয়েছিল খোকন। কাষ্ঠহাসি দিয়ে সৌজন্য সেরে অভিজিৎ বলেছিল, "কথাগুলো একটু প্রাইভেট, ফাঁকা দেখে বসলে ভাল হত।"

কথা শেষ করে এইদিকে তাকিয়েছিল, যেখানে এখন বসে আছে। খোকন চায়ের অর্ডার দিল। চা আসার ফাঁকে খোকন বলল, "কী ব্যাপার? তোকে এরকম শুকনো-শুকনো লাগছে কেন? কোনও ব্যাপারে টেনশনে আছিস? সেই নিয়েই কিছু বলবি?"

গোড়াতেই প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিল অভিজিৎ। সন্দেহ কাটানোর জন্য খোকনকে বলে, "চেহারার আর দোষ কী বল? প্রাইভেট কোম্পানি, কয়েক ঘন্টার জন্য ছুটি চাইলাম। তার আগে তেড়ে ঘাটিয়ে নিল।"

এর পর কুশল বিনিময়, একে অপরের বাড়ির খবর নেওয়ার মাঝে চা এল। চা শেষ করে খোকন বলল, "বল, কী বলবি?"

বাজির দোষ নিয়ে এখনও কোনও গল্প ভাবা হয়নি। ফাঁকা ভাঁড় ফেলে সিগারেট প্যাকেট বের করে অভিজিৎ। খোকনকে একটা দিয়ে নিজে ধরাল। বলতে তো এবার হবেই, দেখা যাক মাথায় কিছু আসে কিনা? শুরু করে অভিজিৎ, "ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে একটা ছেলেকে

BOI-POLL.COM

মারতে হবে। গুন্ডা জোগাড় করে দিতে হবে তোকে।"

"মারতে হবে মানে কি একেবারে ফিনিশ?"

"না, না। উত্তম-মধ্যম খোলাই, তার সঙ্গে প্রাণে মারার হুমকি।"

"ছেলেটা কেঃ কী করেছেঃ"

"কী করেছে সেটা কি বলতেই হবেঃ ব্যাপারটা গোপন রাখতে পারলে ভাল হয়।"

"আরে! গুন্ডাটাকে তো বলতে হবে, নয়তো কী বলে হুমকি দেবেঃ ও তো বলবে, এই কারণে তোকে মারছি। কাজটা যদি ফের করিস, শেষ করে দেব।"

মাথায় গল্প এসে গিয়েছে অভিজিতের। বলতে থাকে, "আর বলিস না, বড়লোক বাপের এক ছেলে আমাদের পাড়ায় এসে থানা গেড়েছে। দেদার খরচ করে পাড়ার ছেলেদের পিছনে। বাইক নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েদের স্কুলের কাছে গুদের আড্ডা। মেয়েদের উত্ত্যক্ত করছে খুব। একটা মেয়েকে বিশ্রিভাবে জালে ফাঁসিয়েছে বেপাড়ার ছেলেটা।"

"কীরকম?" গুরুত্ব সহকারে জানতে চায় খোকন। গল্পটা তার মানে বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে। দেব শুরু করে অভিজিৎ, "টুয়েলভ্‌তে পড়ে মেয়েটা। ছেলেটার চাকচিক্য দেখে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। গুর বাইকে ঘুরেছে। স্কুল কামাই করে এদিক-সেদিক গিয়েছে। একসময় মোহভঙ্গ হয়েছে মেয়েটার, যখন জানতে পেরেছে ছেলেটা বিবাহিত, একটা বাচ্চাও আছে। সম্পর্ক শেষ করতে চাইছে মেয়েটা, ছেলেটা হতে দেবে না। মোবাইলে গুদের দু'জনের ঘনিষ্ঠ কিছু ছবি আছে ছেলেটার কাছে, গুগুলো দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করছে।"

"বাধ, এ জিনিস তো আকছার হচ্ছে। এর মধ্যে নিজেকে এতটা জড়াচ্ছিস কেন তুইঃ গুন্ডা দিয়ে মার খাওয়ানোটাও কিন্তু ক্রাইমের মধ্যে পড়ে।"

গল্পের দুর্বল জায়গাটা ধরে ফেলেছে খোকন, সেয়ানা ছেলে! আরও বিশ্বস্তভাবে সাজাতে হবে বিষয়টা। অভিজিৎ বলে, "দুলালদা মানে যার মেয়েকে নিয়ে ঘটনা। মানুষটা ছাপোষা, একেবারেই নিরীহ লোক। পুলিশের কাছে যেতে পারছে না, পাছে ব্যাপারটা স্ক্যান্ডেলাইজ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পরে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে না। প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছে। দুলালদাকে ছোট থেকে দেখছি, প্রায় নিজের দাদার মতো। এমন ভেঙে পড়ছে, খুবই খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা করা উচিত। তা ছাড়া পাড়ার পরিবেশটাও নষ্ট হচ্ছে ছেলেটার জন্য, ওকে শায়েস্তা করা দরকার।"

"বুঝলাম। কিন্তু তোর দুলালদা বলছিস ছাপোষা লোক, গুন্ডা লাগানোর খরচ দিতে পারবে?"

আবার নড়বড়ে পয়েন্ট ধরল খোকন। সময় নষ্ট না করে অভিজিৎ বলে, "খরচা করতে হলে, যেভাবে হোক করবে। মেয়েটাকে তো বাঁচাতে হবে। কত টাকা লাগতে পারে বলে তোর মনে হয়ঃ"

"সে আমি কথা না বলে কী করে বলবঃ তবে ছাপোষা মানুষদের পক্ষে এদের অ্যাফোর্ড করা বেশ কঠিন। এ তো আর পাড়ার ফুটো মস্তান নয়, দু'-একশো টাকা আর এক বোতল মাল কিনে দিলে ছেলেটার উপর তোড় করে আসবে। তাতে ভদ্রলোকের পারপাস সার্ভ হবে না। ছেলেটা যখন পয়সাওয়ালা ঘরের, হয় ফুটো মস্তানকে কিনে নেবে, নয়তো অন্য কাউকে লেলিয়ে দেবে। আমি যাকে ফিট করব, তে তো পুলিশের চোখে ধুলো দিতে কাজটা করবে। তাই রিস্ক অনেক। টাকাও সেইজন্য বেশি।"

"সেসব বুঝেই তো তোর কাছে আসা। দ্যাখ কত বলে।"

"ছেলেটার অ্যাড্রেস, কোথায়-কোথায় ঠেক আছে, অবশ্যই ওর একটা ফোটো তোর কাছে রেডি রাখবি। যাকে কন্ট্যাইটা দেব, সে গুগুলো চাইবে।"

"ঠিক আছে, পারব দিতে। কাজটা নিখুঁতভাবে নামিয়ে দিতে পারবে তোঃ"

"পারার মতো লোককেই দেব। চিন্তা করিস না। এখন বল, এভাবে পরের গোলামি করেই কি জীবনটা কাটাবিঃ নাকি নতুন কোনও বিঞ্জনেস শুরুর কথা ভাবছিসঃ"

কোনও উত্তর দেয় না অভিজিৎ। অন্যদিকে তাকিয়ে একটু পরে বলতে থাকে, "চাকরি করতে একফোঁটা ভাল লাগে না। লরিটা যদি একবার সিরে পাই, ফের বিঞ্জনেসে নেমে পড়ব।"

"লরির বিঞ্জনেসঃ"

"না, অন্য যে-কোনও বিঞ্জনেস।"

"ঠিক বুঝলাম না। লরিটা বিক্রি করে ওই টাকায় বিঞ্জনেস করবিঃ"

"উঁহু! সেটা বলতে চাইনি। এত দিন পর লরিটার কী অভিশন থাকবে, কোঁচোছাড়ি করে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার পর যত টাকায় বিক্রি করব, দেখা গেল হাতে প্রায় কিছুই রইল না। তবু লরি ফেরত আসাটা আমার জন্য খুবই দরকার। বড় হওয়ার পর জীবনে যা কিছু করতে গিয়েছি, ফেল করেছি। মনোবলটাই শেষ হয়ে গিয়েছে।"

কথা বলতে-বলতে দুই বন্ধুই সিগারেট শেষ করেছে। অভিজিৎ আবার প্যাকেট বের করতে যাচ্ছিল। খোকন বলে, "এই তো খেলি। এত স্মোক করছিস কেন?"

পকেট থেকে হাত সরিয়ে নেয় অভিজিৎ। খোকন বোঝানোর ভঙ্গিতে বলে, "জীবনের ফেলিয়ারগুলো যদি ভুলতে না পারিস, কোনও দিন এগোতে পারবি না। প্রত্যেক মানুষের জীবনে ব্যর্থতা আসে, আমিও খানকতক বিঞ্জনেসে লস দিয়েছি। সবাই দেয়, কেউ কম, কেউ বা বেশি।"

"আমি প্রতিবার।" গাঢ় বিষাদের সুরে বলে অভিজিৎ।

বন্ধুর মনের ভার কাটাতে খোকন সহাস্যে বলে ওঠে, "বিয়ে-শাদি করেছিস, এবার একটা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আয়। জমিয়ে সংসার কর দেখি। অতীতের সব ব্যর্থতা ভুলে যাবি। জীবনটা অন্যরকম হয়ে যাবে।"

কপালে ভাঁজ ফেলে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করে, "তুই বিয়ে থা করছিস না কেন?"

প্রসঙ্গটি হাসতে থাকে খোকন। বলে, "জীবনে এত মেয়ের সঙ্গে মিশেছি। কোনও মেয়েকেই আর বিশ্বাস হয় না।"

"ও! তুই শুলে দোষ নেই, মেয়েটা শুলেই দোষ!" বলল অভিজিৎ।

হো হো করে হাসছে খোকন। হাসিতে শব্দ নেই কেন? অভিজিৎ খেয়াল করে তার কানে হাসির আওয়াজের বদলে নিজের ডায়ালগটাই রিপিট হয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার মেয়েরা বেশ পালটে গিয়েছে। প্রেমিকের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে অন্য ছেলেকে দেখছে স্পষ্টভাবে। কোনও আড়চোখের ব্যাপার নেই। রবীন্দ্রসদনের চওড়া সিঁড়ির একটাতে বসে আছে নীলার্ক। আয়হখা হয়ে গেল, এখানও আসেনি অভিদা। সিঁড়ির নিচের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে জোড়া-জোড়ায় ছেলে-মেয়ে। বেশির ভাগ মেয়েই ঘুরে তাকাচ্ছে নীলার্কর দিকে, বিশেশ থেকে সত্যিই কি চেহারাটা লালটু মার্কা হয়ে গেল? কে জানে! মেয়েগুলোর তাকানোতে প্রেমিকরা মোটেই ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হচ্ছে না। তারাও ঈর্ষাহীন দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে নীলার্কর উপর। ব্যাপারটা বেশ উপভোগ্য। অভিদার জন্য অপেক্ষাটা তাই বোরিং হচ্ছে না।

ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন শেখবার রবীন্দ্রসদন চত্বরে এসেছিল নীলার্ক। বিদেশে চলে যাওয়ার পর দুটিতে এসে অ্যাবাউটিতে নাটক দেখতে ঢুকলেও, এদিকটায় আর আসা হয়নি। এতদিন পর বলেই এখানকার মেয়েদের, একইসঙ্গে ছেলেদের বদলটা বড় করে চোখে পড়ছে। কলকাতার আরও সব জায়গায় মুক্ত হাওয়াটা নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়েছে। দেউলপুরের গ্রামগুলোতে পুরোপুরি পৌঁছয়নি। পৌঁছলে অভিদার ওউকে নিয়ে ইস্যুটা এত বড় আকার ধারণ করত না। জেঠুর পাশে এসে চিন্তু লোক অন্তত দাঁড়াত।

দেশে ফেরার পর নীলার্কই চারদিন সময় নিয়েছে জেঠুর কাছে যেতে। তনয়ার বাবার অপমানটাই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়েছিল। নীলার্কর হাত ধরে শিশুর মতো কাঁদছিল জেঠু। কোনওক্রমে শান্ত করে নীলার্ক

জানতে চেয়েছিল, "অভিদা, বউদি কোথায় আছে? বউদির বাপের বাড়ি?"

"না, সে মেয়ে বাপের বাড়ি যাবে না। অভি ওকে নিয়ে হোটেলে উঠেছে। কলকাতার দিকে বাড়ি খুঁজছে।" বলেছিল জেঠু।

নীলার্ক জিজ্ঞেস করে, "তুমি ওদের চলে যেতে বলেছ, নাকি ওরা নিজেরাই গিয়েছে? মানে, আমি বলতে চাইছি তুমি কি ফোর্স করেছ যাওয়ার জন্য?"

"কেন একথা জিজ্ঞেস করছিস?" পাল্টা প্রশ্ন করেছিল জেঠু।

নীলার্ক বলে, "অভিদা, বউদি যদি নিজেরাই ডিসিশন নিয়ে চলে গিয়ে থাকে, মনে করে আলাদা থাকলে শান্তিতে থাকবে, আমার কিছু বলার নেই। ওটা ওদের পার্সোনাল ব্যাপার। পারিপার্শ্বিক চাপে তুমি যদি ওদের বাধ্য করো যেতে, তা হলে বলব, ফিরে আসতে বলো।"

"আমি বাধ্য করিনি, বাধ্য হয়েছি ওদের যেতে বলতে। তুই তো তোর দাদার রোজগার আন্দাজ করতে পারিস, ওই মাইনেতে বাড়িভাড়া করে ভদ্রভাবে সংসার চালানো সম্ভব নয়। আমাকে হয়তো প্রত্যেক মাসে ভর্তুকি দিতে হবে। তবু আমি চাই না, বউমা এ বাড়িতে থাকুক। ও একা কোথাও গিয়ে থাকবে না বলে তোর দাদাকেও যেতে হয়েছে।" বলেছিল জেঠু।

নীলার্ক জিজ্ঞেস করে, "কেন চাও না বউদি এ বাড়িতে থাকুক? বউদির দোষটা কোথায়? কেউ তাকে বদনাম করার চেষ্টা করছে, তুমি কোথায় তার সহায় হবে, বদলে তাড়িয়ে দিলে!"

"ওর কারণে তো আমাকে সবাই ত্যাগ করেছে। তা ছাড়া, আমি ঠিক তাড়িয়ে দিইনি, শিফ্‌ট করিয়েছি। ভরণপোষণের দায়িত্বও আমাদের, মানে বাপ-বেটার।"

জেঠুর কথার উত্তরে নীলার্ক বলেছিল, "ভরণপোষণের দায়িত্বই সব নয়, মানুষের কাছে সম্মানটাও বড় কথা। তুমি তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লোকসমক্ষে দেখাচ্ছ, বাজে মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তাতে শুধু বউদির সম্মান নষ্ট হয়েছে, তা-ই নয়। যে-লোকটা অপরাধ করেছে, আনন্দ পেয়েছে খুব। জয়ের হাসি হাসছে।"

"আমি আর কী করতে পারি বল? ওই একটা মেয়ের জন্য আমাদের গোটা চাটার্জি পরিবারের সম্মানহানি হয়েছে। কেউই মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারছে না। বউমার সম্মান বাঁচাতে গিয়ে অন্যান্য আপনজনদের ছোট করতে পারি না আমি। এই যেমন ধর, তুই বাড়ি আসার চারদিন পর আমার কাছে এলি। হয়তো আগেই আসতে চেয়েছিলি, তোর বাবা-মা পারমিশন দেয়নি। ওরাও তো আমার কম আপন নয়। যখন দেখল বউমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তারপর আর তোকে আটকায়নি।" বলে থেমেছিল জেঠু। প্রকৃত ঘটনা বলতে যায়নি নীলার্ক, তাতে পরিস্থিতির কোনও রদবদল হত না। ফের জেঠুই বলতে শুরু করেছিল, "আর ক'টা দিন বাঁচব বল! শেষ বয়সটা যদি এরকম স্বজন-বান্ধবহীন হয়ে থাকতে হয়, তা হলে বেঁচে থেকে আর লাভ কী বল!"

জেঠুর ওরকম হাল ছেড়ে দেওয়া ভাবটা মেনে নিতে পারছিল না নীলার্ক। এই মানুষটাই একসময় কত মানুষের মনে সাহস যুগিয়েছে। নীলার্ক বলে উঠেছিল, "তুমি আরও একটু ফাইট দিলে পারতে। নিজের ভাইদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারতে, কেন তারা তোমাকে বয়কট করেছে? তোমার দোষটা কোথায়? বউদির অন্যায়টাই বা কী? শুধু বাড়ি নয়, পাড়ার লোকেদেরও তুমি একই কথা বলতে পারতে।"

"আসলে ঘটনাটা এমন একটা জিনিসকে কেন্দ্র করে, যা নিয়ে কিছু বলতে গেলে গা ঘিনঘিন করবে আমার," বলেছিল জেঠু। মুখে ফুটেছিল ঘেন্না।

নীলার্ক বলেছিল, "এই চালটাই তো চেলেছে অপরাধী। জানে, এরা ভদ্রলোক। বউটার সর্বনাশ করতে হলে এমন স্ক্যান্ডাল ছড়াও, যাতে এরা দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কেন লোকটাকে অবাধে অন্যায় করতে দেবে? লাইব্রেরি, দাতব্য চিকিৎসালয়, চন্ডীমন্দির করতে বাবা দিচ্ছিল জমিদারের বংশধর, তুমি করে ছেড়েছিলে। গ্রামে চাষাবাদের ক্ষতি হবে বলে, তুমি এখানে স্পঞ্জ আয়রন কারখানা খুলতে দাওনি। গ্রামের

রবীন্দ্রসদনের চওড়া সিঁড়ির একটাতে বসে আছে নীলার্ক। আবছায়া হয়ে গেল, এখনও আসেনি অভিদা।

AMARBOI.COM

লোকেদের নিয়ে লড়ে গিয়েছিলে, মনে আছে?"

"হুই তা হলে আমাকে কী করতে বলছিস, ওদের ফিরে আসতে বলব? বললেই যে তোর দাদা ফিরবে, মনে হয় না। সেও তো বউকে নিয়ে কম বিড়ম্বনার মধ্যে নেই। মাথা নিচু করে অফিস বেরয়। অন্ধকার হলে চোরের মতো ফিরে আসে।"

জেঠুর কথা শুনে নীলার্ক বলেছিল, "ঠিক আছে, আমি গিয়ে অভিদাকে বোঝাই। তুমি হোটেলের নামটা বলো।"

"নামটা তো বলোনি। শিয়ালদা'র দিকে কোনও একটা হোটেলে উঠেছে। অভিকে ফোন করে জেনে নে। তবে যাওয়ার আগে ভাল করে ভাব, তুই মাত্র দু'মাস থাকবি, আত্মীয়-পাড়ার লোককে হয়তো বোঝালি, আমাদের এইভাবে বয়কট করা ঠিক হচ্ছে না। তারা মেনেও নিল। সামনে পুজো আসছে। লোকে উৎসব অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে থাকবে। কিন্তু তারপর? পুজোও শেষ। তুইও চলে যাবি। আবার বউমার ব্যাপারটা যদি ইস্যু হয়ে ওঠে, আমি কার ভরসায় লড়ব? তোর দাদার আর সে মনের জোর নেই। জীবনে এত ধাক্কা খেয়েছে...."

জেঠুর কথায় যুক্তি ছিল, সত্যিই তো নীলার্ক ফিরে গেলে এখনকার পরিস্থিতির দায়িত্ব নেবে কে? এত বড় একটা সমস্যার সমাধান এই ক'দিনে করা সম্ভব নয়। জেঠুকে বলেছিল, "আচ্ছা, একটু চিন্তা করে দেখি। পরে তোমাকে জানাচ্ছি।" নীলার্ক পিছন দরজার চৌকাঠ অবধি চলে গিয়েছিল। গলার সুরে মজা মিশিয়ে জেঠু ডেকে ওঠে, "কী রে প্রণামটাই তো করতে ভুলে গেলি। তোর থেকে প্রণাম পাওয়া মানে তো বিরাট ব্যাপার।"

লজ্জা পাওয়ার হাসি হেসে জেঠুকে প্রণাম করে বেরিয়ে এসেছিল নীলার্ক। এভাবে ডেকে প্রণাম আদায় করাটা আসলে ভাইপোর সঙ্গে মশকরা। এর পিছনে একটা গল্প আছে। নীলার্ক তখন সবে কলেজে উঠেছে। বাড়িতে ঘোষণা করে দিল, আর কাউকে প্রণাম নয়। আমি যাকে শ্রদ্ধা করি, আচরণ দিয়েই সেটা বুঝিয়ে দিতে পারব। এত দিন ছোট ছিলাম বলে, যে-সব টিচারকে পছন্দ করি তা, তাদেরও বাধ্য হয়ে প্রণাম করতে হয়েছে, আত্মীয়-পাড়ার লোকেদের বেলাতেও তাই।"

বাবার তো মাথায় হাত। দেউলপুরের মতো ঐতিহ্যপূর্ণ গাঁ-গ্রামে প্রণামের চল একটু বেশিই। বাড়িতে বড়রা এলে ছেলে যদি পায়ে হেঁটে দিয়ে প্রণাম না করে, অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হবে। বাবা দৌড়েছিল জেঠুর কাছে। জেঠু এসে নীলার্ককে বলল, "হ্যাঁ রে, আমাদেরও প্রণাম লিস্টি থেকে বাদ দিলি?"

নীলার্ক গোঁ ধরে বসেছিল, কোনও উত্তর দেয়নি। জেঠু তখন বলল, "বয়সে বড় সবাইকে প্রণাম করবি। ভাল লোকেরা শান্তি পাবে, খারাপ লোকেরা লজ্জা। সেই একবারও অন্তত নিজেকে শোধরাবার কথা ভাববে। সেই সুযোগটা তাকে দিবি না কেন? তাতে তো সমাজেরই লাভ। ভাল লোকেদের শান্তি পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। এই যেমন ধর, তুই প্রণাম করলে যেমন শান্তি পাই, গর্বও হয় এই ভেবে, ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া ছেলেটার জেঠু হলাম আমি।"

কত সহজ-সুন্দর করে জেঠু সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিতে পারত। তারপর থেকে প্রণাম নিয়ে আর কোনও ছুঁতমার্গ ছিল না নীলার্কর। ওদেশে যখন বাড়ির কথা মনে পড়ে, জেঠুর কথা ভাবলে, পা-টাও স্পষ্ট দেখতে পায় নীলার্ক। জেঠু তার কাছে সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র।

মা কীভাবে জানি, জেনে গিয়েছিল নীলার্ক জেঠুর কাছে গিয়েছে। বাড়ি ফিরতেই বলেছিল, "কী বলছে তোর জেঠু, ছেলে-বউমাকে কোথায় পাঠিয়েছে?"

যা শুনে এসেছে, সেটাই বলেছিল নীলার্ক। তারপর মা এবং বাকি দু'জনের মনোভাব বোঝার জন্য বলেছিল, "ভাবছি, অভিদা-বউদিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। একটা ফ্ল্যাস ভিডিয়ো ছড়িয়ে দিয়ে কেউ বদমায়েশি করবে, আমরা সবাই সেটা মেনে নেব, এ হতে পারে না। ওই চক্রান্তকেই সাপোর্ট করা হয়ে যাবে।"

"ওটা যে ফ্ল্যাস, তুই কী করে শিয়োর হচ্ছিস?" প্রশ্ন তুলেছিল মা।

নীলার্ক বলেছিল, "ফ্ল্যাস যে নয়, সেটাও তো এখন অবধি প্রমাণ করে দেখায়নি। সকলেই ধরে নিচ্ছে, ওটা সত্যি। কম্পিউটারে কত কী করা যায়, তোমার ধারণা আছে?"

"না নেই। আমি সোজা একটা কথা বুঝি, পাড়ার আর কাউকে নিয়ে কিছু রটল না, ওই মেয়েটার বেলাতেই এরকম হল কেন? মেয়েটার সঙ্গে ওই রটনার কোনও যোগ তো আছেই।"

মায়ের কথার মাঝেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বাবা। ওয়াশরুমে গিয়েছিল, মা-ছেলের কথা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল ডাইনিংয়ে। নীলার্ক বলেছিল, "কী কারণে বউদিকে টার্গেট করা হয়েছে, সেটা না জেনেই তাকে সরিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। শুধু সে সরে যায়নি, অভিদাকেও বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। লোকে জবরদখল করা জমি ছাড়ে না, অভিদা চলে গেল খেয়িশা-মার্কা রটনার চাপে। সত্যিটা তো জানতে হবে!"

যুক্তিতে হেরে গিয়ে মা অনুরোধের সুরে বলে, "দ্যাখ, এটা তো একটা সৃষ্ট ব্যবস্থা হয়েছে। অভি বউকে নিয়ে আলাদা থাকবে, পাড়া-প্রতিবেশীর গঞ্জনা শুনতে হবে না, এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে! বিয়ের পর অনেকেই আলাদা করে সংসার পাতে। ধরে নে, এটা সেরকমই।"

"অভিদারা আলাদা হয়নি মা, করা হয়েছে। বাড়িঘর ছেড়ে থাকার কষ্ট আমি বুঝি। বদলে অন্য কিছু পাচ্ছি বলে সান্ত্বনা দিতে পারি নিজেকে। অভিদা তো অপমান ছাড়া কিছুই পায়নি, এটা ওর প্রাপ্য ছিল না। আলাদা থেকে ওরা ভাল থাকবে, এটাই বা ধরে নেব কী করে? ওখানেও তো ধাওয়া করতে পারে এই কেচ্ছাটা। ওদের দু'জনকে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে! আশপাশে নতুন প্রতিবেশী, কেউ ওদের বিশ্বাস করবে না। ঘোর বিপদে পড়ে যাবে।"

এর পর মা আর কিছু বলেনি। বাড়ির পরিবেশ গমগমে হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ফোন এল তনয়ার, "বিকেলে একবার দেখা করতে চাই।" নীলার্ক বলেছিল, "চলে এসো বাড়িতে।"

বাড়িতে নয়, বাইরে কোথাও। এমন কিছু কথা আছে, মাঝে কেউ এসে পড়লে অসুবিধে হবে। গাড়ি নিয়ে বেরোও, কোথাও একটা গিয়ে বসা যাবে," বলল তনয়া। গ্রামের ভিতর চারচাকা মাপের রাস্তা ধরে ধু ধু খেতের পাশে থেমেছিল নীলার্করা। চাষ পাহারা দেওয়ার বাঁশের মাচায় বসেছিল দু'জনে। আসার পথে বেশ সিরিয়াস ছিল তনয়া। দু'চারটে কেজো সাধারণ কথা বলেছে। যেমন, "তুমি অর্ধেক খাবার ফেলে রেখে এসেছ, মা খুব দুঃখ পেয়েছে।" তারপর বলল, "বাড়ির জন্য পুজোর বাজার করবে তো? কবে কলকাতায় যাবে? আমি-অলি দু'জনেই প্ল্যান করে রেখেছি অষ্টমীর ড্রেস সাউথসিটি থেকে কিনব। তুমি নিশ্চয়ই এবেলাও আমার গিফ্‌টটা নিয়ে বেরওনি?" যাদা নেড়ে "সরি" বলেছিল নীলার্ক। একটুও না রেগে তনয়া বলল, "ঠিক আছে, ফেরার পথে তোমাদের বাড়িতে ঢুকব, তখনই নিয়ে নেব।"

মাচায় বসে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল তনয়া। হাওয়া যথেষ্ট বইলেও ধানের মাঠে তেমন ঢেউ উঠছিল না। ফসলভারে নুইয়ে আছে গাছ। ধো শুরু করতে হয়েছিল নীলার্ককে, "কী বলবে বলছিলে?"

নিরবচ্ছিন্নভাবে যে-কথাগুলো বলবে ঠিক করেছিল তনয়া, সেগুলোই বলে গেল। যা ছোট করলে এরকম দাঁড়ায়। বিয়ে পিছোতে বলায় তনয়ার বাবা এখন অনুতপ্ত। তবে উনি চাইছেন, বিয়েটা আনুষ্ঠানিকভাবে না হয়ে, রেজিস্ট্রি করে হোক এবং তনয়া এবারই নীলার্কর সঙ্গে আমেরিকা চলে যাক। পাসপোর্ট তো করাই আছে তনয়ার, বিয়েটা কয়েকদিনের মধ্যে সেরে নিয়ে ভিসা অ্যাপ্লাই করে দিক। পরের বার যখন ফিরবে, তখন আত্মীয়স্বজনকে ডেকে একটা রিসেপশনের ব্যবস্থা করা যাবে।

সবটা শুনে নীলার্ক বলেছিল, "এটা তো তোমার বাবার ইচ্ছে, আমার বাড়ির লোক এতে সহমত নাও হতে পারে। তা ছাড়া, বিয়ে নিয়ে ভাবার মতো মনের অবস্থা এখন আমার নেই। অভিদার ব্যাপারটা কীভাবে সামলাই, সেটা নিয়েই ভাবছি।" তারপর জেঠুর বাড়িতে কী ঘটল, মায়ের সঙ্গে কী কথা হল, নিজে কী ভাবছে, সবই বলল নীলার্ক।

কথাগুলো মন দিয়ে শুনে বোমা ফাটাল তনয়া। বলেছিল, "ভিডিয়ো ফুটেজটা আমি দেখেছি, ওটা পর্ণারই।"

"এত নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে? তুমি তো কম্পিউটার গ্রাফিক্সের কিছুই বোঝো না। কোনও কিছু ঠিক আছে কি না, জানছ কী করে?"

"আমি সেসব দেখতে যাইনি। মুখটা তো পর্ণারই। সেখানে সেক্স করার প্লেজার নানা ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। এক্সপ্রেশন তো সুপার ইম্পোজ় করা যাবে না।"

তনয়ার কথায় থম মেরে গিয়েছিল নীলার্ক। অভিদার বউ কি সত্যি গুরুকম? কেন তাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম? ওই মহিলার সঙ্গে আমার তো আলাপই হয়নি। মনের ভিতরে ওঠা প্রশ্নগুলোর উত্তর সহজেই পেয়ে গিয়েছিল নীলার্ক। নিজেদের পরিবারের প্রতি দুর্বলতা থেকে সে ধরে নিচ্ছে, তাদের বাড়ির বউয়ের অতীত এত কলুষিত নয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংসারে এই ধরনের মেয়ে বিরল। সেরকম একটি দৃষ্টান্ত কেন তাদের বাড়ি কপালে জুটবে? তবু তনয়ার অবজ়ার্ভেশন পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিল না নীলার্ক। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। বলেছিল, "তুমি নিশ্চয়ই অনেকবার কথা বলেছ অভিদার বউয়ের সঙ্গে। অভিদাও এক বছরের উপর ঘর করছে। বাড়ি লোক এত দিন ধরে দেখছে বউদিকে। গল্পগাছা করছে। একবারও কি কারও মনে হয়েছে, মেয়েটা বাজে টাইপের? আমার কানে তো সেরকম কিছু আসেনি।"

উত্তরে তনয়া বলল, "অপরাধ ধরা পড়ার পরই তো অপরাধীকে চেনা যায়। তার আগে পর্যন্ত সে তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষ। পাড়ায় বাসে-ট্রেনে কত মানুষের সঙ্গেই তো আমাদের আলাপ হয়। কথা হয় দিনের পরদিন। হঠাৎই জানতে পারি, অমুক এত বড় অপরাধ করে জেলে গিয়েছে। তখন অবাক হই এই ভেবে, মানুষটার সঙ্গে কথা বলে তো বুঝতে পারিনি, এ এমন কাণ্ড করতে পারে!"

তনয়ার কথার মাঝেই মাথায় একটা পয়েন্ট এসে গিয়েছিল নীলার্কর। বলেছিল, "আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে বউদির এক্সপ্রেশনটা অভিনয়, হয়তো কারও সামনে ইয়ার্কি করে ওসব দেখাচ্ছিল। সেটা মোবাইলে তুলে অন্য কারও ফিগারের সঙ্গে জুড়েছে?"

"তেমনই যদি কিছু হত, থানায় কমপ্লেন করার সময় বলতে পারত পর্ণা। অপরাধীকে সহজেই ধরতে পারত পুলিশ। যতদূর শুনেছি, সেরকম কিছু সে জানায়নি থানায়। শুধু লিখে এসেছে— ভিডিয়ো ফুটেজ ছড়িয়ে দিয়ে তার বদনাম করা হচ্ছে," এত দূর বলে থেমেছিল তনয়া।

আকাশে তখন শেষ বিকেলের আলো। পাখিরা ফিরছে বাসায়। তাদের ওড়ার দিকে তাকিয়ে তনয়া আর-একটা মারাত্মক তথ্য যোগ করেছিল। বলেছিল, "ভিডিয়ো ফুটেজে পর্ণার যে-পার্টনার তাকে নাকি আমাদের পাড়াতেও দেখা যাচ্ছে। আমি অবশ্য দেখিনি। রেগুলার রকে পাড়ার ওঁচা ছেলেগুলোর সঙ্গে আড্ডা মারে। আমার ধারণা, ওই ছেলেটার সঙ্গে পর্ণার সম্পর্ক ছিলই। সেটা কী পর্যায়ের ভিডিয়োটা দেখেই মালুম হয়। অভিদার মতো ভাল পাত্র পেয়ে পর্ণা ছেলেটিকে ডিচ করেছে। ভিডিয়ো ছড়িয়ে দিয়ে তারই শোধ নিচ্ছে ছেলেটা।"

সমস্ত অঙ্ক মিলিয়ে দিয়েছিল তনয়া। আলাদা করে ভাবার আর কোনও অবকাশ ছিল না। ধীর লয়ে চরাচরজুড়ে সন্ধে নামছিল। কী অপূর্ব হয়ে উঠছিল প্রকৃতি। স্মৃতিতে থাকা এই দৃশ্যের জন্যই তো দেশে ছুটে আসা। তখন মনে হচ্ছিল, এবার না এলেই বোধ হয় ভাল হত। তনয়া কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, "আমি তো জানি, অভিজিৎদা, জেঠুকে তুমি কতটা ভালবাস! তারা আজ বিপদের মধ্যে আছে বলেই এত অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু মেয়েটা খারাপ হলে তুমি কত দূর কী করতে পারবে, ওই নিয়ে ভাবা ছেড়ে দাও। মাত্র দুটো মাস তো ছুটি। তার মধ্যে কটা দিন কেটেও গেল। বাড়িতে সময় দাও। জেঠু-জেঠিমা-অলি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকে।"

Ankur Salt Pvt. Ltd. CALL : 033 2242 8885/8886

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসেছিল নীলার্ক। ঢিমে তালে চালাচ্ছিল গাড়ি। পাশে বসা তনয়া বলেছিল, "আমাদের রেজিস্ট্রি বিয়ের প্ল্যানিংটা তুমি যদি বাড়িতে না বলতে পার, আমি গিয়ে বলব জেঠু-জেঠিমাকে। তারপর বাবা-মা কথা বলতে যাবে।"

উত্তরে নীরব ছিল নীলার্ক। সেটাকে সমর্থন ধরে নিয়ে তনয়া আর কিছু বলেনি। ঘোষালবাড়ির সদর পেরতে যাবে, আচমকা ব্রেক কষে নীলার্ক। তনয়া জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হল, দাঁড়ালে কেন?"

প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল নীলার্ক। পা চালিয়েছিল ঘোষালদের সদর লক্ষ করে। তনয়াও ততক্ষণে নেমে এসেছে। জানতে চেয়েছিল, "চললে কোথায়?"

"ময়না দুটোকে দেখি," বলেছিল নীলার্ক। তনয়া কী যেন বলতে গেল, কানে যায়নি নীলার্কের। সদর পার হয়ে সে হাঁক পেড়েছিল, "কোথায় গেলে গো কাশীকাকা? তোমাদের পাখি..."

বাকিটা বলতে পারেনি নীলার্ক, উঠোনের অদূরে বারান্দার তারে ঝুলছে শূন্য খাঁচা। বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, শুধু খাঁচা নয়, জীর্ণ পুরনো গোটা বাড়িটাই এখন পরিত্যক্ত।

ডাক শুনে বারান্দায় এসেছিল কাশীকাকা। বলেছিল, "কে রে, কে এলি? গলাটা অনেকদিন পর শুনছি মনে হচ্ছে।"

"আমি গো কাকা। তোমাদের পাখি কোথায়?" নিস্তেজ গলায় বলেছিল নীলার্ক। ইতিমধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তনয়া। কাকা রাগ-হতাশা মিশিয়ে বলল, "পাখিদুটোকে বিষ খাইয়ে মেরে দিল।"

"কে মারল?" অবাক গলায় জানতে চেয়েছিল নীলার্ক।

কাশীকাকা বলল, "পাড়ায় শয়তান লোকের অভাব আছে? পাখি দেখতে কত লোক আসত, পাড়ার লোকেদের আত্মীয়স্বজন। হিংসেয় বিষমাখানো দানা খাইয়ে দিল।"

কথা শেষ হওয়ার আগেই তনয়া পাশ থেকে খোঁচা মারছিল নীলার্ককে। তাড়া দিচ্ছে ভেবে নীলার্ক কাশীকাকাকে বলেছিল, "চলি গো কাকা, পাখিদুটো নেই দেখে মনখারাপ হয়ে গেল।"

"কী আর করবি! আমরা তো মনখারাপ নিয়েই আছি। খাঁচাটা ফেলতে পারিনি। নতুন পাখিও পুষতে ইচ্ছে করছে না। তা এখন আছিস ক'দিন?"

কাশীকাকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি। গাড়িতে বসে স্টার্ট দিয়েছিল নীলার্ক। তনয়ার খোঁচা মারার কারণ তখন জানা গেল। বলেছিল, "কেউ বিষ দেয়নি। পাখিদুটোর বয়স হয়েছিল, তাই মারা গিয়েছে। এতটাই ভালবাসত, স্বাভাবিক মৃত্যুটা মেনে নিতে পারছে না। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, মারা হয়েছে। মাথাখারাপ করে দিচ্ছে সকলের।"

"তা বলে একসঙ্গে দুটো পাখি মারা যাবে?" বিস্ময়ের জানা গেল বলেছিল নীলার্ক।

তনয়া বলল, "এটা নতুন ব্যাপার নয়। পশুপাখিদের বেলায় এরকম হামেশাই হয়।"

তখনকার মতো চুপ করে গিয়েছিল নীলার্ক। খুব মনে পড়ছিল পাখিদুটোর কথা, মেল-ফিমেল জোড়া। ময়নাপাখির স্ত্রী-পুরুষ আলাদা করে চেনা কঠিন। কাশীকাকা জানত, চেনাত নীলার্কদের। কাশীকাকা বিয়ে-থা করেনি। পাখিদুটো ছিল বড় আপন। বড়ভাই বিশুকাকা দেওভাষ সংসার নিয়ে থাকে। কতরকম কথা যে বলত, পাখিদুটো, 'কেঃ কে এলিঃ', 'কাশী খেতে দে', 'আয়-আয়, বোস-বোস,' ফেরিওয়ালার ডাক নকল করত। 'মা দুটো ভিক্ষে দেবে,' বলা বন্ধ করেছিল, ভিখারি আর পাড়ায় ঘোরে না বলে।

তনয়াকে বাড়ি নিয়ে এসে গিফ্‌টটা দিয়েছিল নীলার্ক। নামী কোম্পানির কসমেটিক কিট। বাড়ির সকলের সঙ্গে আড্ডা মেরে, চা খেয়ে ফিরে গিয়েছিল তনয়া। বিয়ের প্রসঙ্গ তোলেনি। নীলার্ক তখন নিজের ঘরে। মা এসে জিজ্ঞেস করল, "কী ঠিক করলি শেষমেশ, অভিনব নিয়েই আসবি?"

"আর-একটু ভাবি," বলেছিল নীলার্ক।

বস্তুত কিছুই ভাবছিল না নীলার্ক। তথ্যসূত্রে যা জেনেছে, বুঝে গিয়েছিল অভিদাদের ফিরিয়ে আনলে ঝঞ্ঝাট বাড়বে বই কমবে না। দু'মাসের জন্য এসে পরিবারের ঘাড়ে চিরস্থায়ী সমস্যা চাপিয়ে দেওয়াটা অনুচিত হবে। সামনে কোনও একদিন কলকাতায় গিয়ে অভিদার সঙ্গে দেখা করবে। কোথায় কীভাবে আছে জানবে। বলে আসবে, যখনই টাকাপয়সার দরকার পড়বে, আমাকে জানাতে দ্বিধা করবে না। এটুকু আশ্বস্ত করে আসবে, সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও, তোমার পাশে জেঠু ছাড়া আমিও আছি।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ফেসবুকে লগইন করেছিল নীলার্ক। দেশ-বিদেশের অনেক বন্ধুর মেসেজ পড়ে আছে। গত ক'দিন ফেসবুকে দেখা হয়নি। ক্যাথরিন লিখেছে, "নিশ্চয়ই খুব এনজয় করছ দেশে গিয়ে। ফোটো পাঠাও।"

নীলার্ক, ক্যাথরিন এক গ্রুপে পিএইচ ডি করছে। স্কটল্যান্ডের মেয়ে ক্যাথরিন। দেশে ফেরার জন্য ও-ও খুব ছটফট করে। ক্যাথরিনের মেসেজের উত্তর দিতে ইচ্ছে করল না। অন্যদের বেলায় দু'-এককথায় সারল। মাথায় ভাসছিল, ঘোষালবাড়ির বেতের বড় খাঁচাটা। পাখিদুটো নেই। কাশীকাকা বলছে, কেউ বিষ খাইয়ে মেরেছে। পাড়ার লোক মানছে না। তারা মনে করছে, পাখিগুলোর প্রতি মমত্ব থেকেই কাশীকাকা এমনটা বলছে। প্রকৃত সত্য কেউই জানে না। বিবেচনা বোধ দিয়ে আন্দাজ করছে মাত্র। অভিদার বউয়ের ব্যাপারটাও তো সেরকমই হতে পারে। বিভিন্ন সূত্র থেকে একটা ধারণা তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে। এটা অন্যায়। আসল ঘটনা না জেনেই, তাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। জেঠুর বাড়িটা যেন ঘোষালবাড়ির খাঁচার মতো।

কাল রাতেই নীলার্ক ঠিক করে নেয়, অভিদাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। বউদির থেকে ঘটনার প্রেক্ষাপটটা জানা দরকার। ব্যাপারটা নিয়ে এত তোলপাড় হয়েছে, সে হয়তো সত্যিটা বলার সুযোগ পায়নি। আজ ব্রেকফাস্ট টেবিলে নীলার্ক ঘোষণা করে দেয়, অভিদাকে আনতে যাচ্ছে। মা আবারও বাধা দিতে যাচ্ছিল, বাবা বলেছে, "ওকে যেতে দাও। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে তবেই যাচ্ছে। তোমার-আমার চেয়ে ওর বুদ্ধি অনেক বেশি।"

বাবার আপত্তি ছিল নীলার্কর ড্রাইভ করা নিয়ে। বলেছিল, "একটা ড্রাইভারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

নীলার্ক বলেছিল, "ছাড়ো না, অসুবিধে হবে না আমার।"

একটা বড় সমস্যার কথা বাবা খেয়াল করেনি, এদেশের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই নীলার্কর। ড্রাইভার না নেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ, ছেলেটা নিশ্চয়ই পাড়ার কিংবা আশপাশের কেউ। গাড়িতে অভিদা, বউদির সঙ্গে যা কথাবার্তা হত, গোপন থাকত না।

ভাবনা থেকে ফেরে নীলার্ক, অভিদা এখনও এল না কেন? বিকেল ফুরোতে চলল, আগেভাগেই রবীন্দ্রসদনের বাতিস্তম্ভ জ্বলে উঠেছে। পাখিদের হইহই ভেসে আসছে গাছগুলো থেকে। সিঁড়িতে এখন আর একা নেই নীলার্ক। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেকেই বসেছে। তবে সবাই প্রায় জোড়ায়। অভিদাকে কি একটা ফোন করবে? কাজে কোথাও আটকে গেল? ফোন বের করতে যাবে নীলার্ক, দেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে অভিদা। এখনও দেখতে দারুণ। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, নীলার্কর চেয়েও লম্বা, প্রায় ছয়। দোহারা চেহারা, একটু বিষণ্ণ লাগছে এই যা।

অভিদা সামনে আসার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে নীলার্ক। দম ছেড়ে অভিদা চিন্তিত গলায় বলল, "কী হয়েছে রে? একেবারে কলকাতায় চলে এলি দেখা করতে!"

"তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। কোন হোটেলে উঠেছ নিয়ে চলো।"

"বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিস তো? তা আর হয় না। অনেক অবজ্ঞা, অপমান সহ্য করেছি পাড়ায়। আত্মীয়রাও সরে গেছে দূরে। দেউলপুর থেকে বেরিয়ে এসে ভালই আছি। বাড়ি খুঁজছি ভাড়ার। আশা

করি, তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব।"

"বাইরের ছেলেটা ওর মানে জিতে গেল? তুমি নিজের পাড়া ছেড়ে দিলে!"

প্রায় চমকে উঠে অভিদা জানতে চাইল, "তোকে কে বলল ছেলেটার কথা?"

"খবর নিতে হয়েছে। চুপচাপ বসে থাকলে তো চলবে না," বলল নীলার্ক। সব সত্যি বলার এখন কোনও মানে নেই। অভিদাকে যে করে হোক ফেরাতে হবে। ফের নীলার্ক বলে, "যেসব লোক নিন্দেমন্দ করছে, কাদা ছোঁড়ছে তোমার গায়ে, তাদের কোনও সোনার গয়না যদি পাড়ার ড্রেনে পড়ে যায়, দেখবে হাত ডুবিয়ে খুঁজে নিচ্ছে। পাড়ায় ভাল লোকও আছে। সংখ্যায় তারা চিরকালই কম। চলো, সবাই মিলে একজোট হই। পাড়ায় গুরুকম নোংরা ভিডিয়ো চালাচালি বন্ধ করা দরকার। বউদির কাছে ছেলেটির বিষয়ে বিশদে জানতে হবে। যদিও খারাপ লাগবে আমার। প্রাথমিক আলাপটাও হয়নি। কী আর করা যাবে!"

কথা শেষ করে সিঁড়ি ধরে নামতে থাকে নীলার্ক। একইসঙ্গে নামছে অভিদা। বলছে, "তোর কত গল্প করেছি পর্ণার কাছে। এমনকী, আমরা পাসপোর্টও করিয়েছি এই আশায়, যদি প্লেনের ভাড়াটা জোগাড় করতে পারি কোনও মতে, আমেরিকায় যাব। খাবা-খাওয়া তো তোর কাছে। মাথখান থেকে শালা সব গোলমাল পাকিয়ে গেল।"

হতাশার সুরে সুর মেলায় না নীলার্ক। সিঁড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলে, "আমি তো এখনও অনেকদিন আছি। ইতিমধ্যে সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে হবে। তারপর যতটুকু যা ঝামেলা থাকবে, নিজেই সামলে দিতে পারবে তুমি। শুধু মনের জোর ধরে রাখবে।"

"মনের জোর আসে বিশ্বাস থেকে। পর্ণা যে নির্দোষ, সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি কই? হাতে এমন কোনও তথ্য প্রমাণ নেই যে, জোর দিয়ে বলতে পারি, এ কাজ ও করতে পারে না। যতটা যা জেনেছি, সবই ওর বিরুদ্ধে যায়, মরাল সাপোর্টটাই পাচ্ছি না।"

কথাটা শুনে অভিদার চোখের দিকে তাকায় নীলার্ক। বলে, "তা হলে আর বউদিকে রক্ষা করছ কেন? নিশ্চয়ই নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্যে নয়। সম্মান যা যাওয়ার, তা তো গেছে। বউদিকে নিয়ে হোটেলে উঠেছ, ব্যাট্রি খুঁজেছ। বদলে কোর্টে ডিভোর্স ফাইল করলেই পারতো। পেয়ে যেতে মুক্তি। কারণ, বউদিকে দোষী সাব্যস্ত করার মতো রসদ তোমার আছে।"

নীলার্ক ঠিক কী বলতে চাইছে, ধরতে পারছে না অভিজিৎ। হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে আছে ভাইয়ের মুখের দিকে। ফের নীলার্ক বলে, "বউদির বিশেষ কোনও আচার-ব্যবহার থেকে তুমি সেই বিশ্বাসটা পেয়েছ এবং এখনও পাচ্ছ, যাতে মনে হচ্ছে, মেয়েটা খারাপ নয়। তাই আগলে রাখছ। নিন্দে-মন্দের ঝড়ে তুমি ওই আচার-আচরণটা চিনে উঠতে পারছ না।"

বিষাদ সরে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অভিজিতের মুখ। বাহবার গলায় বলে ওঠে, "তুই বড় হয়ে গেছিস। অনেকটাই বড়!"

হোটেলে সময় নষ্ট করেনি অভিজিৎরা। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে। পর্ণার মোবাইলে যেহেতু সিম লাগানো নেই, রবীন্দ্রসদন থেকে হোটেলে ফেরার সময় অভিজিৎ রিসেপশনে ফোন করে বলেছিল, "আমরা আজ রাতেই চেকআউট করব। প্লিজ় আমাদের রুমে গিয়ে ম্যাডামকে বলুন, লাগেজ গুছিয়ে নিতে।"

রাত অলরেডি নেমে গেছে। ন'টা বাজতে চলল। হাইওয়েতে গাড়ি ড্রাইভ করছে অভিজিৎ। রবীন্দ্রসদন থেকেই স্টিয়ারিংয়ে বসেছে। পার্কিংলটে গিয়ে যখন দেখল, নীলুর গাড়িতে কোনও ড্রাইভার নেই, অবাক হয়েছিল খুব। ভাইকে বলেছিল, "সে কী রে, তুই ড্রাইভ করে এসেছিস? তোর তো এদেশে লাইসেন্স নেই। ভয় করেনি রাস্তায়?"

প্রচার করে নয়, নিঃশব্দে ভাল ছাত্রছাত্রী তৈরী করছে

সোদপুরে SCORE

(A DIVISION OF EDU GUIDE)

ADMISSION GOING ON

প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য ঃ-

- অভিজ্ঞ এবং অসাধারণ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা ক্লাসরুম কোচিং দেওয়া হয়।
- অত্যাধুনিক ও উন্নত মানের Notes ও Suggestion দেওয়া হয়।
- দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়।
- ছাত্রছাত্রীদের গুণগত মান বাড়াবার জন্য নিয়মিত Mock Test।
- সারা বিশ্বে উচ্চ প্রশংসিত "নেমোনিক সায়েন্স" -এর সাহায্যে মনে রাখার ক্ষমতা, মন সংযোগ এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াবার বিশেষ দ্বায়িত্বে আছেন এডুগাইড -এর জনপ্রিয় শিক্ষক এবং ন্যাশানাল রেকর্ড হোল্ডার শ্রী সমর চক্রবর্ত্তী (সাড়ে দশ হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী এই বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির সাহায্যে অসাধারণ রেজাল্ট করছে)।
- সপ্তাহের ৭ দিনই খোলা (সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)।

ক্লাস VII-X (all subjects, all Boards), XI-XII Science Group (all Boards) এবং JEE/AIEEE/CBSE PMT -র ক্লাসরুম কোচিং -এর মাধ্যমে ভালোদের আরও ভালো এবং অতি সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীদের অসাধারণ রেজাল্ট করাতে বদ্ধপরিকর।

হতাশ অভিভাবকদের কাছে আবেদন -
ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে হতাশ না হয়ে আজই যোগাযোগ করুন, এমনকি ২০১৭ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য আছে বিশেষ ক্র্যাশ কোর্স।
স্কোর -এর ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরাই একমাত্র বলতে পারেন স্কোর -এ পড়ার অভিজ্ঞতা।

ভর্ত্তি চলছে

SCORE
(A DIVISION OF EDU GUIDE)
Bapi Sadan 2nd Floor, R N Avenue Station Road, Sodepur, Kol-110 (Beside Rathindra Cinema Hall)
Ph. : 033 6555 5811/6555 5866

এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় SCORE -এর 98% ছাত্রছাত্রী Star Marks পেয়েছে। Centre -এ এলে ছাত্রছাত্রীদের Marksheet দেখা যাবে।

ফ্রাঞ্চাইজির জন্য যোগাযোগ করুন - 9874222837

"কিসের ভয়? এই যে রাস্তায় এত গাড়ি চলছে, সবার কি লাইসেন্স দেখছে পুলিশ? ড্রাইভিংয়ে ভয়টা ফুটে উঠলেই সমস্যা, ঝট করে ধরবে," বলেছিল নীলু। বিদেশে থেকে অনেক স্মার্ট হয়ে গিয়েছে। অভিজিৎও এবার থেকে চেষ্টা করবে, মনের ভাব যেন চেহারায় প্রকাশ না পায়।

হোটেলে নীলুকে উপস্থিত হতে দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিল পর্ণা। নীলুর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। পর্ণার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছিল, যেন কত দিনের চেনা। "বউদি সবকিছু ঠিকঠাক গুছিয়ে নিয়েছ তো? ভাল করে দেখে নাও আলমারি, খাটের তলা, বাথরুম। একটুও তো সাজুগুজু করোনি দেখছি। সেরে নাও। বাইরে আছি আমরা।" পর্ণার তখন হতভম্ব অবস্থা। প্রায় অস্ফুটে জানতে চেয়েছিল, "আমরা কোথায় যাব?"

"কোথায় আর যাবে? বাড়ি ফিরবে। জেঠু অপেক্ষা করছে," বলেছিল নীলু। পর্ণা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অভিজিতের দিকে তাকায়। মাথা উপর-নিচ করে সমর্থন জানিয়েছিল অভিজিৎ।

পর্ণার রেডি হওয়ার মাঝে অভিজিৎ হোটেলের বিল মেটাল। রাস্তায় এসে অভিজিৎ যখন ড্রাইভিং সিটে বসতে যাচ্ছে, পাশের সিটে উঠে এসেছিল নীলু। অভিজিৎ বলল, "তুই বউদির সঙ্গে বোস। ওর সঙ্গে তো ভাল করে কথাই হল না তোর। যেতে-যেতে আলাপটা সেরে নে।"

"ঠিক বলেছ," বলে পিছনের সিটে গিয়ে বসেছিল নীলু। আলাপচারিতার প্রথম দিকে একটু গুটিয়েছিল পর্ণা। নীলু একাই প্রচুর বকবক করে যাচ্ছিল। ধীরে-ধীরে হাসি, কথা ফুটল পর্ণার মুখে। যে-ঘটনার জন্য এত টানাপড়েন, সেই প্রসঙ্গ একবারও ওঠেনি ওদের মধ্যে। নীলু আক্ষেপ করছিল এই বলে, "সেই কোন ছোটবেলা থেকে ভেবে আসছি, অভিদার বিয়েতে চুটিয়ে আনন্দ করব, বরযাত্রী যাব। কিছুই হল না। তোমাদের বিয়ের দিন ওদেশে বসে, এত বিরক্ত লাগছিল যে কী বলব!"

পর্ণা বলল, "বিয়ে হয়ে আসার পর আমি সকলের মুখে তোমার প্রশংসাই বেশি শুনি। তোমাদের দুই ভাইয়ের খুব মিলমিশ, সেটাও বলেছে সবাই। তোমার দাদা তো নীলু বলতে অজ্ঞান। তাই আমারও খুব ইচ্ছে হত, তোমাকে দেখতে। এদিকে তোমার আসার নাম নেই।"

"দেখে কী মনে হচ্ছে, আমার সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলত বাড়ির লোক?" ফাজিল হাসি হেসে জানতে চেয়েছিল নীলু।

পর্ণা বলল, "এত তাড়াতাড়ি কি বলা যায়? আরও ক'টাদিন দেখি তোমাকে। তবে একটা জিনিস অবাক লাগছে, তুমি এত দিন বিদেশে আছ, কিন্তু কী সুন্দর বাংলা বলছ! আমি ভেবেছিলাম, কথায়-কথায় হয়তো ইংরেজি বলবে।"

হাসছিল নীলু। বলল, "বাইশ বছর বাংলায় কাটিয়েছি। মাত্র পাঁচ-ছ'বছরে ভাষাটা ভুলতে শুরু করব!"

গাড়ি চালাতে-চালাতে অভিজিৎ বলছিল, "না রে নীলু, এটা সহজ ব্যাপার নয়। লোকে বেশ কিছু দিন অন্য রাজ্যে থাকলেই, উচ্চারণে কীরকম একটা টান এসে যায়। তুই আছিস সেই কোন মুলুকে! বাংলায় কথা বলার তো লোকই পাস না।"

"পাই। আমার ডিপার্টমেন্টে বেশ কিছু বাঙালি আছে। আমরা বাংলাতেই কথাবার্তা বলি। পুরো ইউনিভার্সিটি ধরলে অনেক বাঙালি। সোশাল গ্যাদারিংয়ে বাংলাতেই আড্ডা হয়। এমন বাঙালিরও দেখা পেয়েছি, ষাট বছরের উপর ওদেশে থাকা হয়ে গিয়েছে, এমন বাংলা বলবে যেন, কিছু দিন হল উত্তর কলকাতা থেকে এসেছে। ইংরেজিও বলে অনবদ্য। আসলে কী জানো, তুমি যদি মাতৃভাষাটা ভুলতে না চাও, তোমাকে ভোলাবে কার সাধ্যি!"

নীলার্কর কথার পিঠে পর্ণা বলেছিল, "এতই যদি বাংলার উপর টান, তা হলে এত দিন অন্তর আসো কেন? একটু ঘনঘন এলেই তো পারো। এখানে একজন হা-পিত্যেশ করে মরে। আমার কাছে অনেক দুঃখ করেছে সে।"

চিরাচরিত দেওর-বউদির ইয়ার্কি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তনয়াকে

AMARBOI.COM

ইঙ্গিত করে কথাটা বলেছিল পর্ণা। নীলু জানতে চাইল, "কী বলে দুঃখ করে, আমায় একটু বলো। আমার সামনে তো সবসময় ডাঁট নিয়ে চলে। নেটে চ্যাট করে হেভি রেলা নিচে..." ইন্টারনেটের প্রসঙ্গ এসে যাওয়াতে নীলু একফাঁকে বলে উঠেছিল, "বুঝলে অভিদা, আমরা যারা বাইরে থাকি, বাংলাটা ভাল থাকার আর একটা বড় কারণ সোশাল মিডিয়া। ফেসবুকে স্টেটাস দিচ্ছি বাংলায়, চ্যাট করছি এখানকার বন্ধুদের সঙ্গে..."

অভিভিৎ ভাবছিল অন্য কথা। এই যোগাযোগ ব্যবস্থাই আমার কত বড় ক্ষতি করেছে। কথাটা পর্ণার মাথায় এসেছে কি না, কেন জানা গল্পের খেঁচে হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে সব ভুলে আছে। চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে আসা হাওয়া পর্ণার আতঙ্ককে উড়িয়ে নিয়ে গেছে বাইরের অন্ধকারে। এখন সে অনেকটাই নিশ্চিন্ত। স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে অভিভিৎ দেখছে, ঘুমে ঢুলে পড়ছে পর্ণা। মাথাটা চলে যাচ্ছে নীলুর কাঁধে, চুলুনি কেটে গিয়ে সোজা হচ্ছে, ফের ঘুমিয়ে পড়ছে। নীলু অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে। পরস্পরের প্রতি ভরসার এই সুন্দর দৃশ্যটা দেখে বড় শান্তি পাচ্ছে অভিভিৎ। কেন জানি মনে হচ্ছে, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সব কিছু স্বাভাবিক।

হাইওয়ে ছেড়ে গ্রামের রাস্তায় ঢুকেছে অভিভিৎ। গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঝিমুনি কেটে যাচ্ছে পর্ণার। জানালার বাইরে তাকিয়ে বুঝে নিল কত দূর এসেছে। অভিভিৎকে জিজ্ঞেস করে, "ক'টা বাজে গো?"

"দশটা, কেন?" জানতে চাইল অভিভিৎ।

পর্ণা বলল, "বাড়ি গিয়ে রান্না চাপাতে হবে। খেতে দেরি হবে বাবার। জানেন আসছি, রান্না করতে যাবেন না নিশ্চয়ই।"

গাড়ি মহাদেবতলার সামনে আসতেই জানালার ফাঁক দিয়ে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে নিল পর্ণা। নীলু ফুট কাটল, "তোমার পেন্নাম বৃথাই যেতে পারে কিন্তু।"

"কেন?" অবাক হয়ে জানতে চাইল পর্ণা।

মশকরার হাসিসমেত নীলু বলে, "অত ক'টা পাথরের মধ্যে সত্যিকারের বন্ধু আছে কি না, গ্রামের কেউই গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে না। তবু সবাই প্রণাম ঠুকে যায়।"

"কী বলছ, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

পর্ণার কথায় আরও হাসে নীলু। বলে, "সে কী, এতদিন অভিদার সঙ্গে আছ, মহাদেবতলার ইতিহাসটাই বলেনি!"

"শুনি ইতিহাসটা!" নীলুর দিকে তাকায় পর্ণা।

নীলু বলে, "এখন আর শুনে কাজ নেই। বাড়ি তো প্রায় এসেই গেলাম। অভিদার থেকে জেনে নিয়ো। বেশ মজার গল্প।"

সাত

আজ মহালয়া। কত বছর পর যে রেডিয়োতে মহিষাসুরমর্দিনী পুরোটা শুনল নীলার্ক মনে করতে পারছে না। সুরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আলো ফোটা, মা-র করা পুজোর গন্ধ। কড়া নাড়ে উৎসবের দিন। ক্লাস সিক্স সেভেনেই কীভাবে জানি মাথায় ঢুকে গিয়েছিল, মাথে ঘুমিয়ে পড়লে দুর্গাঠাকুর রাগ করেন। যার প্রভাব স্কুলের রেজাল্টে গিয়ে পড়বে। ঠিক যেমন সরস্বতী পুজোর আগে কিছুতেই কুল খেত না। ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের যে চাপ অনেক! পরে যখন বুঝল যে, এ সবই মনগড়া, তারপর থেকে কিছুই মানত না। কলেজে ওঠার পর গোটা প্রোগ্রামটা মিস করে গেছে। পাড়ার কেউ না কেউ রেকর্ড করে রাখত, রেডিয়োর মহালয়া শেষ হলেই চালিয়ে দিত জোরে। ওটা হচ্ছে বিজয় ঘোষণা। তোমরা ঘুমিয়েছিলে, আমি শুনেছি। এখন চালিয়েছি, শুনে নাও... অসময়ে মহালয়ার গান মোটেই শুনতে ভাল লাগত না নীলার্কর। বিদেশে থাকাকালীন একদিনের জন্যেও মহিষাসুরমর্দিনী শোনেনি নীলার্ক। নেট থেকে ডাউনলোড করে শোনাই যায়।

কাল রাতে খাওয়ার টেবিলে নীলার্ক বাবাকে বলে রেখেছিল, "মহালয়া শুনব। ডেকে দিয়ে তো। আলার্ম দেওয়া থাকবে মোবাইলে, যদি ঘুম না ভাঙে..."

"আলার্ম দিতে হবে না। নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়। ঠিক টাইমে ডেকে দেব," বলেছিল বাবা।

ডাকতে হয়নি। নীলার্ক যখন ঘুম ভাঙল, মনে হল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে...' বলতে-বলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। প্রথম গানটা ছাত মানে মিস। বাবা রেডিয়োটা হাতে বলেছিল, "উপরেই রাখ। নিচে আমাদের কানে আসবে।"

ভুলেও আর শোয়নি নীলার্ক। বিছানায় গ্যাট হয়ে বসেছিল। আবার কবে শোনা হবে, কে জানে! একার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আশপাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল মহালয়ার সুর। বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায়নি। হিমে ভিজে যাচ্ছিল গা। ঠান্ডা লাগার ভয়ে ঘরে ঢুকে এসে বাকিটা শুনল নীলার্ক। মা চা নিয়ে এল। বাইরে তখন পুরোপুরি আলো ফুটে গেছে। মা বলেছিল, "চা খেয়ে নিয়ে আবার একটু ঘুমিয়ে নে। কাল শুতে এলি কত রাতে! ঘুম কম হলে শরীর খারাপ করবে। তোর বাবা তর্পণ করে ফিরুক। আবার চা দেব তোকে।"

"জেঠুকে সঙ্গে নিয়ে গেছে তো বাবা?" জিজ্ঞেস করেছিল নীলার্ক। মা বলল, "হ্যাঁ, সব ভাই মিলে গেছে।"

তেমনটাই যাওয়ার কথা। তবু নিশ্চিত হয়ে নিয়েছিল নীলার্ক। চ্যাটার্জি পরিবারে যে-গুমোট পরিবেশটা চেপে রেখেছিল, তা অনেকটাই কাটানো গিয়েছে। অভিদা-বউদিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে নীলার্ক পরের দিনই গিয়েছিল দুই কাকার কাছে। নানা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিল, "জেঠুদের এভাবে ব্রাত্য করে রাখাটা ঠিক হচ্ছে না। এতে প্রতিবেশীদের কাছে আরও বেশি করে প্রকাশ করা হয়ে যাচ্ছে, আমাদের গায়ে কালা লেগে আছে। বউদির ব্যাপারে ডিসিশন নেওয়ার মালিক তো আমরা নই। অভিদা যা ভাল বুঝবে, করবে। আমরা নিজেদের ঐক্যবদ্ধভাবে আলাদা করব কেন? আমাদের হেয় করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে আশপাশের লোক। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, জেঠু ভাইপো-ভাইঝিদের নিজের ছেলেমেয়ে বলেই মনে করত। আমার বউয়ের বেলায় যদি ওই ঘটনা ঘটত, তা হলে কিন্তু তোমরা বাবাকে ব্রাত্য করতে। জেঠুকে নয়। জেঠু ঠিক বাবার পাশে এসে দাঁড়াত। তোমাদের কোনও বিপদ হলেও তাই। এমন একজন মানুষকে এরকম অমর্যাদা করা ঠিক হচ্ছে না।"

ছোটকাকা বলল, "আমার তো বড়দার কাছে যেতে খুবই ইচ্ছে করে। ছেলেমেয়ে হল না বলে, দুঃখ করতাম। বড়দা বলত, 'ধরে নে আমিই তোর ছেলে।' তোর কাকিমা বেশির ভাগ সময় ঠাকুরঘরে কাটায়, আমিই ব্যথা বলার লোক খুঁজে পাই না। যত আড্ডা ছিল বড়দার সঙ্গেই। কেউ যাচ্ছে না দেখে, আমিও যাওয়া বন্ধ করলাম।"

"এবার যেবে যেও," বলে বাড়ি ফিরেছিল নীলার্ক। কাকাদের যা-যা বলেছে, একই কথা বলল বাবাকে। তারপর বাড়িতে একটা ফ্যামিলি গেট-টুগেদারের প্রস্তাব আনল। উপলক্ষ, তার দেশে ফেরা। মা বলেছিল, "আমার কোনও আপত্তি নেই। শুধু তোমার বউদিকে বলে দিও, সে যেন রান্না বা পরিবেশনে হাত না লাগায়। ওর কারণে কেউ যদি দুষ করে খাওয়া ছেড়ে উঠে যায়, বিতিকিচ্ছির ব্যাপার হবে।" মায়ের পরামর্শের সারবত্তা আছে। সেরকম সিচুয়েশন ঘটলে মূল উদ্দেশ্যটাই মাটি হবে বুঝে, নীলার্ক অভিদার বউকে বলে এসেছিল, "ওই অনুষ্ঠানে বেশি ইনভলভ হতে যেয়ো না, যদি কেউ খাবার ছেড়ে উঠে যায়। ক্যাস্ট খাবেলাতে চলে আসবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! বউদি যথারীতি পরিবেশনে হাত লাগাল। কেউ সিনক্রিয়েট না করলেও ব্যাপারটা যে পছন্দ করছে না, বোঝা যাচ্ছিল মুখ দেখে। তনয়াকেও ডাকা হয়েছিল গেট টুগেদারে। অলির সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা ছাড়া গম্ভীরই ছিল সারাক্ষণ। সেজকাকার ছেলেমেয়ে জয় আর সোনাই যা একটু হইহই, আনন্দ করেছে।

গত পরশু দুপুরে অনুষ্ঠানটা হয়েছে। রবিবার ছিল, সবাই আসতে পেরেছে। ওই মেলামেশার কারণে বাবারা একসঙ্গে তর্পণ করতে গেছে। খেয়াল করেছে নিশ্চয়ই এলাকার লোকজন। বুঝে গেছে, বউদির ইস্যুটাকে এই পরিবার আর ততটা পাত্তা দিচ্ছে না। চ্যাটার্জিবাড়িকে হেয় করার আগে এমন দু'বার ভাববে পাড়া-প্রতিবেশীরা।

জমিদারবাড়ির পিছনের ঘাটে সরস্বতী নদীতে তর্পণ করে এলাকার লোকজন। নীলার্ক ইচ্ছে হয়েছিল, আজ বাবাদের সঙ্গে যাবে তর্পণ দেখতে। এসে থেকে ওই দিকটায় যাওয়া হয়নি। একটু ভেবে নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখে নিজেকে, বাবাদের মাঝে সে নীলকণ্ঠ, ভাইদের মধ্যে বন্ডিটা তৈরি হতে সময় নেবে।

মা-জেঠিমা ছোটদের তর্পণ দেখতে যেতে দিত না। দেখতে নেই নাকি। লুকিয়ে দেখেছে নীলার্ক। সব সরস্বতীকে দেখে ভিজা হত। আর কয়েকবছরের মধ্যেই হয়তো শুকিয়ে যাবে। গ্রামের কুড়ে লোকেরা পুকুরে তর্পণ সারবে, উদ্যোগীরা যাবে ভন্দনপুর পেরিয়ে বেলুড়ের কোনও গঙ্গার ঘাটে। বাবারা গঙ্গাই বেছে নেবে। তর্পণে তাদের গভীর নিষ্ঠা। পুকুরের জলে নিজেদের শ্রদ্ধাকে আবদ্ধ রাখতে না। আর-একটা ভাবনাও মাথায় আসত নীলার্কর। আত্মা বলে যদি সত্যিই কিছু থাকে, এখানকার বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষরা দিনপরলোক থেকে এসে খুবই দুঃখ পাবেন। নদীর যা হাল! ওঁরা দেখেছেন নৌকা পারাপারের মতো সরস্বতী। উত্তরপুরুষদের জলদানে ওঁদের তৃষ্ট কী আদৌ মিটবে?

যাই হোক, আশ্চর্যভাবে নদীটা আজও বয়ে চলেছে। বাবারা বিধি তর্পণ সেরে এল। মা নীলার্ককে থেকে ডেকেছিল দিনে। চা-জলখাবার খেয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে এসেছে নীলার্ক। ওলটে খবরের কাগজ দ্যাখেই না বলা যায়। বাড়িতে এলে বাংলা কাগজ তারিয়ে-তারিয়ে পড়ে। ঘরে-ঘরে বাংলা অক্ষর। কাগজটা কোলের উপর নামিয়ে জানালার দিকে তাকায়, প্রথমদিনের মতো অভিদার বউ জেঠুদের ছাদে। আজও কাপড় মেলতে এসেছে, মাথায় গামছার খোঁপা। কিন্তু আজ সরাসরি তাকিয়ে নীলার্ক ঘরের দিকে। কী যেন খুঁজছে! নীলার্ককে কি? কিছু বলতে চায়?

বিছানা থেকে নেমে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় নীলার্ক। হাসি ফোটে বউদির মুখে। মিষ্টত্বর সঙ্গে অদ্ভুত এক সারল্যও আছে ওই হাসিতে। ইশারায় বউদি জানতে চাইছে, জলখাবার হয়েছে কি না? হ্যাঁ-সূচক ঘাড় হেলায় নীলার্ক। বউদি এবার চা খাওয়ার ভঙ্গি করল। মাথা নেড়ে নীলার্ক বোঝায়, চা-ও খাওয়া হয়েছে। হাত নাড়ছে বউদি। অর্থাৎ এটা বলতে চায়নি। নিজেদের বাড়ি দেখিয়ে চা খেতে আসার ইশারা করছে। এমন সময় নীলার্ক কানের কাছে গরম শ্বাসঃ। ঘাড় ঘুরিয়ে নীলার্ক দেখে, তনয়া। দু'পা পিছিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, "কখন এলে?"

নীলার্কর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তনয়া। হিসহিসে গলায় বলে, "কী কথা হচ্ছিল?"

"সেরকম কিছু না। চা খাব কি না জানতে চাইছিল।"

"কেন, এবাড়িতে কি চায়ের পাট উঠে গেছে যে, অন্যবাড়ি থেকে পাঠাতে হবে?"

"আরে, পাঠাবে কেন? ওবাড়িতে যেতে বলছিল।"

"যাবে?"

জানালা দিয়ে জেঠুদের ছাদটা দেখে নীলার্ক, বউদি নেই। কেউ ডাকতে এসেছে টের পেয়ে সরে গেছে। ভেবেছে এবাড়ির বড় কেউ। নীলার্ক তনয়াকে বলে, "না, যাব না। চা তো খানিক আগে খেলাম।"

"তোমার বউদি আমি রাগ করবে না তো?" ঠোঁট মারা গলায় বলল তনয়া।

ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলে নীলার্ক। বলে, "জেলাস হচ্ছ?"

"ওই মেয়েকে নিয়ে জেলাস হতে আমার বয়ে গেছে, যার মাথায় একঝুড়ি কেচ্ছা!"

কথাটা শুনতে ভাল না লাগলেও, উত্তরে কিছু বলে না নীলার্ক। যতই হোক, প্রসঙ্গটা তো তিক্ত। তনয়া বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সালোয়ার-কামিজের ওড়নার একপাশটা ঝুলির মতো ধরে আছে। ঝুলিটা খুলে দেয় বিছানার উপর, একরাশ শিউলি ফুল।

মনটা ফুরফুরে হয়ে যায় নীলার্কর। বিছানায় গিয়ে বসে। কিছু ফুল

তুলে নাকের কাছে এনে বলে, "তোমাদের গাছের ফুল?"

"যেন গন্ধ শুঁকে বলে দিলে," ফের কটাক্ষের সুর তনয়ার গলায়।

মশকরার গলায় নীলার্ক বলল, "মেজাজ কি আগে থেকেই টেঙে ছিল, নাকি এখানে এসে হল?"

এবার হেসে ফেলল তনয়া। বলল, "মেজাজ কি গরম হবে না? ফুল কুড়িয়ে নিয়ে এসে কোথায় একটা রোম্যান্টিক সিচুয়েশন তৈরি করব ভাবলাম। দেখি উনি জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে অন্য মেয়েকে দেখছেন। মাথাটা গরাদে ঠুকে দিইনি, জানবে অনেক ভাগ্যি!"

নীলার্ক হাসতে-হাসতে বলল, "যাক, হিংসে হয়েছে স্বীকার করছ তা হলে? এবার বলো, কী বলতে এসেছ। শুধু ফুল দিতে নিশ্চয়ই আসোনি?"

"বলার তো অনেক কিছুই আছে।"

"এক নম্বর দিয়ে শুরু করো।"

"রেজিষ্টির ডেটটা নিয়ে কী ভাবলেন?" বলার পর ঘুরে গিয়ে চেয়ারটা টেনে আনল তনয়া। বসে পড়ে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

কথা গুছিয়ে নিয়ে নীলার্ক বলতে শুরু করল, "বিয়েটা এরকম চুপিচুপি সেরে নেওয়ায় আমার মন ঠিক সায় দিচ্ছে না। তা ছাড়া, অভিদা-বউদিকে নিয়ে এলাম, ফ্যামিলিতে এদের একদম ঠিকঠাক সেট করতে সময় লাগবে। পাড়া-প্রতিবেশীদের রিঅ্যাকশনটাও ওয়াচ করা দরকার। সেসবের মাঝে বিয়েটা শুধুমাত্র অফিশিয়াল ব্যাপার হয়ে থাকবে। উৎসব-আনন্দের আবহ থেকে কেন বঞ্চিত করব নিজেদের? ভবিষ্যতে স্মৃতি ঘাঁটতে গিয়ে আপশোস হবে খুব। তার চেয়ে একটা বছর অপেক্ষা করে যাওয়া ভাল। বাড়ির পরিবেশ নর্মাল হয়ে যাবে তত দিনে। দু'পক্ষের আত্মীয়স্বজন মিলে হইহই করে বিয়েটা সারা যাবে। এবার না হয় ডেটটা ফিক্স করে রাখব।"

মাথা নামিয়ে নিয়েছে তনয়া। মনে তো হয়, কনভিন্স হয়েছে। মুখ তুলে বলে, "তোমার কি মনে হয়, পর্ণা সেট করে যাবে? ওকে মেনে নেবে তোমাদের ফ্যামিলি?"

"কেন তোমার কি কোথাও সন্দেহ হচ্ছে?"

"হ্যাঁ হচ্ছে। সকলে মিলে যাওয়াদাওয়ার যে-ব্যবস্থাটা করলে, সেটা করে হয়তো খেয়াল করোনি, পর্ণার পরিবেশন করাটা মেনে নিতে পারছিল না তোমার মা-কাকিমারা। ওর হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছিল হাতা-বাসন। ওই সময় আলনা এল শাকটাক কিছু একটা নিয়ে, জেঠিমা রেখে যেতে বললেন, দাম পরে দিতেন। পর্ণা আলনাকে খেয়ে যেতে বলল। কাজ নেই তো কী আর করবে! আলনা মানকচু পাতা কলে ধুয়ে বসে পড়ল বারান্দায়। পেট ভরে খেল। পর্ণাই বেড়ে দিল ওকে।"

কথার মাঝে হাসতে শুরু করেছে নীলার্ক। তনয়া বলে, "কী হল হাসছ কেন?"

"আনলার কপালটা সেদিন ভালই ছিল বলো, কার মুখ দেখে উঠেছিল, কে জানে!"

"পাগলার কথা ছাড়ো তো। যেটা লক্ষ করার, এই যে পর্ণা বেহায়ার মতো সকলের মাঝে ঢুকতে চাইছে, অবজ্ঞা গায়ে মাখছে না, এটাই সন্দেজনক। ও নির্দোষ নয় বলেই বুঝে গিয়েছে, এ পরিবারে থাকতে হলে, করুণা সম্বল করে থাকতে হবে। তুমি চলে গেলে এই সহানুভূতি পর্ণার জন্য বহাল থাকবে তো?"

"দেখা যাক না কী হয়! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে," বলে প্রসন্ন ঘোরায় নীলার্ক। জানতে চায়, "অনেক কথার একটাই তুমি বলেছ। পরেরটা বলো।"

"আজ বিকেলে কলকাতা যাবে পুজোর বাজার করতে? আমাকে আর অলিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তোমার। পুজো তো এসেই গেল। আজ মহালয়া।"

"কাল চলো। বিকেলে দরকারি কাজ আছে একটা।"

"কী কাজ?"

"কাজটা সেরে এসে বলব।"

"এখন কেন বলবে না?"

"নিশ্চয়ই কারণ আছে।"

"কী কারণ?"

"বলা যাবে না।"

ধৈর্য হারায় তনয়া। হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, "বিয়ের আগেই যদি আমাদের মধ্যে এত লুকোছাপা থাকে, রিলেশন বেশিদিন টিকবে বলে তো মনে হয় না।"

"টিকবে। জোরজবরদস্তি করলেই বরং ভেঙে যাবে। একে অপরকে কিছুটা স্পেস দেওয়া উচিত। প্রত্যেক মানুষ আলাদা, নিজের একটা জগৎ থাকে তার। আমি যখন বুঝব, এই সময় এটা তোমার সঙ্গে শেয়ার করা যায়, নিশ্চয়ই করব।"

"আচ্ছা বাবা, তখনই কোরো। আমি আপাতত নিচে চললাম। অলিকে গিয়ে বলি, আজ যাওয়া হচ্ছে না," বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় তনয়া।

নীলার্ক বলল, "তোমার কথা শেষ? বললে যে অনেক কথা আছে!"

"না, এখন কোনও কথাই মনে আসছে না। মাথায় ঘুরছে একটাই প্রশ্ন, বিকেলে তোমার দরকারি কাজটা কী? কের যদি জানার জন্য জোর করে ফেলি, তার চেয়ে কেটে পড়াই ভাল," বলে বিনা ভূমিকায় নীলার্কর গলা জড়িয়ে চুমু খায় তনয়া। তাড়াহুড়োতে চুমুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঠোঁটের পাশে পড়ে। শুধরে নিয়ে তনয়া দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। ফিরে এসে জেঠুর বাড়ির দিকে জানালাটার পাল্লা ভেজিয়ে তুলে দেয় ছিটকিনি। তারপর সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। নীলার্ক অস্ফুটে বলে ওঠে, "পাগলি!"

লরি থেকে নামা এখনও রপ্ত হয়নি পর্ণার। এই ক'দিনে হওয়ার কথাও নয়। ড্রাইভিং সিটের পাশের দরজা দিয়ে নেমে অভিজিৎ বাঁ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শাড়ি পরা পর্ণা সাবধানে নামছে, হাত বাড়িয়ে ধরেছে অভিজিৎ। দু'ধাপ সিঁড়ি পাবে পর্ণা। ফুট তিনেক রাস্তা, লাফিয়ে নামতে হবে। অভিজিতের হাত ধরে লাফ দিল পর্ণা। রাস্তায় নামার পর স্থির হতে পারল না। ঢলমল পায়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। নিজের বেসামাল অবস্থায় নিজেই হাসছে পর্ণা। অভিজিৎ ওর হাতটা ধরে আছে এখনও। ছেড়ে দিয়ে বলল, "না, শাড়িতে তোমার সমস্যা হচ্ছে। এবার থেকে সালোয়ার কামিজ পোরো।"

"কিনে দিয়ো। আমার কাছে একটাও নেই। বাপের বাড়িতে পরেছি," বলে সামনের দিকে পা চালাল পর্ণা। কিছুটা এগোলেই মাঠে নেমে যাওয়ার রাস্তা। শেষপ্রান্তে সানমাঠা পুজোর প্যান্ডেল। গ্রামের পুজো। গ্রামটাও বর্ধিষ্ণু নয়, চারপাশে শুধু জমি। পর্ণার অনুরোধে লরি হাইওয়ের ধারে দাঁড় করিয়েছে অভিজিৎ। মায়ের মুখ দেখবে পর্ণা। পুজোর দু'দিন লরিতেই কেটে গেছে, এখনও একটাও ঠাকুর দেখা হয়নি।

ষষ্ঠীর দিন সকালে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। বাড়িতে বসে জলখাবার খাচ্ছে অভিজিৎ। চণ্ডীমন্দিরের পুজোর মুখ ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। পুরোহিতের নির্দেশে ঢাক বাজছে না, ঢাকিরা আবহ তৈরি করছে। তারই মাঝে লরির আওয়াজ পেয়েছিল অভিজিৎ। লরির শব্দ পেলেই কান সজাগ হয় তার, টের পেল লরিটা তাদের রাস্তায় ঢুকছে এবং আওয়াজটা টাটা ৪০৭-এর। খাওয়ার টেবিল থেকে ছিটকে উঠে গেছিল অভিজিৎ। পর্ণা পিছন ডাকল, "কী গো? কোথায় চললে? আমি তো আর ক'টা লুচি নিয়ে এলাম!"

অভিজিৎ ততক্ষণে সামনের বারান্দায়। গ্রেটের রোঁয়া খাড়া হয়ে গেছে তার। সবজেটে আর হলুদ কর্ডারের টাটা ৪০৭ ইঞ্চের রাস্তা ধরে হেলতে-দুলতে এগিয়ে আসছে। গ্রেটের নম্বরটাও অভিজিতের লরির। অবশেষে ফিরে এল! লরিটা দাঁড়াল বাড়ির সামনে।

গলা শুকিয়ে গেছিল অভিজিতের, হাত-পা কাঁপছে থরথর করে। কোনওক্রমে গ্রিলের গেট খুলে ছুটে গেছিল লরির কাছে। ড্রাইভারের

AMARBOI.COM

সিট থেকে নন্দুকে নামতে দেখে আর-একপ্রস্থ অবাক হল। নন্দুর বিমর্ষ চেহারা, অনুতপ্ত মুখ। সরাসরি অভিজিতের পায়ে এসে পড়ল। বলেছিল, "দাদা, আপনার লরি আপনি ফেরত নিন। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। এ লরি আমার অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে।"

"কী ক্ষতি?" জানতে চেয়েছিল অভিজিৎ। নন্দু বলল, "সে অনেক কথা। বলতে সময়ে লুটে দিন কাবার হয়ে যাবে। মোট কথা এখন আমার বশে থাকছিল না। বাবরার বিপদে ফেলেছে। আর কোনও বড় বিপদে পড়তে চাই না আমি। আপনি যদি আমাকে পুলিশে দেন, তাতেও আপত্তি নেই। আর যদি মুক্তি দেন, বড় উপকার হয়। বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারি।"

"তুমি এত দিন কোথায় ছিল? কোন-কোন রাজ্যে ঘুরেছ? পুলিশ লাগিয়ে তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না কেন?" বিষম কৌতূহলে জানতে চেয়েছিল অভিজিৎ।

নন্দু বলেছিল, "সেসব জেনে আপনার লাভ কী হবে! গাড়ি তো পেয়ে গেছেন। মিটে গেল।"

"বড়সড় কোনও অ্যাক্সিডেন্ট করে গাড়ি ফেরত দিচ্ছ না তো?" সন্দেহ প্রকাশ করেছিল অভিজিৎ।

নন্দু তখন বলল, "তাই যদি হত, আমি কি আপনাকে যেচে বলতাম পুলিশের কাছে নিয়ে চলুন!"

নন্দুর যুক্তিতে কোনও ফাঁক ছিল না। অভিজিৎ ভেবে দেখল, পুলিশের কাছে এখন না যাওয়াই ভাল। লরি চুরি যাওয়ার কেসে নন্দুকে ধরবে। যত দিন কোর্টকাছারি চলবে, আটকে থাকবে গাড়িটা। নন্দুকে মুক্তি দিয়ে দিল অভিজিৎ। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল নন্দু।

বাবা, পর্ণা ততক্ষণে বারান্দায় চলে এসেছে। লরি ঘিরে বাড়ছে ভিড়। অনেক প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে বুঝে ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল অভিজিৎ। বারান্দায় এসে পৌঁছতে বাবা আবেগরুদ্ধ গলায় বলেছিল, "এ হল তোর সততার জয়। চিরকাল সৎ পথে থেকেছিস, তার ফল পেলি।"

নিরেট সততা বলে কিছু হয় না, জল মেশানো থাকেই কমবেশি। বিজ্ঞানেস করতে গিয়ে বহুবার অসৎপন্থা নিতে হয়েছে অভিজিৎকে। লরি ফেরত আসার ঘটনাটা কাকতালীয় ছাড়া আর কিছুই নয়। বিরল ঘটনাও বলা যায়। যেমন পর্ণাকে ঘিরে কেচ্ছাটা। এমন বিপদে পড়বে, বিয়ের আগে কি ভাবতে পেরেছিল অভিজিৎ?

যাক, মানুষের সব দিন সমান যায় না। ভাল দিনও আসে। ঘরে ঢোকার পর পর্ণা অবাক গলায় বলেছিল, "ওরে বাব্বা, তোমার এত বড় লরি ছিল! তুমি এটা চালাতে মাঝে-মাঝে!"

বর্ষটা লজ্জার হাসি দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করছিল অভিজিৎ। তখনই প্ল্যানটা মাথায় খেলে গেছিল অভিজিৎের। বলেছিল, "শোনো পর্ণা, এই লরিই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে আমাদের। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আজই লরি নিয়ে বেরিয়ে যাব। এই লাইনে কাজ করেছি তো, কোথায়-কোথায় গেলে কাজ পাওয়া যাবে জানি। লরিতেই থাকব আমরা। জামাময়া সংসার। মাল ডেলিভারি করব বিভিন্ন জায়গায়, অন্য রাজ্যে চলে যাব। বাজি আমাদের নাগাল পাবে না।"

পর্ণা তক্ষুনি রাজি। আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিল, "দারুণ প্ল্যান! জিনিসপত্র গোছাতে চললাম। বাসন-কোসন, স্টোভ সব নিতে হবে তো। গোছাতে সময় লাগবে।"

"খুব বেশি কিছু নিয়ো না। খাবাগুলোতে খাওয়াদাওয়া সারব। অত কোনও জায়গায় গেলে, তখন রান্না", বলেছিল অভিজিৎ। বাবাকে জানাল প্ল্যান। বলেছিল, "সময়মতো তোমায় ফোন করে নেব। দরকার বুঝলে তুমিও আমাকে কোরো। তোমা দরকার হলে দু'চার দিনের জন্য বাড়ি ঘুরে যেতে পারি। আপাতত কাউকে বোলো না আমাদের প্ল্যান। বলবে, বউমা বাপের বাড়ি। ছেলে লরির ব্যাপারে কোর্ট-কাছারি করছে।"

সেদিনই ভরদুপুরে পাড়ার রাস্তায় যখন লোকজন কম, লরি নিয়ে রওনা দিয়েছিল অভিজিৎ। বাবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুয়া-দুয়া বলে হাত ঠেকিয়েছিল কপালে। পাশের সিটে বসা পর্ণা পাদুটুকু পার করল মাথা নামিয়ে রেখে, যাতে কেউ না জানতে পারে, সে-ও চলেছে লরির সঙ্গে।

তারপর থেকে যাযাবর জীবন ভালই কাটছে অভিজিৎদের। ধাবা ছাড়াও রান্না-খাওয়া হয়েছে। স্নান হয়েছে পথের ধারে প্রথম দেখা জলাশয়ে। যাত্রাপথের হাওয়ায় শুকিয়েছে জামা-কাপড়। মাল ডেলিভারিও করেছে। গত দু'দিন ঠাকুরটাই দেখা হয়নি শুধু।

মন্ডপের কাছে এসে পড়েছে অভিজিৎরা। তারস্বরে মাইক বাজছে, হিন্দি সিনেমার গান। চারপাশে মেলা বসেছে। আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। মেলার প্রান্তে হাঁড়িয়া নিয়ে বসছে মেয়েরা। মাইলস্টোন অনুযায়ী অভিজিৎরা এখন ঝাড়গ্রামের কাছাকাছি।

মন্ডপে ঢুকে দেখা গেল প্রতিমা ছোটখাটো। দুর্গা যেন ঘরের মেয়ের মতো। ভক্তিভরে প্রণাম করল পর্ণা। অভিজিৎ দেখে ঘুরে গিয়ে বলল, "চলো, এখানকার মেলা থেকে দুটো-একটা থেকে সালোয়ার-কামিজ কিনে নিই।"

"এখানকার জিনিস পছন্দ হবে তোমার?" অবাক হয়ে জানতে চায় অভিজিৎ।

"না হওয়ার কী আছে! মানুষ পরছে না?" বলল পর্ণা। ফের বলে, "চলো, কিছু হার-দুলও কিনতে হবে। এসব জিনিসই শহরে প্রচুর দামে বিক্রি হয়।"

কেনাকাটি করে, আকণ্ঠপাকচ খেয়ে অভিজিৎরা মাঠ ধরে ফিরতে থাকে। দিনের আলো ঢলে পড়েছে। খানিকদূর এগোতেই খেয়াল করে, লরির সামনে একটা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কখন এল? কেনই বা এসেছে? জোরে পা চালিয়ে লরির কাছে পৌঁছয় অভিজিৎ। ড্রাইভার ছাড়া জিপ থেকে সব পুলিশ নেমে দাঁড়িয়েছে। একজন অভিজিৎকে বলল, "এই লরি আপনার?"

"হ্যাঁ স্যার। কী ব্যাপার স্যার?"

"গাড়ির কাগজপত্তর দেখান। লাইসেন্স বের করুন।"

"দেখাচ্ছি স্যার, দেখাচ্ছি।" বলে লরির ড্রাইভার কেবিনের গেট ধরতে যাবে অভিজিৎ, হ্যান্ডেলে ক্লিপ করে যায় হাত। তারপর সব অন্ধকার। মাথায় বড় কোনও চোট লাগল কি?

"কী তখন থেকে 'দেখাচ্ছি-দেখাচ্ছি' করছ! ফোনটা ধরো।" পর্ণার গলা। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে অভিজিৎ। দিবাস্বপ্ন। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর একটু শুয়েছিল। রিং থেমে গেছে ফোনের। সেটটা পর্ণার হাত থেকে নিতেই ফের বেজে উঠল। শুধুই নম্বর। ফোন কানে নিয়ে 'হ্যালো' বলল অভিজিৎ। অপর প্রান্ত বলল, "নমস্কার স্যার। ঘোষনগর থাকে যে-লোক চেয়েছিলেন আপনি, সে আমিই।"

অভিজিৎ চোখের ইশারায় পর্ণাকে ঘরের বাইরে যেতে বলে। ঘরে ঢোকার পারমিশন এখনও পায়নি পর্ণা। ফোন এসেছিল বলেই পুজোর জিভিড়। অভিজিৎ অপর প্রান্তকে বলে, "বলুন।"

"স্যার, আপনার দেওয়া ইনফরমেশন অনুযায়ী ছেলেটার সব খবর নিয়েছি। ওর মাথায় পার্টির বড় নেতার হাত আছে। মারধর করতে গেলে মামলা গড়াবে। হ্যাপা অনেক। আপনি যদি বলেন, মালটাকে উড়িয়ে দিতে পারি। খামেলা অনেক কম। দানা গোঁথে দেব পুজোর ভিড়ে। কে মারল, কেউ টের পাবে না।"

বাজিকে খুনের কথা বলছে লোকটা। অতদূর ভাবার মতো বুকের পাটা নেই অভিজিতের। তা ছাড়া বলছে, কেউ টের পাবে না। যদি পায়, তখন তো অভিজিৎও জড়িয়ে যাবে খুনের মামলায়, যাবজ্জীবন, ফাঁসি, কোনও একটা হবেই। অভিজিৎ বলে, "আপনাকে যে-কাজটা করতে বলা হয়েছে, সেটুকুই করুন। না করতে পারলে বলে দিন।"

"স্যার, কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন। যারা মারধর করবে, যতই মুখে রুমাল ঢাকা দিক, কোনও না কোনও ক্লু ফেলে যাবেই। যেহেতু নেতা আছে মাথায়, পুলিশ ঠিক গন্ধ শুঁকে ছেলেগুলোকে ধরবে। তারপর আপনাকে খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না পুলিশের।"

ফোন কানে নিয়ে ঝুলবারান্দায় চলে এসেছে অভিজিৎ। ওপারের

AMARBOI.COM

লোকটা নাছোড়। মনে হচ্ছে গলা তুলতে হবে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে যদি শুনে নেয় পর্ণা! অভিজিৎ বলে, "আমি তো বললাম, আপনার ছারা না হলে ছেড়ে দিন কাজ। আমি বুঝে নেব।"

"মিছিমিছি মাথা গরম করছেন। যাকে দিয়েই কাজটা করান, আপনি ফেঁসে যাবেন। ছেলেটা অভিনার নয়। আপনার অসুবিধেটা কোথায় বুঝতে পারছি না। হাসপাতালে পাঠানোর জন্য দুই চেয়েছিলাম, খালাসের জন্য মাত্র এক বাড়বে। মামলা চিরকালের জন্য শেষ। ভাল করে ভেবে নিন। আমি আবার কাল এই টাইমে ফোন করব।"

"আর কল করার দরকার নেই। কন্ট্যাক্ট ক্যানসেল করলাম আমি।" বলে ফোন কাটতে যাচ্ছিল অভিজিৎ।

অপর প্রান্ত বলে উঠল, "ও কে, নো প্রবলেম। বুকিং ফিক্স এক লাখ খোকনদার কাছে রেখে যাবেন।"

"বুকিং ফিক্স মানে?" সবিস্ময়ে জানতে চায় অভিজিৎ।

"অ্যাডভান্স। যে-কোনও কাজের অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে কৃক করতে হয় না, সেটাই। খোকনদার দেওয়া কনট্যাক্ট বলেই, আমি বিনা অ্যাডভান্সে কাজে নেমে গেছি।"

"তা বলে একলাখ! ছেলেটার নাম-ধাম-ছবি সব তো আমিই দিয়েছি। আপনাকে আর কতটুকু কাজ করতে হয়েছে!"

"হয়েছে। নয়তো বললাম কী করে, ছেলেটার মাথায় নেতার হাত। তা ছাড়া, একলাখ চাওয়ার আর-একটা কারণও আছে। এই যে আমার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে, সব তো রেকর্ড করে নিচ্ছি। এগুলো সিক্রেট রাখারও তো দাম দিতে হবে। সব যদি ছেলেটার হাতে তুলে দিই কিংবা পুলিশকে জানাই, বিশ্তর ঝামেলা পোহাতে হবে আপনাকে।"

"যা পারেন করে নিন। একটা টাকাও দেব না আমি," বলে ফোন কাটল অভিজিৎ। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। দেশটা কি ব্ল্যাকমেলারে ভরে গেল! যে যেমন ইচ্ছে ভয় দেখাচ্ছে। কোনও কাজ না করেই লোকটা চাইছে একলাখ। বাজিকে যুদ্ধ করতে মাত্র তিন। অদ্ভুত ব্যাপার! যথেষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে বাজির ছবি-ঠিকানা জোগাড় করেছিল অভিজিৎ। পর্ণা বাজির পুরো নামটা বলতে পারেনি। ফোন নাম্বারটা নিয়ে টু-ভায়লার অ্যাপ ইউজ করে নাম পাওয়া গেল বাজি চৌধুরী। ফেসবুক ঘেঁটে দেখা গেল অ্যাকাউন্ট আছে। ছবি ডাউনলোড করা গেল সেখান থেকে। পুরো লিলুয়ায়। এখানে এসে হেঁচটি খেয়েছিল অভিজিৎ। পর্ণাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি যে বলেছিলে, ছেলেটা তোমাদের ওখানকার, মানে শেওড়াফুলির!"

"এখন হয়তো লিলুয়ায় চলে গেছে। আমি তো আর খবর রাখতে যাইনি," বলেছিল পর্ণা। বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করতে আরও বেশি কসরত করতে হয়েছে। বাজির নাম্বারে ফোন করে অভিজিৎ বলেছিল, "ক্যুরিয়ার সার্ভিস থেকে বলছি, আপনি বাজি চৌধুরী তো? লিলুয়ায় থাকেন?" বাজি 'হ্যাঁ' বলাতে অভিজিৎ বলেছিল, "আপনার চিঠি আছে, ঠিকানাও আছে। কীভাবে যেতে হবে, যদি একটু বলে দেন সুবিধে হয়।"

অভিনয়ে কোনও খুঁত ছিল না। কীভাবে বাড়িতে পৌঁছতে হবে গড়গড় করে বলে দিয়েছিল বাজি। সমস্ত ইনফর্মেশন খোকনকে দিয়ে এসেছিল অভিজিৎ। খোকন ততদিনে গুন্ডার সঙ্গে কথা বলে মারধরের রেট জেনে নিয়েছে। খুন করার কথা গুঠেইনি। এখন কেন এসব কথা আসছে? ডিল ক্যানসেল হলে টাকা দিতে হবে, এমন কথাও বলেনি খোকন। একে জানাতে হবে এই ফোনটার ব্যাপারে। এখনই কল করবে কি?

"কী হল, বিকেলে বেরতে হবে। খেয়াল আছে?"

পর্ণার ডাকে হুঁশ ফেরে অভিজিতের। চায়ের কাপ হাতে ধরিয়ে ফের পর্ণা বলল, "নীলুঠাকুরপো গাড়ি বের করে মোছামুছি করছে। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। আমি কিন্তু তৈরি।"

চায়ে চুমুক মারে অভিজিৎ। তিনজন মিলে এখন লোকাল থানায় যাবে। নীলুই বলেছে, চাপ দিতে হবে পুলিশকে। নয়তো বাজিকে এখান থেকে তাড়ানো যাবে না। বাজিকে মারধরের যে-ব্যবস্থা অভিজিৎ করেছিল, নীলুকে বলা হয়নি। আসলে ও ধরেছে আদর্শের রাস্তা, যার জোরে উৎখাত করবে সমস্যাটাকে। অন্ধকার, বাঁকা পথের কথা তাই ওকে বলতে ইচ্ছে করেনি। মনে হচ্ছে, নীলু সফলও হবে। ফ্যামিলি গেঁট-টুগেদার ছাড়াও সায়েন্সপ্রবেশের ছেলেগুলোর সঙ্গে মিটিং করছে। ওরা নানারকম প্ল্যান ভাঁজছে। আজ যে থানায় যাওয়া হবে, আপাতত কাউকে জানাতে বারণ করেছে নীলু। পুলিশ কী, তার উপর নির্ভর করছে পরবর্তী স্টেপ। তা শেষ। দাড়িটা কি কেটে নেবে অভিজিৎ? পুলিশের সামনে ক্লেশলুক নিয়ে দাঁড়াবে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা অভিজিতের চোখ যায় রাস্তায়, স্বপ্নটা দারুণ ছিল! লরিটা এসে দাঁড়িয়েছিল ওখানেই।

দেউলপুর থানায় এসেছে নীলার্করা। যে অফিসার কেসটার দায়িত্ব নিয়েছেন, আপাতত সিটে নেই। অভিনার কথা অনুযায়ী, উনি থানার সেকেন্ড অফিসার। টেবিলের এপারে লম্বা বেঞ্চ ডিক্টিটরের জন্য নিশ্চয়ই। নীলার্ক বসতে যাচ্ছিল, বারণ করল অভিনা। বলেছিল, "পারমিশন না দেওয়া অবধি বসিস না।"

থানা যে একটা সমঝে চলার জায়গা ভুলতে বসেছিল নীলার্ক। শেষ কবে এসেছে, মনেও পড়ে না। বেঞ্চে ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও তার পিছনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন। এক হাবিলদারের থেকে জানা গিয়েছে, স্যার লকআপে গেছেন। কোনও বন্দিকে পেটাচ্ছেন হয়তো। তবে মারের আওয়াজ বা আর্তনাদ কিছুই ভেসে আসছে না। থানা জুড়ে একটা কর্মচঞ্চল ভাব। সবচেয়ে বড় কথা, থানাটা বেশ পরিষ্কার। দেওয়ালে ঝুলছে মনীষীদের ছবি, ডিজ়াইন ঘড়ি। ঘরের কোণে মেটালের ঢবে ইন্ডোর প্ল্যান্ট। থানার সামনের চত্বরে ঢোকার সিঁড়িতে বেশ কিছু টবের গাছ দেখেছে নীলার্ক। এটা কি দেশের সামগ্রিক উন্নতি নাকি এই থানার আইসির রুচি? আইসি-ই থানার প্রধান। ওঁর চেম্বারের পরদাটা তেতো দেখবার মতো! সেকেন্ড অফিসার ফিরে এলেন। ইয়ংম্যান, বয়স চল্লিশের নিচে। অভিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও কে মিস। বসুন। বসুন।"

নীলার্করা তিনজন বেঞ্চে বসল। অফিসার চেয়ারে বসে নীলার্কর দিকে একবার তাকিয়ে অভিনাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি?"

"আমার ভাই। খুড়তুতো। ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে, ছুটিতে এসেছে।" পরিচয় জেনে অফিসার হাত বাড়িয়ে নীলার্কর সঙ্গে শেকহ্যান্ড করলেন। নীলার্ক নিজের নাম বলল। অফিসার নিজের নামসহ পদটাও বললেন। এতটা সৌজন্য বোধ হয় নীলার্কর আমেরিকা বসবাসের কারণে। পুলিশরা সাধারণ মানুষকে এতটা পাত্তা দেয় না। তবে অফিসারটি একটা ব্যাপারে জেন্টেল্ম্যান ভদ্রলোক। নীলার্ক, অভিনার মাঝে বসে থাকা বউদির দিকে একবারও চোখ ঘামায়নি। অভিনাকে এখন জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন, আপনাদের কন্সা কী করতে পারি?"

অতিরিক্ত ভদ্রতার ফলে তুতলে গেল অভিনা। বলল, "না, মানে আমাদের ওই ব্যাপারটায়, মানে ভিডিয়ো, তদন্ত কত দূর কী হল..."

বউদির দিকে একবার তাকিয়ে অফিসার অভিনাকে বললেন, "উনি একটু বাইরে অপেক্ষা করলে ভাল হয়।"

সঙ্গে-সঙ্গে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়ল বউদি। থানায় এসে থেকে গায়ে আঁচল ঢাপা দিয়ে আছে। থানা এরা যতই সাজাক, মানুষের মন থেকে ভয়টা যেতে সময় লাগবে। বউদি বেরিয়ে যাওয়ার পর অফিসার বলল, "ভিডিয়োতে কোনও সুপার ইম্পোজ় নেই। সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছিলাম। ওরা পরীক্ষা করে দেখেছে। ফ্র ফুটেজ ওয়াক্স স্ট্রেট অ্যান্ড সিম্প্‌ল, কম্পিউটার গ্রাফিক্স দিয়ে কোনও বেরামতি করা হয়নি। ছবিটা ভাল ক্যামেরায় তোলা হয়েছে।"

নীলার্ক কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। অভিনা টেবিলে কনুই তুলে হাতের তালুতে মাথা নামিয়ে দিয়েছে। অফিসার বললেন, "জানি আপনারা শক্‌ড। তবু এইসময় মাথা ঠান্ডা রাখতে বলব। ভিডিয়োটা যে সত্যি প্রমাণ হয়েছে, সেটা এতেবারে চেপে যান। আমরাও কাউকে কিছু বলছি না। যতই হোক, আপনারা তো একটা পাড়া বা সমাজে বাস

AMARBOI.COM

করেন, সেখানকার শান্তি-শৃঙ্খলার বিকটাঙ্গ আমাদের দেখতে হয়। আর হ্যাঁ, একটা কথা যেয়াল করিয়ে দিই।"

থামলেন অফিসার। অভিজার দিকে ঘাড় ঘোরালেন। ভঙ্গি পালটায়নি অভিজা, মাথা নামিয়ে রেখেছে। অফিসার বলছেন, "রাগের বশে মিসেসের উপর চোটপাট বা মারধোর করতে যাবেন না। তাতে ওর বাড়ির লোক বধূনির্যাতনের অভিযোগ আনতে পারেন। ঘটনা যা-ই ঘটুক, আইনত উনি আপনার স্ত্রী।"

অভিজার দিক থেকে কোনও সাড়া নেই। নীলার্ক বলে, "আচ্ছা, আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? মানে, বলতে চাইছি, বউদির আচার-ব্যবহারে কখনও বোঝা যায়নি, এধরনের ব্যাপারে জড়িয়ে থাকতে পারে। এটা আমাদের কাছে খুবই সারপ্রাইজিং।"

"আমার কাছেও। আপনাদের বাড়ির ব্যাপারে আমরা খোঁজ নিয়েছি। ভদ্র, শিক্ষিত, বনেদি পরিবার। এক ছেলে আমেরিকায় ডক্টরেট করছে, তাও জেনেছিলাম। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হল। এরকম একটা ফ্যামিলিতে এই ঘটনা সত্যিই অনভিপ্রেত।"

এখনও যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না নীলার্ক। বলে ওঠে, "যত দূর জেনেছি, দাদা-বউদি আপনাদের কাছে কোনও ভিডিয়ো ক্লিপিংস দেয়নি। শুধু কমপ্লেন লজ করেছিল। সেখানে কিছু গোলমাল হয়নি তো? মানে, যেটা ছড়িয়েছে, সেটাই কালেই করেছেন তো আপনারা?"

"হ্যাঁ, সেটাই করেছি। চাইলে দেখাতে পারি, উইথ সাইবার ক্রাইম টেস্ট রিপোর্ট।"

এত কিছু যখন আপনার হাতে, "তা হলে নিশ্চয়ই এটাও জানেন, যে ভিডিয়োটা ছড়িয়েছে, অবাবে আমাদের পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছে। তাকে ধরছেন না কেন?" বলল নীলার্ক।

অফিসার বললেন, "সে ক্ষেত্রে আপনাদের বউকেও আমাদের ইন্টারোগেট করতে হবে। ওই ধরনের ভিডিয়োতে পার্টিসিপেট করাটাও বেআইনি।"

এর পর আর কিছুই বলার থাকে না। নীলার্ক টের পাচ্ছে, কপাল ঘেমে গেছে তার, হাত-পায়ে ঝিমঝিম ভাব। অফিসে যেমন কোনও পয়েন্ট যে পাচ্ছে না সে। অভিজার মনের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে অসুবিধে হচ্ছে না। ফের অফিসার বলে উঠলেন, "আইন বাঁচিয়ে কেসটার তদন্ত করেছি আমি। কারও নামধাম সামনে আনিনি, আপনাদের বাড়ি বা পাড়ার পরিবেশের কথা ভেবে। ফাইলটা ক্লোজ করে রাখতেও আমার অসুবিধে হবে না। আবারও বলছি, ব্যাপারটা নিয়ে হইচই না করে, ঠান্ডা মাথায় মীমাংসা করুন।"

"মীমাংসা বলতে?" জানতে চায় নীলার্ক।

"বাড়ির বউয়ের ব্যাপারে যে-সিদ্ধান্তটা নেবেন, মাথা ঠান্ডা রেখে নিন। বোঝাতে পারলাম কি?"

অনামনস্কভাবে মাথা নেড়ে সায় জানায় নীলার্ক। বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়ে। টের পায় অভিজাও উঠল। নীলার্ক অফিসারকে বলে, "অ্যাডভাইসগুলো দেওয়ার জন্য ধ্যাঙ্কস। আজ আসি। দরকারে আবার আসব।"

"অবশ্যই আসবেন..." বলে জোড়হাত করলেন অফিসার।

নীলার্ক আড়ষ্ট হাতে সৌজন্য বিনিময় করল। এগিয়ে গেল দরজা লক্ষ করে। পাশে চলেছে অভিজা, ওর দিকে তাকাতে পারছে না নীলার্ক, ভাঙাচোরা চেহারাটা সহ্য করতে পারবে না।

দরজা পেরিয়ে এসে নীলার্ক অবাক! বউদি কোথায় গেল? বাইরের বেঞ্চটাতে তো নেই! থানার সামনেটায় চোখ বোলাতে পাওয়া গেল, শানবাঁধানো পাছতলায় বসেছিল। নীলার্কদের দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। এত দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে বউদি ভীষণ উদ্বিগ্ন।

দুই ভাই হাঁর পায়ে পায়ে গাছতলায় পৌঁছয়। কৌতূহলে পর্ণা জানতে চায়, "কী বলল?"

আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে স্বাভাবিক রেখে নীলার্ক বলল, "এরা তো বলছে ভিডিয়োটা ফেক নয়। পরীক্ষা করে দেখেছে কোনও কায়দাকানুন করা হয়নি। আমরা কিছু বলতেও পারছি না। হাতে কোনও প্রমাণ নেই।"

পর্ণা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে নীলার্কর দিকে। চোখের ভাষা পড়তে পারছে না নীলার্ক। ফের সে বলে ওঠে, "তুমি কিছু ইনপুটস দাও, যা দিয়ে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি। যেমন ধরো, কেউ কি তোমার ভিডিয়ো তুলেছিল, যেখানে ইয়ার্কির ছলে মুখের এক্সপ্রেশনে তুমি সেক্সুয়াল প্রোভোকেশনের অ্যাক্টিং করছিলে? কাপড়জামা পরাই ছিল তোমার। মুখের ছবিটুকু নিয়ে কেউ ওই নোংরা ভিডিয়োটা বানিয়েছে?"

উত্তর দিচ্ছে না পর্ণা। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে। নীলার্ক বলে, "যে ছবিটা তুলেছে, তাকে ধরলেই মাথা ফেল আসবে। তুমি ছেলে বা লোকটার নাম বলো।"

আবারও কোনও উত্তর নেই। মাথা নামিয়েছে পর্ণা। কাছেই একটা কুকুর বিশ্রিভাবে ডেকে উঠল। কেউ হয়তো ইট মেরেছে। নীলার্ক তাড়া দেয় পর্ণাকে, "কী হল? কিছু তো বলো। কোনও একটা ক্লু, যেটা ধরে আমরা এগোতে পারি। পুলিশ যা বলে দেবে, সেটা মেনে নিতে হবে, এ তো হতে পারে না!"

পর্ণা মুখ তুলে বলল, "ভিডিয়োটা সত্যি।"

সামনে যেন বাজ পড়ল। তার জন্যই কি কালা হয়ে গেল নীলার্ক? কিছু শুনতে পাচ্ছে না। মুহূর্তে আর-একটি ঘটনা, অভিজা সপাটে চড় কষাল বউদির গালে। বউদি ছিটকে পড়ল রাস্তায়। অভিজা ছুটছে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। বউদি নিজেকে সামলে নিচ্ছে দেখে, নীলার্ক অভিজাকে ধরতে দৌড়ল।

থানার পাঁচিলে ঠেস দিয়ে বসে পড়েছে অভিজা। মুখ-চোখ বেঁকে গিয়েছে কান্নায়। দুখি পাখিয়ে মেরে যাচ্ছে মাটিতে। হাঁটু মুড়ে বসে নীলার্ক। অভিজার কাঁধে হাত রেখে বলে, "শান্ত হও। এত ভেঙে পোড়ো না। সামনে অনেক কাজ।"

"ও আগে কেন বলেনি ভিডিয়োটা সত্যিকারের? কেন ঠকাচ্ছিল আমাদের? কেন বলেনি? কী ভেবেছিল? আমরা শালা..." গালাগাল দিল অভিজা।

নীলার্ক বলে, "স্বীকার তো করেছে আলটিমেটলি। এখনও তো বলতে পারত পুলিশ ভুল বলছে। এবার আমাদের কর্তব্যটা ভাবতে হবে।"

"স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। জানে, আর চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। শালা আমার সঙ্গেই বেছে-বেছে এই বেইমানিটা করল কেন? কেন বারবার আমাকেই মার খেতে হবে ভাগ্যের হাতে..."

অভিজার বগলের তলায় দু'হাত ঢুকিয়ে তোলার চেষ্টা চালায় নীলার্ক। বলতে থাকে, "অফিসার ঠিক অ্যাডভাইস দিয়েছে। ভিডিয়োটা যে সত্যি, কাউকে জানানোর দরকার নেই। জেঠুকেও না। জানলে পরিস্থিতি আগের মতো জট পাকিয়ে যাবে। ব্যাপারটা আমি, তুমি হ্যান্ডেল করব।"

অভিজিৎকে নিয়ে গাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে নীলার্ক, ঘাড় ঘুরিয়ে পর্ণাকে খোঁজে। কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অভিজাকে বসিয়ে আবার বউদিকে খুঁজতে যেতে হবে। গাড়ির দিকে দু'পা এগোতেই নীলার্ক দেখে, পিছন সিটের ধার ঘেঁষে বসে আছে পর্ণা।

আট

রক্তকরবী থেকে রঙ্গনগাছে। রঙ্গন থেকে টগর, টগর থেকে পুকুরপাড়ে হেলে পড়া স্থলপদ্মের ডালে বারকয়েক দোলা দিয়ে পাখিটা কাঠগোঁপা গাছে বসল। কালো খুঁটিটা নাড়িয়ে ডেকে উঠল মিষ্টি সুরে। বুলবুলি। পাখিটাকে চেনে পর্ণা। ওর সঙ্গীটিকে এখনও দেখা যায়নি। পাখিটার ছটপটানি এই মুহূর্তে ভীষণ টানছে পর্ণাকে। কারণ, সে নিজে তো গত দু'দিন ধরে দোতলার এই ঘরে প্রায় স্থির! আগের মতো সংসারের

কাজকর্ম করছে না। কেউ বারণ করেনি। ইচ্ছে করছে না করতে। বাড়িতে এখন বুটো কাজের লোক। ভিডমাসি আগেই ঢুকেছিল। তপার মা রান্নার কাজ করছে পরশু থেকে। অভিজিৎই ডেকে কাজে লাগিয়েছে। পর্ণাকে বলেছে, "তোমাকে আর রাঁধতে হবে না।" কেন হবে না, জিজ্ঞেস করার মুখে নেই পর্ণার। অভিজিৎ বলতেই পারে। আমার ঘেন্না করে থেকে। কারণ, সে স্বীকার করেছে, ভিডিয়োর মেয়েটা আমিই।

থানা থেকে ফেরার পথে নীলুঠাকুরপো বলেছিল, "আমাদের কাছে যা স্বীকার করেছ, আর কাউকে বলতে যেয়ো না। তাতে হয়রানি বাড়বে।"

আর কাকে বলবে পর্ণা! অভিজিৎকে বলে সে ভারমুক্ত হয়েছে। মিথ্যেটা আর টানতে পারছিল না। এবার অভিজিৎ ঠিক করবে, কাকে বলবে, না বলবে। নীলুঠাকুরপোরও সত্যিটা জানার দরকার ছিল। সে প্রথম থেকেই বিশ্বাস করে বসে আছে যে, ভিডিয়োর মেয়েটা তার বউদি নয়। বাকি সবাই পর্ণাকে সন্দেহ করছে। যে-মানুষটা বিশ্বাস করে, তাকে ঠকাতে বড় অপরাধ বোধ হয়। পর্ণা মনে করলে তাকে নিয়ে এই ছিধা-সংশয় ছিইয়ে রাখতে পারত। কিন্তু কত দিন? নতুন-নতুন সমস্যা তৈরি হত। পর্ণা ভাইছিল, একটা হেস্তনেস্ত। থানা যখন জানিয়ে দিল, ফুটেজে কোনও কারিকুরি নেই। পর্ণা দেখল, এই সুযোগ। এখনই স্বীকার করে নেওয়া ভাল। হেস্তনেস্ত বলতে যা বোঝায়, সেরকম কিছু হল না। একটা চড় মারা ছাড়া অভিজিৎ এখনও পর্যন্ত আর কোনও শাস্তি দেয়নি। সেটাও মেরে ফেলেছে সত্যিটার ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে। ব্যাপারটা যতদিন সন্দেহের পর্যায়ে ছিল, কখনও গায়ে হাত তোলেনি। থানা থেকে গাড়িতে ওঠার পর একটাও কথা বলেনি অভিজিৎ। নীলুঠাকুরপো যখন এ বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল, পর্ণা ভেবেছিল অভিজিৎ হয়তো বারণ করবে ঘরে ঢুকতে। কিছুই বলেনি। শ্বশুরমশাই যেহেতু জানতেন, নীলু বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। পর্ণাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কোথায়-কোথায় গেলে বউমা! কলকাতার দিকে যাওনি মনে হচ্ছে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে!"

বানিয়ে উত্তর দেওয়ার মতো মুড ছিল না। সত্যিটাকেও বলা যাবে না। নীলুঠাকুরপোর বারণ। পর্ণা সিঁড়ি ধরে উঠে এসেছিল। আসার সময় শুনতে পাচ্ছিল শ্বশুরমশাই অভিজিৎকে বলেছেন, "হ্যাঁ রে, বউমার শরীর খারাপ হল বেড়াতে গিয়ে? এত চুপচাপ!"

অভিজিৎ কী উত্তর দিয়েছে জানে না পর্ণা। ততক্ষণে সে ঘরে চলে এসেছে। সম্ভবত থানার ঘটনাটা বলে দিয়েছে অভিজিৎ। শ্বশুরমশাই আর ডেকে কথা বলেননি। খাবার বেড়ে দিলে থানা। অভিজিৎ সেটাও এড়িয়ে যায়। থানা থেকে ফিরে অভিজিৎ কিছু না বললেও, পরের দিন সকালে জবাবদিহি করতে এসেছিল ঘরে। থানা থানিকটা সামলে নিয়েছিল সময়ের ব্যবধানে। জিজ্ঞেস করেছিল "ওরকম একটা ভিডিয়ো তুলিয়ে ছিলে কেন? পেশা ছিল, না কি শখ! গুই একবারই? কোনওভাবে কি বাধ্য করা হয়েছিল?"

"এগুলোর কোনও একটা হলে কি আমাদের সম্পর্কের তারতম্য হবে? আর থবনও মেনে নিতে পারবেন আমাকে?" উত্তর কী হবে জেনেই, প্রশ্নটা করেছিল পর্ণা। সেটাই বলল অভিজিৎ, "না, মেনে নিতে পারব না। তবু একটা কৌতূহল তো হয়ই। যে-পরিবেশে মানুষ হয়েছে, তোমার শিক্ষা-দীক্ষা আদবকায়দার সঙ্গে ঘটনাটা একেবারে মানায় না বলেই জানতে চাইছি,"

জানিয়ে লাভ হবে না। তাই চুপ ছিল পর্ণা। একটু অপেক্ষা করে অভিজিৎ বলতে চাইল, "এবার কী করবে?"

"তুমি যা বলবে," বলেছিল পর্ণা।

অভিজিৎ বলল, "আমি যা চাইব, তাই করবে কেন? এত অনুগত হওয়ার কারণ?"

"এখন তো আর তোমার কাছে স্ত্রীর স্বীকৃতি চাইতে পারি না। ফুটেজটা কোর্টে দাখিল করলেই তুমি ডিভোর্স পেয়ে যাবে। যদি চলে যেতে বলো, তা হলে যেতেই হবে।" বলেছিল পর্ণা।

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে?"

"জানি না," উত্তর ছিল পর্ণার।

পরের প্রশ্নে যাওয়ার আগে একটা সময় নিয়েছিল অভিজিৎ। বলেছিল, "স্বীকারই যখন করলে, এত দিন পরে কেন? পুলিশ সত্যিটা বের করে ফেলেছে বলেই কি? দেখলে, আর এদের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না।"

বেশি কথায় যায়নি পর্ণা। মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল। আর কোনও প্রশ্ন করেনি অভিজিৎ। চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে আর পর্ণার সঙ্গে কথা বলে না। এখন একটা কথাই ওর বলা বাকি আছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

কোথায় যাবে, এখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি পর্ণা। আপাতত শেওড়াফুলির বাড়িতে গিয়ে ওঠা ছাড়া গতি নেই। ভিডিয়োটা সত্যি এই খবর এবং বাজি ওখানে পৌঁছনোর আগেই দেখে নিতে হবে নিজের রাস্তা। বাড়িতে বলতে পারবে না, তোমাদের রক্ষা করতে গিয়ে আজ আমার এই হাল। বাঁচানোর প্রক্রিয়াটা যখন শুনবে বাড়ির লোক, বলবে, আমরা তো বলিনি এতটা নিচে নামতে। এর থেকে আমাদের মরে যাওয়াই ভাল ছিল।

ওদের মরে যাওয়াটা সহ্য করতে পারবে না বলেই তো এই পন্থা নিয়েছিল পর্ণা। এই কাহিনি যদি অভিজিৎকে বলতে চায়, সে বলবে, "যাদের তুমি রক্ষা করছ, একমাত্র তারাই তোমার আশ্রয় হতে পারে। আমি নই।" গোটা ঘটনাটা নীলুঠাকুরপোকে জানাতে হেজে করছিল পর্ণার। কতটা নিরুপায় হয়ে সে ভিডিয়োর কাজটা করেছে। কিন্তু সেই যে থানা থেকে বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে ঠাকুরপো, আর আসেনি। বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছে বলেই হয়তো। তবু যদি আসে পরে, ঘটনা জানিয়ে লাভ হবে না। এ বাড়িতে পর্ণার আগের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পারবে না নীলু। আবার এমনও হতে পারে, নীলুঠাকুরপো ভাবল, সহানুভূতি দেখানোর জন্য গল্প বানাচ্ছে পর্ণা। সেটা আরও বেশি অপমানজনক। তার চেয়ে এই কাহিনির সঙ্গে পর্ণার সহমরণ শ্রেয়। ছয় লক্ষ পর্ণার হাতে যখন ২০ লাখ তুলে দিয়েছিল পর্ণা, দাদা জিজ্ঞেস করেছিল বটে, "এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় করছিস?" পর্ণা বলেছিল, "সে নিয়ে এখন না ভাবলেও চলবে। আগে পলিসি হোল্ডারদের টাকা শোধ কর।"

শোধ হয়ে গেল টাকা। বেঁচে গেল পরিবার। দাদা ভুলেও আর কোনওদিন জানতে চায়নি, টাকা কীভাবে জোগাড় করেছিল। এতগুলো টাকা যে সোজা পথে আসেনি, আন্দাজ করতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তার দায় দাদা নেবে না। ঠিক কত টাকা, বাড়ির বাকি তিনজন লোক জানে না। পলিসি হোল্ডারা দাদার থেকে কত টাকা পায়, জানানো হয়নি তাদের। জানালে হয়তো বাবা-মার মধ্যে কারও একজনের স্ট্রোক হয়ে যেত। ওরা জানল, পর্ণা দৌড়ঝাঁপ করে, চেয়েছিতে টাকা জোগাড় করে পরিবারকে বাঁচিয়েছে।

জমি-বাড়ির দালালিতে হেঁচড় খেয়ে দাদা একটা অর্থলগ্নি সংস্থার এজেন্ট হয়েছিল। বড় কোম্পানি, হোটেল, ট্রাভিক্রম, ফিল্ম প্রোডাকশন হাউজ এবং আরও অনেক কিছুই আছে। সব ক্ষেত্রে আস্থার জায়গায় ছিল, কোম্পানির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নেতা-মন্ত্রীদের উপস্থিতি। প্রচুর খেটেখুটে দাদা ক্লায়েন্ট জোগাড় করতে লাগল। যাদের মধ্যে লোকাল লোকই বেশি। পর্ণাদের এলাকায় যেহেতু অল্পশিক্ষিত, গরিব মানুষের বসবাস, রিকশোওয়ালা, চটকলের শ্রমিক, লোকের বাড়ি কাজ করতে যাওয়া মহিলা... এরা ব্যাঙ্কে গেলে ঘাবড়ে যায়। সামান্য সঞ্চয় কোথায় রাখবে ভেবে পায় না। দাদার মতো ভদ্রঘরের পড়াশোনা জানা ছেলে, মানুষগুলোর বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিল সহজেই। শর্টার্ম স্কিমের ম্যাচিওরিটির টাকা পাইয়ে দিচ্ছিল দাদা। একসময় ক্লায়েন্ট আসছিল নিজে থেকেই। ভাড়াবাড়ির সামনের ঘরটা তখন দাদার অফিসঘর। সকাল আটটা থেকে শুরু হয়ে যেত লোকের আনাগোনা, রাত দশটার আগে সে ফি হত না। গরিব মানুষগুলোর স্বপ্ন গচ্ছিত করে রাখত দাদার কাছে, মানে সৌমাদা বা সৌমার কাছে। নামটা তখন দেখাস, দাদার রোজগার হচ্ছিল ভালই। একদম অপচয় করত না। মোটরবাইক

কিনেছিল কাজের সুবিধের জন্য, বাকি টাকা জমাচ্ছিল ফ্ল্যাট কেনার আশায়। পর্ণাদের বলত, জন্ম থেকে ভাড়াবাড়িতে আছি, এবার সবাই মিলে নিজেদের বাড়িতে থাকব। সে বাড়ি কেমন করে সাজানো হবে, তাই নিয়েই প্রায়ই বোনের সঙ্গে মনোমালিন্য হত পর্ণার। হঠাৎই দাদাকে ক'দিন ধরে চিন্তিত, অস্থির লাগছিল। পর্ণা জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হয়েছে রে দাদা! চেনশনে আছিস মনে হচ্ছে?"

"আর বলিস না, বেশ ক'টা পলিসি ম্যাচিওর করেছে। কোম্পানিতে কাগজপত্র জমা দিয়েছি, চেক ক্লিয়ার হচ্ছে না। কোম্পানি অবশ্য বলছে, সাময়িক একটা ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। কিন্তু আমার যে ক্লায়েন্টের মেয়ের বিয়ে ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে, ডেট তো আর পিছনো যাবে না।" ভীষণ উৎকণ্ঠার গলায় বলেছিল দাদা। চেক ক্লিয়ার হল না। ফ্ল্যাটের জন্য জমানো টাকা থেকে ক্লায়েন্টের অ্যামউন্টটা দিয়ে দিল। কিন্তু কত দেবে? একের পর এক পলিসি ম্যাচিওর করেছে, বাড়িতে আসছে পার্টিরা। দাদা তাদের নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছে। কেউ বুঝছে না, কেউ না। ফাইনাল ডেট চাইছে পেমেন্টের। দাদা দৌড়াচ্ছে ইমিডিয়েট বসের কাছে। তিনিও দাদাদের মতো কমপ্লেনে জেরবার। জমানো টাকা ভাঙিয়ে দাদা নাছোড় পার্টিদের টাকা মেটাচ্ছে। অবস্থা সামাল দেওয়া যাবে না বুঝতে পেরে প্রথমে দাদার সব নিরুত্তেজ হলেন। দাদা কোম্পানির কলকাতার অফিসে গিয়ে পলিসি হোল্ডারদের প্রাপ্য টাকা দেব করার চেষ্টা করছে। একদিন গিয়ে দেখল, কোম্পানির অফিসে তালা। সিইও, এমডি সব বেপাত্তা। সেদিন আর বাড়ি ফেরেনি দাদা। কোম্পানি বন্ধ হওয়ার খবর মিডিয়া মারফত ছড়িয়ে পড়ল। দাদার সমস্ত ক্লায়েন্ট হেরে এল বাড়িতে। যার ততটুকু টাকা জমা আছে, সব চাই। দাদাকে না পেয়ে বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর করল তারা। অশ্লীল গালাগালি দিল। দাদার বাইকটা তুলে নিয়ে গেল মস্তান টাইপের কয়েকজন। ভয়ে আতঙ্কে সিঁটিয়ে রইল পর্ণারা। পার্টিরা হুমকি দিয়ে গিয়েছে আবার আসব বলে। দাদার হদিশ ওদের চাই। নয়তো এরাদ্বি তিনজনকে টাকা শোধ দিতে হবে। চারদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর দাদা মাঝরাতে বাড়ি ফিরেছিল। কেন ফিরেছিল, কী করে জানার সুযোগ হয়নি। হয়তো কোনে গিয়েছিল, বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে। মা-বাবা-বোনেরা কেমন আছে, দেখতে এসেছিল। বাড়িতে চোখার মুখেই ওকে ধরে ফেলল, কয়েকজন ক্লায়েন্ট। তারা যে দিবারাত্রি তাদের বাড়ির উপর নজর রাখত, তা টের পায়নি পর্ণারাও। চলল বেধড়ক মার। ওরা সব ক্লায়েন্টদের ফোন করে ডেকে নিল। পেটানো চলল পরেরদিন সকাল পর্যন্ত। ফের একদফা বাড়ি তছনছ হল। তাণ্ডব আচ্ছাদিত গিয়ে আক্রান্ত হল পর্ণারাও। থানায় ফোন করা হয়েছিল। পুলিশ এল অনেক দেরিতে। তখন দাদা মাটি নিয়েছে, ছিঁড়ে গিয়েছে জামা-প্যান্ট। সারা শরীর জুড়ে কালশিটে। ফেটে গিয়েছে চোখ-মুখ, রক্ত শুকিয়ে গিয়ে ফের নতুন করে রক্ত গড়াচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তি করার জরুরি দায়িত্বটা পালন করল পুলিশ।

স্যালাইন, অক্সিজেন নিয়ে একদিন বাদে কথা বলার অবস্থায় এল দাদা। হাসপাতালের বেডে শুয়ে পর্ণাকে বলেছিল, "সুস্থ হয়ে ফিরলে আবার তো মার খেতে হবে। কী করা যায় বল তো? আমি যদি পালিয়েও যাই, তোরা ছাড় পাবি না। যদিও এদেরকেও দোষ দেওয়া যায় না। গরিব মানুষ। বিশ্বাস করে সর্বস্ব রেখেছিল। কেউ আবার টাকা ধার করে আমার কাছে বাড়াতে চেয়েছে। আমি সেটা জানতে দেওয়া বারণ করিনি। কী করে বুঝব এই দশা হবে।"

"কত টাকা দিতে হবে?" জানতে চেয়েছিল পর্ণা। দাদার থেকে অ্যামউন্টটা শুনে হাঁ হয়ে গিয়েছিল পর্ণা। তারপর বলেছিল, "বাবাকে এত টাকার কথা বলিস না। টেনশনে কিছু একটা হয়ে যাবে। আমি দেখছি কতটা কী করা যায়।"

"তুই-ই বা এত টাকা জোগাড় করবি কী করে?" ভীষণই হতাশ হয়ে বলেছিল দাদা।

পর্ণা বলেছিল, "সে তুই আমার উপর ছাড়। ডাক্তারদের ম্যানেজ করে বেশিদিন থাকার ব্যবস্থা কর এখানে।"

পর্ণার আশ্বাসে বিন্দুমাত্র আলো জ্বলেনি দাদার চোখে। অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সিলিংয়ের দিকে। পর্ণার মনে হয়েছিল দাদা হয়তো, হাসপাতালে বেশিদিন থাকার বদলে এখান থেকে না ফেরার কথা ভাবছে।

ক'দিন ধরে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুদের কাছে ছোটছুটি করল পর্ণা। জানাল নিজেদের অবস্থার কথা। যা বুঝল, ৫০- ৬০ হাজারের বেশি জোগাড় হবে না। আর সে টাকাও ফেরত দিতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তখনই হঠাৎ মনে পড়েছিল রেবার কথা। কলেজে ঢুকেই বুম করে আয় বন্ধ করে দিয়েছিল মেয়েটা। খুব চঞ্চল প্রকৃতির। লেখাপড়ায় মন নেই, এই ক'দিনেই বোঝা গিয়েছিল। তার বহুর দুয়েক পর হেভি স্টাইলিস্ট একটা মেয়েকে দেখে পর্ণার মনে হল, রেবা না? কাছে গিয়ে বলেছিল, "কিছু মনে কোরো না, তুমি..."

পুরোটা বলতে হয়নি। সানগ্লাস খুলে রেবা বলেছিল, "ঠিক বলেছিস।"

"বাব্বা! ভাবাই যাচ্ছে না যে, তুই। কী দিয়েছিস রে! পুরো হিরোইন!" বিস্ময় প্রকাশ করেছিল পর্ণা।

প্রশস্তি শুনে গর্বের হাসি হেসেছিল রেবা। ফের পর্ণা জিজ্ঞেস করে, "তো কী করছেস এখন? ড্রেস-ফ্রেস যা মেরেছিস! মনে হচ্ছে নিজেই রোজগার করছিস! সাইল করার জন্য বাড়ি থেকে তো এত টাকা দেবে না।"

কোনও ভণিতা না করে রেবা বলেছিল,"পার্টিতে ভাড়া খাটছি।"

"সেটা কীরকম?" অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল পর্ণা,

রেবা বলল, "বেশ কিছু বুড়ো ক্লায়েন্ট আছে আমার। সব বিশ শট। কোম্পানির ম্যানেজার, এমডি... এদের সঙ্গে বউগুলোরও বয়স হয়েছে। পার্টিতে প্রেজেন্ট করার মতো নয়। তাই আমাকে ভাড়া নেয়। বুড়োগুলোর গার্লফ্রেন্ড।

এরকম পেশার কথা প্রথম শুনছিল পর্ণা। জানতে চেয়েছিল, "তোকে কাজটা কী করতে হয়?"

"কিছুই নয়। মুখে হাসি-হাসি ভাব ফুটিয়ে রেখে বুড়োগুলোর কনুইয়ের জোড় বেঁধে ঘুরতে হয় পার্টিতে। বুড়োগুলো মাঝে-মাঝে চুমু খায় গালে আর আমাকেও খেতে হয়। সব ওই পার্টিতেই, বাইরে নয়। ভাল খাবার-দাবার জুটে যায়। সঙ্গে হাউন্ডিজিস। পার্টি ফেরত পেমেন্ট নিই গাড়িতে। নামিয়ে দেয়, ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে আসি।" বলে খুবি হাসি হেসেছিল রেবা।

পর্ণা জিজ্ঞেস করল, "বিয়ে করবি না? এসব করলে পাত্র জুটবে?"

"টাকা থাকলে ঠিক জুটবে। আগে টাকা জমাই।"

বিপদের দিনে রেবার কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল পর্ণার। ভাগ্যিস সেদিন ওর নম্বারটা নিয়েছিল পর্ণা। বলল, "তোর সঙ্গে ভীষণ দরকার। আজ-কালের মধ্যে দেখা করতে চাই।"

রেবা গুর রিহড়ার ফ্ল্যাটে ডেকেছিল। একা থাকে। ফ্ল্যাট দারুণ সাজানো-গোছানো। ফ্যামিলি কোথায় থাকে জানতে চেয়ে সময় নষ্ট করেনি পর্ণা। নিজের সংকটের কথা সবিস্তারে বলেছিল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, "এতগুলো টাকা এই অল্প সময়ে আমার লাইনে রোজগার করা সম্ভব নয়। সাত-আট বছর লেগে যাবে। নিজেকে মেনটেন করারও তো একটা সময় লাগবে। ড্রেস-লাল খাওয়া-দাওয়া, নিয়মিত বিউটি পার্লার। একটা রাস্তা আছে, তাড়াতাড়ি টাকা জমানো। সেক্স ভিডিয়োতে অ্যাক্টিং। আমিও মাঝেমাঝে করি।"

"ব্লু ফিল্ম!" বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটেছিল পর্ণার মুখে।

রেবা শান্তভাবে বলেছিল, "লোকে এই বলে ডাকে। জিনিসটা বিভিন্নভাবে তৈরি হয়। একেবারে খোলাখুলি, আবার রেখে ঢেকেও শুটিং করে। তোকে আমি রেখে-ঢেকের কথাই বলছি। সাত-আট বারেই তোর যা টাকা দরকার চলে আসবে।"

"রেখে-ঢেকে ব্যাপারটা কীরকম?" জানতে চেয়েছিল পর্ণা।

রেবা বলল, "স্কিন কালারের ব্রা-প্যান্টি দেবে গুরা, গুটা পরে পার্টনারের সঙ্গে সেক্স করার অ্যাক্টিং করতে হবে। ইন্টারকোর্স হচ্ছে,

BANGLA BOI.COM

ভাব আনতে হবে মুখে। ওরা এমন অ্যাঙ্গেল থেকে শুট করবে, যেমন মনে হবে, পুরোটাই হচ্ছে।"

"তারপর ভিডিয়োটা নিয়ে ওরা কী করবে? মানে, লাভ করবে কীভাবে?" জানতে চেয়েছিল পর্ণা।

রেবার উত্তর ছিল, "বেচে দেবে বিদেশে। আমাদের মতো ট্যান কালারের বাইরের দেশে প্রচুর ডিমান্ড। নয়তো এত টাকা ওরা অ্যাডভেন্স দিচ্ছে কেন?"

কিছুটা দ্বিধা-সংশয় নিয়ে পর্ণা বলেছিল, "শুটিং কেমন করে হয়, একবার দেখা যেতে পারে?"

"না, শুটিংয়ে বাইরের কেউ অ্যালাউ করে না। এমনকী, ক্রু-মেম্বারও নয়। তারা লাইট, ক্যামেরা, সেট করে বেরিয়ে চলে যায়। ফ্লোরে থাকবে শুধু দুটো ক্যামেরাম্যান আর দুটো অ্যাক্টর। এই বিজনেস সিক্রেসিটাই মেন জিনিস। তুই যদি রাজি থাকিস, বল। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি।" সাফ জানিয়ে দিয়েছিল রেবা।

রাজি তখনও হয়নি পর্ণা।

তবু রেবাকে বলেছিল, "তুই আমার সঙ্গে থাকবি তো?

"শুধু থাকলে তো হবে না, আমাকেও কাজ করতে হবে। ওই যে বললাম, শুধু দেখার জন্য ওরা কাউকেই অ্যালাও করবে না। শুটিং জিনিসটা খুবই বোরিং। খুব টাকার দরকার ছাড়া কাজ করি না। আধ ঘন্টার ফুটেজ তুলবে, তিন ঘন্টার জন্য বন্ধ ঘরে আটকে রাখবে। তবে প্রথমবার তোর সঙ্গে কারও যাওয়া দরকার, লাভারস সিন্ড্রোম হবে।

যেতে রাজি হয়েছিল রেবা। বলে দিয়েছিল, যেখানে বলা হবে, সেখান থেকেই গাড়িতে তুলে নেবে শুটিংয়ের লোকজন। নামিয়েও দেবে সেইমতো। শুটিং শেষ হলেই স্পটে ক্যাশ পেমেন্ট। পার শুটিং এগ্রান্ডাই অ্যামউন্টটা সেদিনই বলতে পারবে রেবা। মোবাইলে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে পর্ণার বেশ কয়েকটা ফোটো তুলে নিয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, শুটিং পার্টিকে দেখাবে। রেট ঠিক হবে তখনই।

দোলাচল মন নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল পর্ণা, ঘরের চারপাশে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে ছোপ-ছোপ হতাশা। মা-বোনের চেহারায় গাঢ় বিষাদ। বাবা কাজে গিয়েছে, কী মন নিয়ে গিয়েছে, ভালই জানে পর্ণা। মনে হয়েছিল, যে-রাস্তার হদিশ দিয়েছে রেবা, এটা তো সুযোগ। এরকম কিছু নাও তো পাওয়া যেতে পারত। ক্রমশ তলিয়ে যাওয়া পরিবারটাকে বাঁচাবে কীভাবে? স্কোপটা ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নিজের সম্মতি জানিয়ে দিয়েছিল রেবাকে।

শ্রীরামপুরের জি টি রোডের একটা স্টপ থেকে দুই বন্ধুকে গাড়িতে তুলে নিল। কলকাতার কোন অঞ্চলে পৌঁছেছিল, পর্ণা জানে না। এমনিতেই কলকাতার রাস্তাঘাট প্রায় চেনেই না। কাচ বন্ধ জানালার বাইরে বেশি তাকায়নি। একটা ফ্ল্যাট বাড়ির গ্যারেজ স্পেসে দাঁড়াল গাড়ি। রেবার নির্দেশ মতো মাথায় ওড়না জড়িয়ে লিফট করে পৌঁছেছিল শুটিং ফ্লোরে। প্রথমদিন শুটিংয়ে সড়গড় হতে সময় লাগছিল। বিরক্ত হচ্ছিল ক্যামেরাম্যান। ওরা আন্ডার গার্মেন্টস দিয়েছিল। পেমেন্টও পেয়ে গিয়েছিল স্পটে। তিন লাখ। গাড়ি এসে নামিয়ে দিয়ে গেল। যেখান থেকে তুলেছিল। দ্বিতীয়বার শুটিংয়ে যেতে সময় লেগেছিল পর্ণার। মন আর শরীর জুড়ে বড় একটা ধাক্কা তো লেগেই ছিল।

হাসপাতালে শুয়ে থাকা দাদা হাতে টাকাটা পেয়ে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না, এতগুলো সত্যিকারের নোট! বলেছিল, "যাক, জোগাড় করতে পারলি তা হলে? কিন্তু এখনও তো অনেক বাকি!"

"তুই চিন্তা করিস না। দেখছি!" বলেছিল পর্ণা।

দ্বিতীয়বার রেবা সঙ্গে যায়নি। ছ'বারের পর দাদা বলল, "আর লাগবে না। বাকিটা ম্যানেজ করে ফেলতে পারব।"

ততদিনে দাদা বাড়ি ফিরে এসেছে। পর্ণা রেবাকে ফোন করে বলেছিল, "কাজের আর দরকার নেই। টাকার প্রয়োজন মিটে গিয়েছে।" কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভোলেনি। বলেছিল, "তোর জন্য আমাদের গোটা পরিবার বেঁচে গিয়েছে।"

রেবা বলল, ভাল থাকিস। মাঝে-মাঝে ফোন করিস।

ফোন আর করা হয়নি রেবাকে। গোটা পর্বটা ভুলতে চেয়েছিল পর্ণা। বাবা যে-ওষুধের দোকানে কাজ করে, দাদা ঢুকে গেল সেখানে। বৃদ্ধ এক কর্মচারী মারা যাওয়াতে জায়গা ফাঁকা হয়েছিল। প্রথমদিকে মাইনে যদিও কম, তাতেই সন্তুষ্ট ছিল পর্ণা। বাড়িতে ফিরে এল আগের মতোই পরিবেশ। টিউশন পড়ানো ছাড়াও পর্ণা তখন চাকরি খুঁজছে। দেদার অ্যাপ্লিকেশন করে যাচ্ছে খবরের কাগজ দেখে। একদিন ডালহৌসির এক অফিসে ইন্টারভিউ দিয়ে স্টেশনে নামছে, সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বেশ লম্বা, সুঠাম চেহারার ছেলে। পরিচিতের হাসি হেসে বলেছিল, "চিনতে পারছ?"

পোশাক পরিহিত বাজিকে একেবারেই অচেনা লেগেছিল। বিরক্তিস্বর পর্ণা বলেছিল, "না পারছি না, আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে।"

বাজি বলল, "আজব ব্যাপার! বেশিদিন তো হয়নি একসঙ্গে শুটিং করলাম। এর মধ্যেই ভুলে গেলে?"

কারেন্ট খাওয়ার মতো মনে পড়েছিল ছেলেটাকে। শেষ দু'দিন পাঁচনার ছিল। ওরা অ্যাক্টিংয়ের ভিতরে সত্যির আর্তিতে বিরক্ত হচ্ছিল পর্ণা। আগের ছেলেগুলোর মতো রোবটসুলভ নয়। প্রথমবারই পর্ণা ভেবেছিল, কমপ্লেন জানাবে পেমেন্ট নেওয়ার সময়। জানায়নি। বড়জোর একটা-দুটো দিন সহ্য করতে হবে। তারপর তো আর এই লাইনে সে থাকছে না।

পর্ণা মনে করতে পেরেছে বুঝে গিয়ে বাজি বলেছিল, "তোমাকে খুঁজতে-খুঁজতে হয়রান হয়ে গিয়েছি। এতদিন পর পেলাম!"

"কেন খুঁজছিলেন?" কড়াভাবে জানতে চেয়েছিল পর্ণা।

বাজি বলল, "আই লাইক ইউ। আই অ্যাম ফন্ড ইন লভ।"

ভিতরে ঘুরড়ে গিয়ে বাইরে সেটা প্রকাশ করেনি পর্ণা। বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিল, "দেখুন একটা অ্যাসাইনমেন্টে আমরা দু'জন কাজ করছি। ব্যাপারটা পুরোপুরি প্রফেশনাল। কাজ শেষ, আর আমাদের মধ্যে কোনও কথা থাকতে পারে না। আর কখনও ডিসটার্ব করবেন না এভাবে।"

বাজি সেদিন চলে গেলেও হাল ছাড়েনি। মাঝে-মাঝেই ফলো করত পর্ণাকে। রাস্তা ফাঁকা পেলেই পাশে হাঁটতে-হাঁটতে পর্ণাকে বলত, সে কতটা প্রেমে পড়েছে। ডেট করতে চাইছে। ওই সময় নিজের নাম, লিলুয়ায় থাকে, বাউন্ডারের চাকরি করে... এসব বলেছিল। যেদিন বলল, "শুটিং করতে গিয়ে, পর্ণার ব্যাপারে পাগল হয়েছে। যদি রাস্তায় দেখত, তা হলে ওই অবস্থা হত না। পর্ণাকে পুরোপুরি না পেলে সে মরে যাবে।"

পর্ণা বুঝেছিল, ছেলেটা একটা পশু ছাড়া আর কিছুই নয়। রুখে দাঁড়িয়েছিল পর্ণা। বলেছিল, "আর যদি এভাবে ডিসটার্ব করো, আমি কিন্তু পাড়ার ছেলেদের দিয়ে মার খাওয়াব। তখন যদি শুটিংয়ের কথা তোলো, পাড়ার কেউ বিশ্বাস করবে না। তারা আমার স্বভাবচরিত্র জানে, ছোট থেকে দেখছে।"

একটু সময়ে গিয়েছিল বাজি। দূর থেকে ফলো করত বাজি। কথা বলার সাহস পেত না। তখন নিশ্চয়ই ডিভিয়ো ফুটেজটা ওর হাতে আসেনি। একটা সময় থেকে আর দেখা পাওয়া যেত না। পর্ণা ভেবেছিল, আপদ বিদায় হয়েছে। বিয়ের জন্য মেয়াশশান শুরু হল বাড়িতে। খবর পেয়ে যদি বাজি ফিরে আসে, এই ভয়ে পর্ণা বাবাকে কাগজে 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপন নিজের ফোটো দিতে দেয়নি।

এ বাড়িতে আসার পর প্রথম যখন বাজি এসেছিল বাজিরা। ভয় পেয়ে যাওয়ার সঙ্গে এ প্রশ্নও মাথায় এল। এতদিন ছেলেটা ছিল কোথায়? এভাবে পিছনে পড়ে থাকবে জানলে পর্ণা বিয়েতেই বসত না। আরও ফোন, উদ্ভট বাক্য-বিনিময়। অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমেই পর্ণা জানাল, বাজি এক বছরের উপর জেলে কাটিয়েছে, বাউন্ডারের কাজ করার সময় পুলিশের সঙ্গে মারপিটে জড়িয়ে পড়ে। তারপর ডিভিয়ো ফুটেজটা ছড়িয়ে বাজি পুরোপুরি কব্জা করে নিল পর্ণাকে। তার হাতে যে মারণাস্ত্র এসে গিয়েছে, পর্ণা বিন্দুমাত্র আন্দাজ করতে পারেনি।

কীভাবে এল? আসার তো কথা ছিল না। পর্ণা ভেবেছিল রেবাকে ফোন করে বলবে, "তুই যে বলেছিল সিক্রেসিটাই এই বিজনেসের মেন ব্যাপার, মানে ওটাই প্রাণ। সব ছবি বিদেশে বিক্রি হয়ে যায়। এদেশে সেটা প্রাণঘাতী হয়ে ফিরে এল কী করে? এমন হবে জানলে ওই কাজ আমি করতামই না।"

না করে আর কোন উপায়ে ফ্যামিলিকে বাঁচাত পর্ণা? দিক হতে পারে জেনেও ঝুঁকি নিয়ে কাজটা তাকে করতেই হত। শুধু বিয়ে করার ভুলটাই করত না। নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে অন্য একটা সংসারকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলার অধিকার তার নেই। কাজটা যখন করতেই হত, রেবাকে দায়ী করে কী লাভ! তাই আর ওকে ফোন করেনি পর্ণা। কোনও কিছুই হান্ড্রেড পার্সেন্ট গোপন থাকতে পারে না, পর্ণার তো এটা আগেই বোঝা উচিত ছিল।

যাই হোক, আর তো কিছুই গোপন করার নেই। পর্ণা এখন বুলবুলি পাখিটার মতো নির্ভার। ওর সঙ্গীটা নেই কেন আজ? পাখিটা এই মুহূর্তে সুপুরি গাছ জড়িয়ে ওঠা লাল বগেনভিলিয়ার ডালে। ডাকছে, টিউ-টু-টুল, টিউ-টু-টুল। বড় আকুল ওই ডাক! মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে পর্ণার। কলকাতার হোটেল থেকে ফিরেই মোবাইলে সিমকার্ড ভরে মাকে ফোন করেছিল। মা তো প্রথমে হাইমাই শুরু করে দিল, "ফোনে পাচ্ছিলাম না কেন তোকে? চিন্তায় ঘুম উড়ে গিয়েছিল আমার। বাড়িতে কিছু বলতেও পারছি না। তোকে যে ফোন করি এরা তো জানে না। তবে আজ তোর বাবাকে বলতাম খবর নিতে।"

"তোমার জামাই বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল মা। প্রায়ই ফোনের সিগনাল ছিল না, তাই পাওনি।" পর্ণা বলেছিল পর্ণী। শুনে মায়ের ভাল লাগবে, চিন্তামুক্ত হবে। হয়েওছিল। খুশির গলায় মা বলেছিল, "বেড়াতে গিয়ে ভালই করেছিস। মন ভাল থাকবে। তা কোথায় গিয়েছিলি?"

"বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার পাহাড়ে।" বলতে ভাল লাগছিল পর্ণার। বাড়ির খবর নিয়েছিল মায়ের কাছে। মা বলল, "আমরা সবাই ভাল। আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তুই নিজের ঠিকটা দেখ।"

আবার ফোনসেট থেকে সিমটা খুলে নিয়েছিল পর্ণা। মাঝখানে ফোন করছে কি না, কে জানে! থানা থেকে ফেরার পর ফোন চালু রাখতেই পারত, এখন তো আর ভয়ের কিছু নেই। ইতিমধ্যে অভিজিৎ হয়তো শেওড়াফুলির বাড়িতে গিয়ে বলেওছে সে-কথা। জানিয়ে দিয়েছে, পর্ণাকে আর সে রাখবে না।

সত্যিটা জানার পর মায়ের হয়তো মনে হচ্ছে কেন যে এই মেয়ের জন্ম দিলাম! মা হয়তো আর ফোন করেইনি। নীলুঠাকুরপো যতই বলে রাখুক তিনজনের বাইরে ব্যাপারটা যেন কেউ না জানে, যে যার নিজের সবঘোকে কাছের লোককে তো বলেছেই। নীলু নিশ্চয়ই বলেছে তনয়াকে, সে তার প্রিয় বন্ধু অলিকে। অলি বলেছে নিজের মাকে। ধীর গতিতে হলেও ঘটনাটা ছড়িয়ে যাবে। শ্বশুরমশাই জানেন, সে তো ওঁর আচরণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ছেলের ছেলেই জেনেছেন। উনি এবার কাকে বলবেন? নিজের ভাইদের? আড়াইদিনে অনেকেই জেনে গিয়েছে, তবু যে কেন পর্ণার এগেনস্টে কোনও স্টেপ নেওয়া হচ্ছে না, সেটাই আশ্চর্যের! এদের মধ্যে কেউ কি রক্ষা করছে পর্ণাকে? বাকিদের মধ্যে করুণা করার মানবিক গুণটাকে জিইয়ে তুলেছে? কিন্তু যে সতা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ঈশ্বর ছাড়া কেউই তা মাফ করবে না। এরা কেউই ভগবান নয়।

মনে পড়ছে সেই গল্পটার কথা, কলকাতার হোটেল থেকে যখন নীলু ঠাকুরপো বাড়ি নিয়ে আসছিল, গাড়িতে বসে মহাদেবতলার দিন মুখ করে প্রণাম করছিল পর্ণা। নীলু ঠাকুরপো বলেছিল, "তোমার পেন্নাম বৃথাই যেতে পারে। অত ক'টা পাথরের মধ্যে সত্যিকারের ভগবান আছে কি না, কেউই বলতে পারবে না, তবু সকলে প্রণাম ঠোকে।" ব্যাপারটা বিশদে জানতে চেয়েছিল পর্ণা, নীলু বলেছিল অভিদার থেকে শুনে নিয়ো। পরে অভিজিৎ যা বলল, তা এই রকম, একশো কী আরো কিছু বছর আগে এ গ্রামের একজন প্রমান সাইজের একটা পাথর কোথা থেকে তুলে নিয়ে এসে বসিয়ে দিল এই বটগাছটার তলায়। বলল, শিবঠাকুর তাকে স্বপ্নাদেশে বলেছে, আমাকে গুভাবে অনাদরে ফেলে রেখেছিস! তুলে এনে প্রতিষ্ঠা কর। সারা তল্লাট খুঁজে ভগবানকে পেয়েছে সে। স্বপ্নে শিবঠাকুর ঠিক এই শিলাটাই দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

আসলে ওই ধরনের পাথর এই অঞ্চলে বিরল। সরস্বতী নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছে এই গ্রাম, ছোট-ছোট নুড়ি পাথর কীভাবে এল, এখনও জানা যায়নি। তো সেই লোকটি ভগবান প্রতিষ্ঠা করে গ্রামে বেশ খাতির পেতে লাগল। কিছু দিন পর আর-একজন গুরকম একটা পাথর এনে রাখল ওই গাছতলায়। সেও নাকি আগের লোকটির মতো স্বপ্নাদেশ পেয়েছে। এই রকম চলতে থাকল মাঝেমাঝেই। সকলেই একই স্বপ্ন দেখছে, আর পাথর এনে রাখছে গাছতলায়। এক সময় লোকে আর স্বপ্নের কথা বলত না। বিশ্বাস হারিয়েছিল স্বপ্নের গল্পে। লোকে একটু বড়, কালমতে মসৃণ পাথর পেলেই গাছতলায় এনে রেখে দিত। জায়গাটি নাম হয়ে গেল মহাদেবতলা। এভাবেই মহাদেবতলায় এখন যথেষ্ট ভগবান। ভক্তরা কিন্তু প্রণাম করা বন্ধ করেনি। কী জানি, অত ক'টা পাথরের মধ্যে কোনও একটা সত্যিই ভগবান! কিংবা সবক'টাই! পর্ণার অবস্থা এখন অনেকটা গুরকমই। সত্যিটা জানার পর কোনও একজন তাকে রক্ষা করছে, নাকি অনেকে মিলে, ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছে না। কিন্তু ক'দিন করবে রক্ষা? ঈশ্বরের মতো উদার তো হতে পারবে না। ভাবনা থেমে যায় হাঁকডাকের আওয়াজে। কারা যেন সামনের বারান্দায় এসে অভিজিতের নাম ধরে ডাকছে। কারা এল? পাড়ার লোকজন কি? কী বলছে ওরা? খারাপ মেয়েটাকে এক্ষুনি পাড়া থেকে বের করে দাও! বিছানায় বসে ছিল পর্ণা। নেমে আসে। নিচে গিয়ে দেখতে হবে কী ঘটতে চলেছে।

বাইরে ঘরের পরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল পর্ণা। এমএলএ এসেছে, প্রমাণ পাত্র। লোকটাকে চেনে পর্ণা, হাসিমুখে ভোট চাইতে এসেছিল। সঙ্গে বন্ধুতা দিতেও দেখেছে। এমএলএ-র সঙ্গে গোটা চারেক চামচা। ঘরে শ্বশুরমশাই আর অভিজিৎ। ধমকের সুরে কথা বলছে এমএলএ। অভিজিৎকে বলছে, "বাজিকে মারার জন্য তুই সুপারি দিয়েছিস?"

"এখনও দিইনি। দেব ভাবছি।" বলল অভিজিৎ।

"কেন মারতে চাস ওকে, কী দোষ করেছে সে?"

"কী দোষ করেছে, তুমি জানো না? তুমি তো এলাকার জনপ্রতিনিধি। একটা বেপাড়ার ছেলের হয়ে কথা বলতে এসেছ কেন?"

"বাজি আমাদের ছেলে। আর পার্টি কখনও একটা পাড়ার পরিধিতে আটকে থাকতে পারে না। বাজির গায়ে যদি হাত পড়ে তোকে আমি ছেড়ে দেব না।"

বলার পর প্রশান্ত পাত্র শ্বশুরমশাইয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, "কাকা ছেলেকে বোঝাও। ও কিন্তু আগুন নিয়ে খেলছে। পরিণতি ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। বাজি আমাদের অ্যাক্টিভ পার্টি মেম্বার।"

অভিজিৎ বলে ওঠে, "হ্যাঁ, একেবারে অ্যাসেট। লুচ্চা, লোফার এলিমেন্টগুলোই এখন তোমাদের পার্টির রক্ত। গোটা পাড়ায় ইতরামি করে বেড়াচ্ছে।"

চকিতে অভিজিতের দিকে মুখ ফেরায় প্রশান্ত পাত্র। বলে, "এই শোন, বাজির দোষ ধরার আগে নিজের পরিবারকে সামলা। ভদ্রপাড়ায় আছিস বলে এখনও ইডপাটকেল পড়েনি। অন্যপাড়া হলে এতক্ষণে ভিডিমোট চাট হয়ে যেত।"

কথা শেষ করে সপার্ষদ বেরিয়ে গেল এমএলএ। পর্ণা মনে-মনে বলে, এ বাড়িতে ইডপাটকেল মারবেন কেন? আমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, আমার উপর ছাড়ুন। এরা তো জানত না, আমি কেমন মেয়ে? শ্বশুরমশাইয়ের কথায় কান যায় পর্ণার, অভিজিৎকে বলছেন, "কাকে মারার জন্য টাকা দিতে গিয়েছিলিস?"

"যে ভিডিয়োটা ছড়িয়েছে।" বলল অভিজিৎ।

শ্বশুরমশাই বললেন, "কী দরকার ওসব করতে যাওয়ার! এদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবি তুই? জানিস যখন ভিডিয়োর মেয়েটা বউমা নয়, সে এরকম করতে পারে না। তারপর আবার ওদের সঙ্গে ঝামেলায়

জড়াচ্ছিস কেন?"

বাবার সামনে থেকে সরে আসছে অভিজিৎ। একটু দ্রুতই বেরিয়ে এল। দরজার বাইর থেকে সরার সময় পেল না পর্ণা। ওকে দেখে বিরক্তিতে মুখ কোঁচকালো অভিজিৎ, ছিটকে চলে গেল দূরে। যেন ছায়া মাড়ানো পাপ! একটুও কষ্ট পেল না পর্ণা। সত্যিটা তা হলে শুশুরমশাইকে বলেনি অভিজিৎ। তিরতিরে একটা আনন্দ বয়ে যাচ্ছে পর্ণার শরীর জুড়ে। যেন এখনকার সরশুতী নদী, যতই সরু হোক, এখনও শুকিয়ে যায়নি।

নয়

নিজের চেহারা নিয়ে কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না অভিজিৎ। বারবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। জামা কাপড় বদলাচ্ছে, চুল আঁচড়াচ্ছে নতুন করে, ফ্রেশ লুকটা আসছে না। নীলু জোর দিয়ে বলেছে, "হাবভাবে যেন কোনও গ্লামিনেস না থাকে। একেবারে ক্যাজুয়াল অ্যাটিচিউডে আসবে। সকলের সঙ্গে ফ্রিভাবে কথা বলবে। রচনাটাকে আমরা আর কেয়ার করছি না, বুঝিয়ে দেওয়া চাই।"

বিস্মৃতা এমন শেড, কোনও মেকআপেই ঢাকা যায় না। ভাল করে দাড়ি কামিয়েছে অভিজিৎ, মুখে সাবান ঘষেছে। একবার ভাবল পর্ণার কাছে বিদেশি ফেস ওয়াশটা চাইবে। কাল ওকে দিয়েছে নীলু। পর্ণার জন্যই এনেছিল আমেরিকা থেকে, আরও কীসব যেন দিল গিফ্‌ট হিসেবে। ফেসওয়াশ চাইতে গেলে অবাক হবে পর্ণা। সাজ নিয়ে অভিজিতের শৌখিনতা নেই, আজ কেন হঠাৎ এত আগ্রহ দেখাচ্ছে? এই ভেবে কূল পাবে না। প্রশ্নও করতে পারবে না কোনও। সম্পর্কটা এখনও এতটা সহজ হয়নি।

কিছুদিন গেলে সম্পর্কটা হয়তো সহজ হবে, গভীর আর কোনও দিনই হবে না। এটা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবে পর্ণা, কষ্ট কম পাবে। অভিজিৎ যেমন মেনে নিয়েছে অবস্থাটা। দাম্পত্য অধরাই থেকে যাবে অথচ লোক-দেখানো বিবাহিতের জীবন যাপন করতে হবে। বিপর্যয়ের এইসব দিনে ভাগ্যিস নীলুটা ছিল। এই সময় যদি ওর আসার প্ল্যান না থাকত, পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যেত না। নীলু প্রকৃত ভাইয়ের কাজটাই করেছে। নীলুর বক্তব্য হচ্ছে, "ভিডিয়োটা যে সত্যি, আমরা তিনজন ছাড়া জানেন পুলিশ অফিসাররা। উনি উচিত মনে করেছেন বলেই নিজের দায়িত্বে কেসটা ক্লোজ করতে চেয়েছেন। সেটা এমনভাবে করবেন, যেন পুলিশ কিছুই জানে না। নয়তো জেনেও কিছু করেনি কেন, এই আইনি প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে। নৈতিকতাকে গ্রাহ্য করা হবে না। এবার আমরা তিনজন এতটাই নামিদাম থাকব, যেন ভিডিয়ো ফুটেজটা পুরোপুরি ফেক। কোনও গুরুত্বই দিচ্ছি না। আশপাশের লোকজন তখন ভাবতে শুরু করবে বউ চরিত্রহীন জেনেও, অভিজিৎ কী করে এত নিশ্চিন্তে ঘুরছে। নিশ্চয়ই ঘটিয়ে দেখেছে কারচুপি আছে ভিডিয়োটায়। নয়তো যে-পরিবেশে বড় হয়েছে অভিজিৎ বউয়ের এগেইনস্টে স্টেপ নিতই। অন্তত বাইরে থেকেও যদি তোমাদের কনজুগাল লাইফটাকে আনডিসটার্ব দেখায়, লোকের মনে ধারণাটা জোরাল হবে। সুবিধে করতে পারবে না ছেলেটা। আমাদের ক্যামিনির উপর ছিটিয়ে দেওয়া কালিটা মোছার এই একটাই উপায়।"

সত্যিটা জানার আগে থেকেই মোছার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নীলু, জানার পরেও সেটা থামায়নি। চ্যাটার্জিবাড়িকে পুনরায় পাড়ায় মিশিয়ে দিতে চাইছে। আজ সেরকমই একটা প্রয়াসে যেতে হবে অভিজিৎকে। তাই সাজ নিয়ে এত চিন্তা। চেহারায় কিছুই হয়নি ভাবটা আনতে হবে। সঙ্গে থাকবে পর্ণা। সায়েন্স ক্লাবের ছেলেরা গার্লসস্কুলের একটা ঘরে মরণোত্তর চন্দুদান শিবির খুলেছে। সেখানে চন্দুদানের অঙ্গীকার করে আসবে সস্ত্রীক অভিজিৎ।

চন্দুদান কত মহৎ এবং প্রয়োজনীয় তা নিয়ে স্কুলে সেমিনার করেছে সায়েন্স ক্লাব। যার মধ্যমি নীলু। পাড়া এবং স্টুডেন্ট-টিচার্সদের মধ্যে অনেকেই আজ সেখানে অঙ্গীকারবদ্ধ হবে। স্কুলে আজ রোলকলের পরেই ছুটি। পুজোর পঞ্চমী পড়ে গেল। এইসব কর্মকাণ্ডের জন্য গার্লস স্কুলকে বেছে নেওয়ার কারণ, স্কুলের পাশে রয়তলায় রকের বব ছেলেগুলিকে দেখিয়ে দেওয়া, পাড়ার লোকেরা এবার থেকে সংঘবদ্ধ, ভাল কাজের উদ্যোগ চলছে। তোমাদের ইতরামি দিন শেষ। বাবা সকালবেলাই স্কুলে চলে গিয়েছে, চন্দুদান তো করবেই, সাহায্য করবে শিবিরের কাজে। সেমিনারেও গিয়েছিল। অফিস ছিল বলে অভিজিৎ যেতে পারেনি। পর্ণারও যাওয়া হয়নি। বাবার সঙ্গে যাওয়াটা বাড়াবাড়ি মনে হত। কাল সন্ধেবেলা নীলু এসে বলে গিয়েছে, "এগারোটা নাগাদ বউদিকে নিয়ে চলে এসো।" তার সঙ্গে চেহারায় গ্লামিনেস না থাকার শর্ত দিয়েছিল। পর্ণার ঘরে গিয়েও বলে এসেছে নীলু। পর্ণা হয়তো এতক্ষণে রেডি। চেহারা পোশাক নিয়ে এখনও সন্তুষ্ট হতে পারছে না অভিজিৎ। এই মুহূর্তে পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। বিছানায় ছড়িয়ে রয়েছে বেশ ক'টা ট্রাউজার্স, ফরমাল শার্ট, টি-শার্ট আরও দু'-সেট পাজামা-পাঞ্জাবি, যেগুলি একটু আগে মনমতো হয়নি। এসব গোছাতে হবে অভিজিৎকেই। পর্ণাকে হাত লাগাতে দেবে না। তা হলেই সম্পর্কটা সহজ থেকে গভীরের দিকে এগোবে। বাড়ির কাজের লোকের কারণে এবার হয়তো এক ঘরে থাকতে হবে দু'জনকে। নয়তো খবর বেরিয়ে যাবে বাইরে। এখনও এক ঘরে থাকার মতো মনের প্রস্তুতি নিয়ে উঠতে পারেনি অভিজিৎ।

আয়নাতে আরও একবার নিজেকে ঘুরেফিরে দেখে নিয়ে অভিজিৎ অন্যত্র পাঞ্জাবিতে স্থির হল। দেরি হয়ে যাচ্ছে, এগারোটা বাজতে চলল। পর্ণাকে ডেকে নিতে হবে। গলা তুলে ডাকার অভিনয়টা এখনই করে উঠতে পারবে না।

পর্ণার ঘরের দরজা বন্ধ। বারকয়েক টোকা মারল অভিজিৎ। খুলে গেল দরজা, এ কী! পর্ণা তো এখনও রেডিই হয়নি। অভিজিৎ জিজ্ঞেস করে, "কী ব্যাপার, তুমি যাবে না?"

"কোথায়?"

অভিজিৎ আরও অবাক। বলে, "গার্লস স্কুলে চন্দুদানের ব্যাপারটা। বাবা যে তোমায় বলে গেল!"

"তুমি তো বলোনি যেতে হবে!"

লজিকটাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না অভিজিৎ, সত্যিই তো সে নিয়ে যাবে অথচ পর্ণার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেনি। কোন ভরসায় রেডি হবে পর্ণা? নীলুর পরামর্শ শেষ মুহূর্তে অভিজিৎ নাকচও তো করতে পারে। অভিজিৎ বলল, "নাও, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, আমরা অলরেডি লেটা।"

ঘুরে গিয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে যাবে অভিজিৎ, মাথায় আসে একবার কি পর্ণাকে জিজ্ঞেস করবে ড্রেসটা ঠিকঠাক আছে কি না? পরক্ষণেই ভাবনাটা মাথা থেকে তাড়ায়।

নিচে এসে দেখে ডাইনিং টেবিলে খবরের কাগজটা ভাঁজ করা অবস্থায় পড়ে আছে। বাবা হয়তো খুলেও দেখেনি। চেয়ারে বসে কাগজটা হাতে তুলে নেয় অভিজিৎ। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে মশলা বাটার আওয়াজ। রান্নার লোক অপার মা মিক্সার চালাতে পারে না। মায়ের সেই পুরনো শিলনোড়া ব্যবহার করছে। মিক্সি চালিয়ে মশলার জোগাড় পর্ণা ওকে করে দিতেই পারে, এখনও অবধি সেই আগ্রহ দেখায়নি। পর্ণার তৈরি হতে সময় লাগবে, অভিজিৎ রান্নাঘরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, "ও অপার মা, এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে নাকি?"

"কেন পারব না? এক্ষুনি বসাচ্ছি। বউমা খাবে তো?" বাটনা বাটার শব্দ থেমে গিয়ে ভেসে এল অপার মা-র গলা।

"না, ও খাবে না। শাড়ি পড়ছে। আমরা তো এক্ষুনি বেরবো", বলে কাগজ খুলে ফেলে অভিজিৎ। কী খবর পড়বে, সবই আজকাল পানসে লাগে। নিজের সঙ্গে যে-লড়াইটা লড়ছে অভিজিৎ তা অনেক বেশি সংকটজনক। ভিডিয়োটা সত্যি জানার পর অবসাদটা চরম সীমায় চলে গিয়েছিল। অভিজিৎ গুছিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারছিল না। ঘুম হল না সেই রাতে। সকাল হতেই গিয়েছিল নীলুর কাছে। গুর ঘরে বসে চা

খেতে-খেতে কথা হল। অভিজিৎ বলেছিল, "হ্যাঁ রে নীলু, এই মেয়েটাকে নিয়ে কী করা যায়? একে তো সহ্যই করতে পারছি না। আগে তবু একটা দোলাচলের মধ্যে ছিলাম। হয়তো ভিডিয়োর মেয়েটা ও নয়। এখন তো নিজের মুখেই স্বীকার করেছে। অন্য কাউকে ধর বললাম না, কিন্তু এটা জানার পর আমি কীভাবে এক বাড়িতে ওর সঙ্গে কাটাব। কোনও ভদ্রঘরের ছেলের পক্ষে কি এটা সম্ভব?"

একটু চুপ থেকে অন্যমনস্ক গলায় নীলু বলতে শুরু করেছিল, "পয়েন্টটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। জানি না নিজের বেলায় এই রাস্তায় চিন্তা করতে পারতাম কি না? যেহেতু প্রবলেমটা একটু ডিসট্যান্স থেকে দেখছি, আমার মাথায় আসছে, ধরো, বউদিকে ডিভোর্স করে তুমি অন্য কোনও মেয়েকে বিয়ে করলে, তার যে কারও সঙ্গে সিফিক্যাল রিলেশন ছিল না, তা কি তুমি জোর দিয়ে বলতে পারবে? বউদির ব্যাপারটা এক্সপোজ হয়ে গিয়েছে বলে তোমার ওকে সহ্য হচ্ছে না। তুমি নিজে কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে, বিয়ের আগে তোমার কোনও ফিজিক্যাল রিলেশন হয়নি?"

চুপ করেছিল অভিজিৎ। ফের নীলুই বলল, "কম-বেশি বেশির ভাগেরই হয়। আমরা জেনেও সেটা মানিয়ে নিই।"

"তা বলে, ও একটা নোংরা চক্রে গিয়ে পড়বে! হয়তো ওসব করে টাকা কামিয়েছে।" বলছিল অভিজিৎ।

নীলু শুধরে দিল, "বলো পড়েছিল, কামিয়েছিল। নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েছিল এসব করতে। ঘটনাটা জানার আগে কি তোমার কখনও মনে হয়েছিল বউদির রুচি ওই মানের?"

"তা মনে হয়েছে। কিন্তু কোন পরিস্থিতে এটা করতে হয়েছে কেন বলছে না?" ঈর্ষেছারা বিরক্তি প্রকাশ করেছিল অভিজিৎ। নীলু বলল, "তুমি এর পিছনে একটা করুণ কাহিনি শুনতে চাইছ। শুনলেও বিশ্বাস করতে পারবে না। মনে হবে বানাচ্ছে। সেটা ভেবেই হয়তো বলেনি। বউদি এটাও ভেবেছে, নিজের ব্যাপারটা বলে সহ্য থাকি। ঘটনায় আরও যারা জড়িয়ে আছে, নাম জেনে যদি তুমি তাদের এগেইনস্টে চেষ্টা নিতে যাও, ব্যাপারটা আরও জটিল আকার নিতে পারে। ক্ষতিও হতে পারে তোমার, সেটা চায় না বলেই ঘটনাটা চেপে গেছে না।"

একটু ভেবে নিয়ে অভিজিৎ বলছিল, "তুই এতক্ষণ যা বললি, সবই যুক্তির কথা, কিন্তু প্রবৃত্তি বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। সব কিছু জানার পর ওর সঙ্গে বেড শেয়ার করা কি সম্ভব? গা ঘিনঘিন করবে আমার। তখন সমস্ত যুক্তি হার মেনে যাবে।"

"যাবে না। অজ্ঞান প্রবৃত্তিগুলিকে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে অতিক্রম করে মানুষ। তুমিও পারবে, হয়তো সময় লাগবে।" বলার পর নীলু লোক-দেখানো স্বাভাবিক দাম্পত্যের পরামর্শও দিয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, তারপর থেকে অভিজিৎ প্রাক্‌বিবাহ সেক্স এক্সপেরিয়েন্সের কথা ভেবে গিয়েছে। স্কুল-কলেজ বয়সে অঘরিক্তর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, গণ্ডীর গাড্ডায় পড়েছিল হোটেলের বিজনেস করতে গিয়ে। কিছু বোর্ডার মেয়েমানুষের আবদার করত। কলগার্লদা ফোন নম্বর দিয়েই রাখে হোটেল মালিকদের কাছে। কোনও একজনকে ডেকে পাঠাত অভিজিৎ। যাতে বেশি ডাক পায়, সেই আশায় কলগার্লদা খুশি করতে চায় মালিককে, শরীর অধরা কমিশন দিয়ে। বারান্নাকে শরীরের অভিজ্ঞতা হয়েছে অভিজিতের। ঘটনাটা হওয়ার পর প্রতিবার বিষাদে ভরে গিয়েছে মন। ব্যাপারটা জান্তব। যেটাতে সেক্স কোনও মানসিক সংযোগ হত না। সমুদ্রস্নানের পর শরীরে নুন লেগে থাকার অনুভূতি হত।

গুরুকমই নুন লেগে আছে পর্ণার গায়ে। যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেকধারা দিয়ে কোনওদিনই কি ধোয়া যাবে ওই বিস্বাদ আস্তরণ? জানে না অভিজিৎ। বাজি যতদিন চোখের সামনে ঘোরঘুরি করবে, কিছুতেই সম্ভব হবে না। ছেলেটাকে সরানোর নিখুঁত পরিকল্পনা নিয়েছিল অভিজিৎ। লোক বাছাইই ভুল হয়ে গেল। খোকনকে বলেছিল, "কী লোক দিলি, শালা আমাকেই ব্ল্যাকমেল করছে।"

গোটা ঘটনাটা শুনে খোকন বলেছিল, "এরা এরকমই। দু'নম্বরি করে। এদের থেকে ন্যায় আশা করাটা বোকামি। তবে মালটা সহজে পুলিশের কাছে যাবে না। অপরাধ জগতের লোক পুলিশের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলবে। তোর দুলালদার টাকা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তো দিক, নয়তো অপেক্ষা কর, দ্যাখ, লোকটা কী করে। আমার দিক থেকে ওকে যা বলার তো বলবই।"

লোকটা জোরদার ক্ষতি করার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু ও তো জানে না, নেতার কথায় ওঠাবস করে না দেউলপুরের লোক। এখানকার নাগরিক তেমনা যথেষ্ট জাগ্রত। নেতা পালটে ফেলতে সময় নেবে না। সেই চেতনার উপর আস্থা রেখে নীলু এখানকার বাসিন্দাদের ভাল কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে সুস্থ কালচার। রথতলার রকের ছেলেদের পাপট এতে কমবে। কত দিনে কমে, সেটাই এখন দেখার।

"আমি রেডি।"

পর্ণার গলা, হুঁশ ফেরে অভিজিতের। খবরের কাগজটা চোখের সামনে থেকে নামায়। টেবিলে চা ভর্তি কাপ। অপার মা দিয়ে গিয়েছে, হয়তো ডেকেও ছিল, কানে যায়নি অভিজিতের। কাপ তুলে চুমুক দিল, একেবারে ঠান্ডা।

পর্ণা বলল, "কী, গরম করে দেব?"

"না, থাক।" বলার পর অভিজিৎ ভাল করে পর্ণার দিকে তাকায়। শাড়িটা নতুন। কিন্তু অভিজিতের মতোই বিস্বাদটা ঢাকতে পারেনি। এদিকে নীলুর বলেছে নর্মাল থাকতে। পর্ণাকে সহজ করার জন্য ঠোঁটে একচিলতে হাসি এনে বলল, "শাড়িটাতো বেশ হয়েছে। নীলু দিল? পরশুই বোধ হয় শপিংমেলে গিয়েছিল অলি-তনয়াকে নিয়ে।"

"শাড়িটা আমাদের ফার্স্ট অ্যানিভার্সারিতে দিয়েছিল তুমি।" বলল পর্ণা।

মাথা নামিয়ে নিয়েছে অভিজিৎ, শাড়িটাকে মনেও পড়েছে।

পর্ণাচলতি অনেকের দৃষ্টি অভিজিৎ-পর্ণার একসঙ্গে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্যে থমকাচ্ছে। আস্তে হেঁটে একসঙ্গে থাকটা মেনটেন করতে হচ্ছে অভিজিৎকে। পিছিয়ে পড়ছে পর্ণা, জড়তা কাটেনি। খানিক দূরে মহাদেবতলার মোড়ে আদলাকে দেখা যাচ্ছে। প্যান্ট গোটানো, ঢলঢলে জামা, স্কুল রাস্তার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। মোড়ে দাঁড়িয়ে আদলার সঙ্গে একটু বকে নিলে নিজেদের আরো স্বাভাবিক দেখাবে। পাংক-পাংক মোড়টায় পৌঁছায় অভিজিৎরা। আদলা ভারী অন্যমনস্ক। অভিজিৎ বলে, "কী গো আদলা, কী ভাবছ?"

ঘোর কাটে আদলার। অভিজিৎদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, "ভাবছি চোখ দেওয়ার ঠিক হবে কি না?"

"না দেওয়ার কী আছে, চোখ তো এখনই খুলে নিচ্ছে না, তুমি মারা যাওয়ার পর নেবে।" হাসি চেপে বলল অভিজিৎ।

আদলা বলে, "সে আমি জানি। মিটিয়ে শুনেছি। আমি মরে যাওয়ার পর যে-দুটো মানুষ চোখ পাবে, বেশ বেকায়দায় পড়ে যাবে।"

"কেন? বেকায়দায় পড়বে কেন?" জানতে চায় অভিজিৎ।

আদলা বলল, "পাগলা মানুষ, ভুলভাল কত কিছু দেখি! কেন যে দেখছি, নিজেই বুঝি না।"

"আরে বাবা, তুমি পাগলা হলে কী হবে, চোখ তো পাগল নয়। সুস্থ মানুষ পেলে, ঠিকঠাকই দেখবে। নিশ্চিন্তে সই করে দাও কাগজে। চলো আমাদের সঙ্গে।"

অভিজিতের কথা কপাল কুঁচকে শুনল আদলা। কিন্তু নড়ার নাম নেই। বলে ওঠে, "চোখদুটো এতদিন ঘর করল আমার সঙ্গে, আরও অনেকদিন করবে। তারপর কি আর ও দুটো ঠিক থাকবে? গোলমাল পাকিয়ে যাবে না!" পর্ণা এতক্ষণ মন দিয়ে দু'জনের কথোপকথন শুনছিল। ঝালিল হাসি হেসে বলে উঠল, "খুব বেশি গোলমাল থাকবে না। কাজ চলে যাবে দু'জনের, তুমি তো আর পুরো পাগল নয়, আধপাগলা। তাই তো তোমার নাম আদলা!"

"ওরেঃ সাটা! দারুণ দিলি তো বউমা।" বলে হাততালি দিয়ে একটা প্যাক মেরে নিল আদলা।

তিনজনের মুখেই হাসি। অভিজিৎ বোঝে পর্ণার মুড ঠিক আছে।

AMARBOI.COM

মজা করতে পারছে। স্কুল রাস্তায় পা বাড়ায় অভিজিৎ। পর্ণার উদ্দেশ্যে বলে, "চলো, যাওয়া যাক।"

দু'জনের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল আদলা, এদের চোখ ভাল। কারোর কোনও অসুবিধে হবে না। আদলা তো শুধু নিজের চোখ নিয়ে ভাবছে না, ভাবছে অন্যেকের চোখ নিয়ে। ক্ষেত্র মল্লিক গিয়েছে সই দিতে। ক্ষেত্র হাট পেলেও, এখনও মেয়ে দেখার অভ্যেস ছাড়তে পারেনি। মেয়ে দেখলেই দৃষ্টি দিয়ে একেবারে গেঁথে দেয়, যে-বয়সেরই মেয়ে হোক। আরও অনেককে নিয়ে চিন্তা আদলার, যেমন কানু উকিলের মা মিচিংয়ে গিয়েছিল। বয়স আশির কাছাকাছি তো হবেই। লাঠি নিয়ে হাঁটে, চোখে ঢাব্বা-ঢাব্বা চশমা। মিচিংয়ে বলে কিনা, "এখনই সই করিয়ে নাও। কাল আছি কী নেই, কোনও ঠিক আছে।"

কিন্তু কথা হচ্ছে, এত পুরনো চোখ নিয়ে কী লাভ! বুড়ি লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারে না। দু'হাত দূরের জিনিস দেখতে পায় না। বুড়ির নাকের ডগায় শুকোতে দেওয়া বড়ির সারি টেনে নিয়েছে আদলা, টে পায়নি। যারা পাবে দুটো চোখ, অনেক আশা নিয়ে তো থাকবে। চোখ ন্যাগানোর পর দেখবে পৃথিবী আগাগো। মিচিংয়ে ছিল প্রফুল্ল ভড়ো বোচনের লটারির কোপনে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ নম্বর মেলায়। যারা ওর চোখ দুটো পাবে, পড়ে যাবে লটারির নেশায়। প্রফুল্ল ভড়ের মতো ফতুর হয়ে যাবে। হেমন্তের বউয়ের আবার হায়জান কম। বয়সের গাছপাথর নেই। সাজেন্ত খুব বরহ! হেমন্ত অফিস বেরিয়ে গেলেই, সেও বেরিয়ে পড়ে। টহল মারে এলাকাতেই, দোকান, বাজার, সিনেমাতলা। অল্প বয়সের ছেলে দেখলেই ডেকে কথা বলে সেরকম দু'টো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মিচিংয়ে গিয়েছিল আদলা তোবেছিল মাকে বলবে,চোখ দুটো নিখে নাও। বলেনি, সারাজীবন অভাব দেখেছে মা। ওই চোখ দুটোতে সব ধরা আছে। যারা পাবে তারা কী সইতে পারবে অত কষ্ট! জিতেন সাঁতরা গ্যাট হয়ে বসেছিল মিচিংয়ে। ওর চোখ তো দেওয়া উচিতই মা। বাজারওয়ালাদের সঙ্গে নিতা ঝামেলা লেগে আছে। কারও গুজন গুর পছন্দ নয়। খালি ডিরেকশন দেয়, দাড়িপাল্লাটা এভাবে ধর, ওভাবে ধর। নিজের চোখদুটো নিয়েও খতিয়ে দেখা দরকার আদলার। নজর ঘুরছে, পুকুরগুলোর ঘাই দেখে বোঝা যায় মাছের সাইজ। চুপি-চুপি ছিপ ফেলে সেই পুকুরে। চড়তে বেরিয়ে কোন হাঁসটা ডিম দেবে ঠিক বুঝতে পারে আদলা। ঠাঁয়ে, ঠাঁয়ে নজর রাখে হাঁসটার উপর। তালা, নারকোল দেখলেই সময় হিসেব করতে পারে, কবে নাগাদ খসে পড়বে। ওই ক'টানির ঘুরঘুর করে গাছতলায়। পাটার আড়ালে থাকা বেগুনের সাইজও বলে দিতে পারে। বাগান-ওয়ালার বাড়ির সামনে আদলার যাতায়াত বাড়লেই গৃহস্থ বলে ওঠে, "কী রে আদলা! কিসের ধান্দায়?"

আদলাকে নিয়ে লোকে তটস্থ থাকে। সে মারা যাওয়ার পর চোখদুটো পেয়ে গ্রামে যদি দুটো আদলা তৈরি হয়, লোকের হয়রানির শেষ থাকবে না। আবার এটাও তো ভাবতে হবে, যে-অন্ধ মানুষটা পুকুরে বৃষ্টি পড়া দেখতে পাচ্ছে না, আদলা তো দেখতে-দেখতে বেভুল হয়ে যায়, এক থালা গরম ভাতে ধোঁয়ার চলনে কেমন গর্ব-গর্ব ভাব! মাছরাঙা ডানা মেললেই কত রং! শ্যামের বেগুনি পাতে পড়লেই ছোটাছুটি শুরু করে দেয়, যেন জ্যান্ত! চণ্ডীমন্দিরের প্রতিমা এত নিখুঁতভাবে বানায় হারান পাল, গমেশের ইঁদুরটাকে মাঝেমাঝে ঠুকরে দিয়ে যায় সত্যিকারের ইঁদুর তোবে। আদলার চোখ পেলে এসব দেখতে পাবে দু'জন অন্ধ। চোখ দেওয়ার ভাল, যারাপ গুলিয়ে যায় আদলার। রাস্তার ধারে বসে পড়ে। তাকিয়ে থাকে মেয়ে স্কুলের দিকে। অনেক লোক চুকছে কিন্তু...

অভির বউ বেরিয়ে আসছে। খানিকটা পিছিয়ে ওর শ্বশুর। সই দেওয়া হয়ে গেল এদের। অভি বোধ হয় গল্পগাছার জন্য রয়ে গেল। সমর চট্টোপাধ্যায় মানুষটা ভাল, গ্রামের লোকের জন্য করে। ওর চোখদুটো গ্রামের উপকারে লাগবে। বউমার মনটিও উদার। আদলার মতো পাগলছাগলের সঙ্গে কত সুন্দর করে কথা বলে! খামোকা বউমার নামে নিন্দে করে বেড়ায় লোকজন। কার না-কার ছবি পেয়েছে, মোবাইলে ভাল করে না দেখেই বলছে এটা অভির বউ। দুটো মোটরবাইকে সমর চট্টোপাধ্যায়ের পিছনে দেখে রাস্তা থেকে উঠে দাঁড়াল। রথতলার রকের ছেলেগুলো আসছে। এক-একটা বাইকে তিনজন। এরা কখন কী করে ঠিক নেই। আস্ত বদমাস সব। ভাগ্যিস চোখ দেওয়ার মিচিংয়ে যায়নি। এদের চোখ গেলে গ্রামের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! আরে এ কী রে! প্রথম বাইকটা থামল অভির বউয়ের পাশে। যে-ছেলেটা বাইক চালাচ্ছিল, অভির বউয়ের হাত ধরে টানছে। হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে অভির বউ, পিছিয়ে যাচ্ছে। সমর চ্যাটার্জি বউমাকে বাঁচাতে এল, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল বাইকের পিছনের ছেলে। আদলা হাতের পাশে থাকা খোঁজে, পায় না। খালি হাতেই দৌড়ে যায়, "আই শালা, কী করছিস," বলো। যে-ছেলেটা হাত ধরে টানছে, নাম বাজি। সদ্য জেনেছে আদলা। বেপাড়ার বড়লোকের ছেলো। বাজির গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আদলা। ধতমত খেয়ে সামলে নিল বাজি। আদলার মুখে ঘুঁষি চালাল। জিভে নোনতা স্বাদ। বোধ হয় রক্ত বেরল। ঘাবড়ায় না আদলা। লড়ে যায়। অন্য ছেলেগুলি এসে লাথি-ঘুষি মারছে, মারুক। লড়াই ছাড়ে না আদলা। চক্ষু শিবিরের ছেলেগুলো আসা অবধি লড়ে যেতে হবে। তলপেটে কে যেন সজোরে লাথি কষাল। প্রচণ্ড যন্ত্রণা! যেখানে ইচ্ছে মারুক, চোখে যেন না মারে। এখনও সই দেওয়া হয়নি। চোখটুকু বাঁচিয়ে সারা শরীর দিয়ে লড়ে যায় আদলা।

দশ

ভোর থেকে সানাই বাজছে। আজ অষ্টমী। চণ্ডীমন্দিরের পুজো শুরু করে দেউলপুরের জমিদারেরা। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর বছর দশেক পুজো সলিয়েছিল। অর্থাভাবে যখন পুজো বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছে রায় পুরিবার, এলাকার মানুষজন এগিয়ে আসে। চাঁদা তুলে শুরু হয় পুজো। এক জমিদারের পুজো মনে করাতেই অষ্টমীর ভোরে মাইকে সানাই বাজিয়ে দেওয়া হয়। জমিদারের আমলে অবশ্য পুজোর পাঁচটা দিনেই সকালজুড়ে সানাই বাজত, নহবতখানা বসত চণ্ডীমন্দিরের দালানে, যার পিছনের ঘরে এখন লাইব্রেরি। সানাইয়ের সুরটাই আশপাশের পাড়ার পুজোকে বলে দেয় আমরাই সবথেকে পুরনো পুজো।

ঘুমের মাঝেই সানাইয়ের সুর শুনেছিল নীলার্ক। ধীরে-ধীরে বিদায় নিল ঘুম। এখন জেগে শুয়ে আছে। ছোটবেলার মতোই মনে হচ্ছে, 'পুজো, পুজো, পুজো, পুজো শেষ।' বড়রাই বলত কথাটা। ছোটদের মন খারাপ হত। প্রস্তুতি নেওয়া হত অষ্টমীর দিন চুটিয়ে পুজো কাটানোর। নবমীর দিন থেকে বিদায়ের সুর। সমস্ত ফিলিংস ফিরে আসছে। লস এঞ্জেলসে ছুটির দিন দেখে পুজো সারা হয়। আকাশজোড়া সানাইয়ের সুর। দুরাগত ঢাকের আওয়াজ খুব মিশ করে নীলার্ক। ওখানকার আরও অনেক বাঙালিই করে, যারা বেশ বছর দেশের পুজো কাটিয়েছে।

আজ সারাদিন পাড়ার পুজোয় কাটাবে নীলার্ক, মানে চণ্ডীমন্দিরে। সকাল থেকে প্রচুর প্রোগ্রাম। অঞ্জলি থেকে শুরু, প্রসাদ খাওয়া, দুপুরে ভোগপ্রসাদ। বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছ'-ছ'টা বছর পাড়ার পুজোয় থাকতে পারেনি নীলার্ক। গ্যাপটা কিন্তু ধরা পড়ছে না। মনে হচ্ছে পুজো যেমন ছিল তেমনই আছে। যেন গত বছরও কাটিয়েছে পাড়ায়। এবার অবশ্য ষষ্ঠী, সপ্তমীর বেশি সময়টা বাইরে কাটল। ষষ্ঠীর দিন কলকাতার ঠাকুর দেখাল ওর বন্ধুরা। তেনাকে। মা-বাবার কলকাতার পাঁচশো ঘোরার কোনও আগ্রহ নেই। গাড়ি করেই গিয়েছে নীলার্ক, নিজে চালায়নি। অভিজা বলল, "বিনা লাইসেন্সে রিস্ক নিস না। পুজোয় ভীষণ চেকিং হয়। পন্টুকে বলে দিচ্ছি ও চালিয়ে নিয়ে যাবে।"

"তুমিই চলো না। বউদিকেও নিয়ে নাও। পাঁচজনের সিট, তুমি ড্রাইভ করলে ধরে যাবে সকলে।" বলেছিল নীলার্ক।

অভিজা বলল, "আমার তো অফিস। পর্ণা যাবে কি না, জিজ্ঞেস করে দ্যাখ।"

বউদিকে নিয়ে যাওয়ার কথা নীলার্ক যে ভাবেনি তা নয়। অলি, তনয়াকে নিয়ে চিন্তা। ওরা এখনও বউদির সঙ্গে সহজ হতে পারেনি।

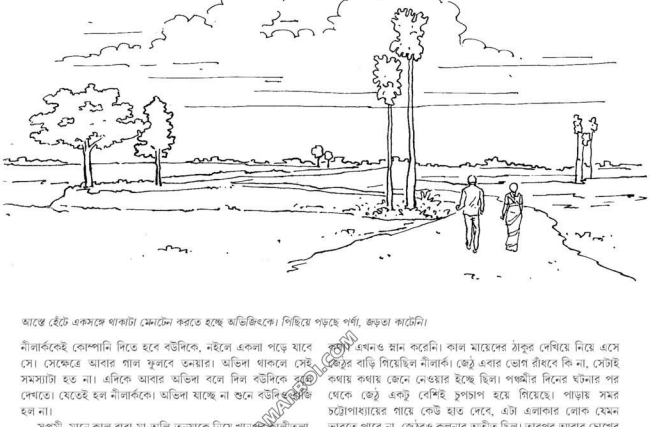

আস্তে হেঁটে একসঙ্গে থাকাটা মোটেমো করতে হচ্ছে অভিজিৎকে। পিছিয়ে পড়ছে পর্ণা, জড়তা কাটেনি।

নীলার্ককেই কোম্পানি দিতে হবে বউদিকে, নইলে একলা পড়ে যাবে সে। সেক্ষেত্রে আবার গাল ফুলবে তনয়ার। অভিদা থাকলে সেই সমস্যাটা হত না। এদিকে আবার অভিদা বলে দিল বউদিকে বুঝে দেখতে। যেতেই হল নীলার্ককে। অভিদা যাচ্ছে না শুনে বউদি রাজি হল না।

সপ্তমী, মানে কাল বাবা-মা-অলি-তনয়াকে নিয়ে খান্দেশ, শালীতলা, চন্দনপুর, লাশনগর, ডোমজুড়ের ঠাকুর দেখিয়ে এনেছে। ড্রাইভার নেয়নি। ড্রাইভ করেছে নীলার্ক। হাইরোড ধরেনি, ভিতর রাস্তা দিয়ে গিয়েছে। লাইসেন্স দেখতে চাওয়ার আশঙ্কা ছিল না। আজ কোথাও না। সকলেই পাড়াতে কাটাতে চাইবে।

মা ঢুকল ঘরে। বলল, "উঠে পড়। চা এনেছি। বিস্কুট দিলাম না। ওদেশে তো দিনের-দিন অঞ্জলি দিতে পারিস না। এখানে একটু নিয়ম-কানুন মেনে দে।"

মশারি ভিতরে সায়ের ঝাপসহ হাত বাড়িয়েছে মা। উঠে বসে কাপড়া ধরে নীলার্ক। মা মশারির খুঁট খুলতে লাগল। চায়ে চুমুক দিয়ে নীলার্ক জানতে চায়, "জেঠু গিয়েছে তো পুজোয়?"

"তিনি আবার যাবেন না। আজ তাঁর কত কাজ! সাতসকালেই দেখলাম যাচ্ছেন। নতুন ধুতি, ফতুয়া..." বলতে-বলতে থেমে গেল মা। জিজ্ঞেস করল, "হঠাৎ গিয়েছে কি না জানতে চাইছিস কেন? না যাওয়ার মতো কিছু হয়েছে নাকি?"

"না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম।" বলল নীলার্ক।

সানাই থেমে গিয়ে ঢাক বাজছে এখন। মশারি পাট করা হয়ে গিয়েছে মায়ের। বলল, "তুই বাথরুম ঢুকবি তো এখন? নেমে পড়, বিছানাটা গুছিয়ে দিই। হাতে অনেক কাজ।"

"তুমি যাও, আমি গুছিয়ে নেব।" বলে চায়ে মেজাজ করে চুমুক দেয় নীলার্ক। এত তাড়াতাড়ি মোটেই তার ওঠার ইচ্ছে নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে মা বলল, "বাথরুমে গিজার চালিয়ে রেখেছি। একেবারে চান করে বেরোস।"

সামনের খোলা জানালা দিয়ে জেঠুর বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছে। কোনও শাড়ি মেলে রাখা নেই। বউদিরও তো অঞ্জলি দিতে যাওয়ার কথা। এখনও স্নান করেনি। কাল মায়েদের ঠাকুর দেখিয়ে নিয়ে এসে জেঠুর বাড়ি গিয়েছিল নীলার্ক। জেঠু এবার ভোগ রাঁধবে কি না, সেটাই কথায় কথায় জেনে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। পঞ্চমীর দিনের ঘটনার পর থেকে জেঠু একটু বেশিই চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। পাড়ায় সমর চট্টোপাধ্যায়ের গায়ে কেউ হাত দেবে, এটা এলাকার লোক যেমন ভাবতে পারে না, জেঠুরও কল্পনার অতীত ছিল। তারপর আবার চোখের সামনে পুত্রবধূর হাত ধরে টানছে লম্পটরা। ধাক্কাটা জেঠুর অন্তস্তলে লেগেছে। কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। ষষ্ঠী, সপ্তমী জেঠুর বাড়ির তিনজন সম্ভবত চণ্ডীমন্দিরে যায়নি। মাকে জিজ্ঞেস করেছিল নীলার্ক। মা বলল, "গিয়েছে বলে তো শুনিনি। গেলে কি আর লোকজন বলাবলি করত না?"

"অষ্টমীর ভোগ রাঁধাটা উচিত জেঠুর। নয়তো প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশাটায় ছেদ পড়ে যাবে।" সঙ্কোচে জেঠুকে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারছিল না নীলার্ক। চা খেতে-খেতে বউদি জিজ্ঞেস করেছিল, "কাল অঞ্জলি দিতে যাবে তো?"

"কেউ নিয়ে গেলেই যাব। তোমার দাদা তো এখনও কিছু বলেনি", বলছিল বউদি। হয়তো ঘুরিয়ে বলতে চাইছিল তোমার দাদা যদি না যায়, তুমি নিয়ে যেয়ো। তাতে নীলার্ক কোনও উৎকণ্ঠা ব্যাহত হবে। বউদির ব্যাপারে যে অভিদার মনে কোনও দোলাচল নেই, দেখানোর জন্য স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে যাওয়াটা দরকার। নীলার্ক বলল, "তুমি অভিদাকে জোর করবে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

"দেখি," বলে প্রসঙ্গটায় ইতি টেনেছিল বউদি। পাশের ঘরে ছিল জেঠু। ব্যাঙ্কের কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করছিল। দু'-চারটে সাধারণ কথা, শরীর কেমন আছে জিজ্ঞেস করে চলে এসেছিল নীলার্ক। ভোগ রাঁধার কথাটা তুলতে পারেনি। জেঠু যদি বলে, "তোর কথায় সব ভুলে সকলের সঙ্গে মিশতে গেলাম। পরিণাম কী হল তো দেখলি!" পরিণামের প্রমাণ জেঠুর শরীরে এখনও আছে। রাস্তায় পড়ে হাঁটু, কোমর ছড়ে গিয়েছিল। এখন শুকিয়েছে। সেদিন ওই পরিস্থিতিতে অভিদার ভূমিকা ছিল দর্শকের। কে যেন শিবিরে এসে খবর দিয়েছিল, রথতলার রকের ছেলেরা জেঠুকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে রাস্তায়!

AMARBOI.COM

সবখেকে প্রথমে অভিনা ছুটে বেরিয়ে গেল। সায়েন্স ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে নীলার্ক বাইরে এসে দেখে, অভিনা স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত চোখে গোলমালটা দেখছে, সম্ভবত ঝাঁঝিছা অভিনা। যে-অভিনা একসময়ে কত মারপিট করেছে পাড়ায়, বেপাড়ায়। বউদি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, মার খাচ্ছে আদলাল। জেঠু ধুলোমাখা শরীর নিয়ে আদলাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। নীলু গিয়ে প্রথমে জেঠুকে সরিয়ে নিয়েছিল। ক্লাবের ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রথতলার গ্রুপটার উপর। বাজিরা পালটা মারপিটে যায়নি। যেটা করতে চেয়েছিল বউদিকে হেনস্থা করা, সেটা সাঙ্গ হয়েছে। বাইক চালিয়ে চম্পট দিয়েছিল।

সায়েন্স ক্লাবের ছেলেরা থানায় গেল কমপ্লেন করতে, বউদিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। নীলার্ক নিরস্ত করে বলেছিল, "আমাদের বাড়ি হয়ে আমি তো আছি। বউদির দিয়ে কাজ নেই। যা গেল ওর উপর। একটু সামলে নিক।"

আগের সেই সেকেন্ড অফিসারই কমপ্লেন নিলেন। বললেন, "পুজোর ক'দিন পাড়ায় পুলিশ দিচ্ছি, পরে দেখছি ওদের ধরা যায় কি না।"

নীলার্ককে আলাদা করে বললেন, "ছেলেগুলোকে তুলে নিতেই পারি কিন্তু চট করে বেরিয়েও যাবে। এমএলএ আছে ওদের পিছনে। অ্যারেস্ট করা হয়েছে বলে আপনি ফেরেসাস হয়ে যাবে। আপনাদের ফ্যামিলির উপর ঝামেলা করবে বেশি। তার থেকে ক্লাবের ছেলেদের দিয়ে যেভাবে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছেন, এরকমই চালিয়ে যান। আমি আড়াল থেকে আপনাদের সাপোর্ট করে যাব।"

এমএলএ এসে কী বলে গিয়েছে, অভিনার থেকে সব শুনেছে নীলার্ক। হয়তো নেতার নির্দেশেই ছেলেগুলি ক'দিন চুপচাপ ছিল। ফের নোংরামি শুরু করেছে। বেশি কিছু করতে পারবে না। তেতে রয়েছে সায়েন্স ক্লাবের ছেলেরা। এমএলএ-কে তারা তোয়াক্কা করে না। কিন্তু পুলিশ পাহারা, ক্লাবের ছেলেদের দিয়ে ক'দিন আটকে রাখা যাবে ওদের, কে জানে! পুলিশ পোস্টিং বেশিদিন থাকবেও না। সায়েন্স ক্লাবের ছেলেদের বেশ ভালমতেই মোটিভেট করতে পেরেছে নীলার্ক। ওরা আরও অনেক প্রোগ্রামের প্ল্যান করে ফেলেছে। বিজ্ঞান মেলা, স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির, বৃক্ষরোপণ, প্রকৃতিকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য মাইকে প্রচারের সঙ্গে নিয়মিতভাবে বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, গল্প লেখার কর্মশালা, আরও নানান সাংস্কৃতিক কাজকর্ম হবে। এইভাবেই এলাকায় সুস্থ আবহাওয়া ফিরিয়ে আনবে। নীলার্ককে যে-কথাটায় ওরা সবথেকে বেশি নড়েচড়ে বসেছে, তা হল, ভিডিয়ো ফুটেজটা বউদির কি না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফুটেজটা এভাবে ছড়িয়ে দেওয়াটা অন্যায় এবং বেআইনি কাজ। একটি মেয়ে, সে যেরকম চরিত্রেরই হোক, পারভিনকিনি তাকে অপমান করা যায় না। এই কালচার যদি চলতে থাকে পাড়ায়, কোনওদিন দেখব প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়া প্রেমিক, মেয়েটির ছবি সুপার ইমপোজ করে এভাবেই ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটা ইমিডিয়েট বন্ধ হওয়া দরকার। আমাদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই দিদি-বোন আছে। হাজারের বেশি স্টুডেন্ট নিয়ে পাড়ায় মেয়েদের স্কুল। একটু অসতর্ক হলেই এই নোংরামির আঁচ যে-কোনও মেয়ের গায়ে লাগতে পারে। নষ্ট হয়ে যাবে তার গোটা জীবন। এই পয়েন্টটা অবশ্য মায়ের থেকে পেয়েছে নীলার্ক। মা অবশ্য এতটা ভেবে বলেনি। মাঝে ক'দিন আবার অন্য কোথাও ফ্ল্যাট কেনার জন্য তাগাদা দিচ্ছিল মা। বলেছিল, "ফ্ল্যাটে খোঁজ নিচ্ছিস? তোর আশীর্বাদটা নতুন বাড়িতে হলেই তো ভাল হয়।"

"কেন, এবাড়িতে হলে আপত্তি কিসের? কেউ কিছু বলেছে?" তনয়ার বাবা-মা-র কথা ভেবে প্রশ্নটা করেছিল নীলার্ক। মা বলল, "আপত্তি কেউ করেনি। আমি ভাবছিলাম, ফ্ল্যাট যখন নেওয়াই হবে, শুভ কাজটা নতুন বাড়িতেই হোক।"

"ফ্ল্যাট যে নিতেই হবে এমন তো কিছু ঠিক হয়নি। ফাইনালি আরও কিছুদিন দেখা যাক না। পরিস্থিতির তো অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। আমার তো মনে হয় না অলির সম্বন্ধ দেখতে গেলে এখন আর বউদির ইস্যুটা সামনে আসবে।" বলছিল নীলার্ক।

মা বলল, "শুধু বিয়ে তো নয়, অলি ছাড়াও পাড়ার ইয়ং সব মেয়েই কেমন যেন গুটিয়ে আছে। রাস্তাঘাটে আগের মতো আর সাবলীলভাবে চলাফেরা করে না। পাছে কোনও ছেলে পিছনে পড়ে যায়। ছেলেটাকে না করলেই কোন ফাঁকে ছবি তুলে, কারচুপি করে ছড়িয়ে দেবে এলাকায়।"

"তা হলে তো পাড়াটাকেই অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হয়।" বলছিল নীলার্ক।

রাগ-রাগ মুখ করে চলে গিয়েছিল মা। অজান্তে দিয়ে গেল ক্লাবের ছেলেদের উদ্বুদ্ধ করার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। এবারের ছুটিতে আশীর্বাদের ব্যাপারটা সংযোজন করব তনয়ার বাবা-মা বাড়ি এসে। প্রস্তাবে রাজি হল নীলার্ক বাবা-মা। নীলার্ক ভাবছিল তনয়ার বাবা-মাকে একবার বলবে, জেঠুকেও এই ব্যাপারটা জানিয়ে আসুন। বলেনি, ওদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে চাপ দেওয়া হয়ে যেত। বাবা নিজে গেলে জেঠুকে আলোচনায় ডেকে নিত, ভাল লাগত নীলার্কর। যাক, আপাতত মেয়ে আশীর্বাদের দিনটা ঠিক হয়েছে, কালীপুজোর দু'দিন পর। ছেলের আশীর্বাদের দিন দেখছে বাবা। এত কম দিনে ফ্ল্যাট কেনা সম্ভব নয়, সেটা জানে না তনয়া। আসলে তনয়ার আশীর্বাদ হবে ডোমজুড়ে, ওর মাসির বাড়িতে। যিনি প্রায় ওর মায়ের সমান। মেয়ের আশীর্বাদ যেহেতু পাড়া এড়িয়ে হচ্ছে, মা-ও চাইছে ছেলেরও তাই হোক। দু'পক্ষই ছোঁয়াচ বাঁচাতে চাইছে পাড়ার।

ফোন বাজছে নীলার্কর। এখানকার নম্বরের ফোন সেট এখন সঙ্গেই রাখে নীলার্ক। বালিশের পাশ থেকে তুলে নেয় মোবাইলটা, তনয়া কল করছে। কানে ফোন নেয় নীলার্ক। বলে, "শুভ অষ্টমী।"

"ধন্যবাদ" বলে হেসে ফেলে তনয়া। ফের বলে, "কে বলবে, তুমি বিদেশে থাকো। একেবারে বাঙালি সম্ভাষণ। শোনো, আমি রেডি। চণ্ডীমন্দিরে যাচ্ছি। ফটাফট তৈরি হয়ে চলে এসো। একসঙ্গে অঞ্জলি দেব।"

AMARBOI.COM

"দোকান থেকে নামিইনি এখনও। তুমি এক কাজ করো, আমারটাও বুক করে দাও। প্রথমদিন থেকেই তো মা দুর্গা আমাদের সম্পর্কটা জানেন, কিছু মনে করবেন না।"

"হেহে, ইয়ার্কি মেরো না। তাড়াতাড়ি এসো দেখি।"

দুপুর, চণ্ডীমন্দির জমজমাট। একটু আগে অষ্টমীর পুজো শেষ হয়েছে। ঢাকের আওয়াজের সাময়িক বিরতি। জমিদারবাড়ি লোকজন চলে এলেই শুরু হবে পড়ন্তিতে বসে ভোগ খাওয়া। চণ্ডীমন্দির যেহেতু জমিদারবের ছিল, সেই সম্মানে তাদের প্রথম ব্যাচে খাওয়ানো হয়। বড়কর্তা নবকিশোর রায় প্রসাদ মুখে তুললে, বাকিরা খাওয়া চালু করে। উপস্থিত সকলের চোখ চলে যাচ্ছে চণ্ডীমন্দিরের গেটে। কখন আসবে জমিদারবাড়ির লোক। খবর পাঠানো হয়েছে। ছোট থেকেই অষ্টমীর দিন মা দুর্গার মুখটা বেশি জীবন্ত লাগে নীলার্কর। আজও লাগছে। 'একটু অপেক্ষা কর' ভঙ্গিতে চোখে ইশারা করে ভক্তবৃন্দের দিকে। ঘাটাজিবাড়ির সকলে এসেছে। পর্ণাবউদি পরেছে নীলার্কর দেওয়া শাড়িটা। অলি, তনয়ার সঙ্গে পুজোর শপিংয়ে গিয়ে কিনেছিল নীলার্ক। নিজেই পছন্দ করেছিল। বেগুনি, সাদা, হলুদ মেশানো ঢাকাই জামদানিটা দারুণ মানিয়েছে বউদিকে। বউদি এখনও তেমন সাবলীল হতে পারছে না। অভিনার পাশেপাশেই আছে। একটা ব্যাপার দেখে ভাল লাগছে, পাড়ার কিছু মহিলা বউদির সঙ্গে হাসি বিনিময় করছে, দু'-চারটে কথাও বলছে। নীলার্কর প্রয়াস তার মানে বৃথা যায়নি। পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে। আগের মতোই জেঠুকে দেখা যাচ্ছে ভোগপ্রসাদের স্টোররুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে। স্টোররুম ইনচার্জ। ঘামে ভেজা ফতুয়ার সব বোতাম খোলা, ধবধবে পৈতেটা দেখা যাচ্ছে। ভোগ রাঁধার আগের দিন নিজের হাতে নতুন পৈতে নেওয়া জেঠু। সব ভোগ রাঁধে না, রাঁধা সম্ভবও না। শুধু খিচুড়ি আর পায়েস। লাবড়া-চাটনি বামুন ঠাকুর। ভোগ রাঁধার পর স্টোররুমের সামনে দাঁড়িয়ে, গামলা, বালতিতে পর পরিবেশনকারীদের হাতে দেয়। ঘাটাজিবাড়ির লোকেরা ফার্স্ট ব্যাচে বসে না। আরও কয়েকটা সম্পন্ন পরিবার এড়িয়ে যায় প্রথম ব্যাচ। কারণ

ওই ব্যাচে জমিদারবাড়ির লোকজন সমস্ত অ্যাটেনশন কেড়ে নেয়। সকলে মিলে বেশি-বেশি খাতির করে ওদের। দীর্ঘদিনের আনুগত্যের ছায়া এখনও পুরোপুরি সরে যায়নি। জমিদারবাড়ির সদস্যরা প্রায় সকলেই কলকাতায় থাকে। আর-পাঁচটা মধ্যবিত্তের মতোই তাদের জীবনযাপন। বড়কর্তা নবকিশোর, এখানে নবুবাবু নামে খ্যাত। ওভাবে তাকে ক্যামাক স্ট্রিটে ফুঁপাতে দাঁড়িয়ে চাউমিন খেতে দেখো-না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিল অভিদা, নবুবাবুই ডেকে নেন, "অ্যাই অভিজিৎ, চললি কোথায়?"

অভিদাকে চাউমিন খাওয়াতে চান নবুবাবু। দেউলপুরের খবর নেন। বছরে দু'বার আসেন দেশের বাড়িতে। দুর্গাপুজোয় আর চণ্ডীমন্দিরের ট্রাস্টি মিটিয়ে।

দর্শনার্থীদের মধ্যে হঠাৎ চাঞ্চল্য লক্ষ করে গেটের দিকে তাকায় নীলার্ক। ওই তো, নবুবাবু বাড়ি লোকজন নিয়ে ঢুকছেন। নবুবাবুর পরনে হুতি, সুতোর কাজ করা আদ্দির পাঞ্জাবি, হাঁটায় বাবুয়ানি চাল। জমিদারবাড়ির বাকি সদস্যদের পরনেও সাবেকি পোশাক। মহিলাদের গায়ে ভারী গয়না। যদিও গ্রামের লোকেরা বলে, গুঙলি বেশির ভাগই ইমিটেশন।

ভিড় সরে গিয়ে পথ তৈরি করে দিয়েছে। জমিদার বাড়ির লোকেরা উঠোনে পাতা শতরঞ্চিতেই বসবে। ভোগ-প্রসাদ মাটিতে খাওয়াই এখানকার নিয়ম। শতরঞ্চির উপর একটা জায়গাতেই ঝালর দেওয়া আসন পাতা। ওখানে বসবেন নবুবাবু। আসনের কাছে পৌঁছে নবুবাবু উদ্যোক্তাদের বললেন, "কী, দেরি করে ফেললাম যুঃ? আর বোলো না...!"

হাতের মুঠোয় প্রসাদের সন্দেশ নিয়ে এসেছে তনয়া। খিদে তেমন পায়নি নীলার্ক, তনয়াকে খুশি করার জন্য নেয়। অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ খেয়েছে। বাড়ি দিয়ে লুচি, তরকারি, মিষ্টি। সন্দেশটাও মুখে পোরে নীলার্ক। তনয়া জলের বোতল এনেছে। জল খেয়ে বোতল ফেরত দিতে-দিতে নীলার্ক দেখে ফার্স্ট ব্যাচে আললাথ বসে পড়ল, সাইড ব্যাচ পুরো ভর্তি। নবুবাবুর সামনে খিচুড়ির বালতি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সদাকাকা। এত হাতা খিচুড়ি নবুবাবুর পাতে দিল। নবুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এবার ভোগ রাঁধল কেঃ"

"কেন, প্রতিবার যে রাঁধে! সমরদা।" বলল সদাকাকা।

নবুবাবু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কেন পাত ছেড়ে উঠলেন, বোঝার জন্য খানিক এগিয়ে যায় নীলার্ক। নবুবাবু বলছেন, "আমাকে মাফ করো, এই ভোগ আমি খেতে পারব না। যার ছেলের বউ নীলহবিতে অভিনয় করে, সেটা জানার পরও বউমাকে ঘরে রেখে দিয়েছে সে। তার চরিত্রও সুবিধের নয়। ওর রান্না ঠাকুরকে চড়ানো উচিত হয়নি তোমাদের। এই ভোগ-প্রসাদ অশুদ্ধ।"

বজ্রপাত শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই জমিদারবাড়ির বাকি সদস্যরা পঙ্‌ক্তি থেকে উঠে দাঁড়াল। সদাকাকা নবুবাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, কী বলছেন, নীলার্ক শুনতে পাচ্ছে না। একটা হইচইতো শুরু হয়েছে। আর দু'-একজন এগিয়ে এল নবুবাবুকে বোঝাতে, কিছুতেই বুঝবেন না নবুবাবু। খাবারের পাত ডিঙিয়ে চাতালে দাঁড়ালেন। মাথা নেড়ে নানান কথা বলে চলেছেন। সবই নিশ্চিত জেঠুর বিরুদ্ধে। আললাথ ছাড়া এখন পঙ্‌ক্তিতে কেউই বসে নেই। নীলার্ক কি যাবে নবুবাবুর কাছে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যদি ফেরত আনা যায় আসনে? হিতে বিপরীত হতে পারে, চ্যাটার্জিবাড়ির সদস্যকে পেয়ে বিষম উৎসাহে উগরে দেবেন দীর্ঘদিনের চেপে রাখা জ্বালা। ভাবনার মাঝেই নীলার্ক লক্ষ করে, জেঠু লম্বা পদক্ষেপে গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেতে বাধা দিচ্ছে না কেউ। জেঠু গেট পেরিয়া যাওয়ার খানিকক্ষণ পর বউদিও চলে গেল। এই পরিস্থিতিতে নিজের করণীয় কী হওয়া উচিত, বুঝে উঠতে পারছে না নীলার্ক। এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার যে সম্ভবনা ছিল, নীলার্কর মাথায় আসেনি। নবুবাবু যা করছেন, আগে থেকেই প্ল্যান করা ছিল। ট্রাস্টি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সমর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কোনওদিনই বনত না। চণ্ডীমন্দিরে লাইব্রেরি, দাতব্য চিকিৎসালয় হোক নবুবাবু চাননি। উনি বলেছিলেন, দুটো গেস্টরুম বানালে ভাল হয়। বাইরে থেকে গণ্যমান্যরা এসে থাকতে দেওয়া যাবে। জেঠু রাজি হয়নি। অভিথিরা বেশির ভাগ নবুবাবুর তরফের হবে। জমিদারবাড়ি তালা দেওয়া থাকে। অতিথিদের দেখাশোনা করতে হবে চণ্ডীমন্দিরের লোকেদের। উদ্দেশ্যটা মিটিয়ে না বলে বাকি সদস্যদের আলাদা করে বুঝিয়ে দিল জেঠু। সকলের মত নিয়ে গেস্টরুম নাকচ হয়। এছাড়া নানা বিষয়ে জেঠুর সঙ্গে মতবিরোধ হয় নবুবাবুর। বোর্ডের মিটিয়ে জমিদারি মাতব্বরিটা দেখতে পারেন না। আজ সুযোগ পেয়ে শোধ তুলে নিলেন।

নবুবাবু বাড়ির লোকজনের নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। উপস্থিত লোকজনের মুখচোখে হতভম্ব ভাব। খাওয়া থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে হলে একটা বাচ্চা কাঁদছে। পেটে দিয়ে দৌড়ে চুকল আদুলাদু চেহারার ভন্ডিমাসিন। চারদিকে চোখ বুলিয়ে অভিদাকে খুঁজে নিল। সামনে গিয়ে হাত ধরে বলল, "তাড়াতাড়ি বাড়ি চল, সব শেষ হয়ে গিয়েছে।"

হাত ছাড়িয়ে গেট লক্ষ করে দৌড়ল অভিদা। নীলার্কও ছুটতে যাচ্ছিল, বুকটা ভীষণ ধড়াস-ধড়াস করছে। কী সর্বনাশ হল, কে জানে! বড়-বড় পা ফেলে বাড়ির রাস্তা ধরে নীলার্ক।

জেঠুকে বিছানায় শোয়ানো হয়েছে। মেঝেতেই পড়ে রয়েছে পাঞ্চানো শাড়ি। জেঠিমার। জেঠু কী করতে গিয়েছিল বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। মাথার কাছে বউদি। মেঝেতে অভিদা, তাকিয়ে রয়েছে জেঠুর চোখবোজা মুখের দিকে।

নীলার্কর পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরায় অভিদা। বলে, "ঠিক সময় এসে দাঁড়িয়ে ধরেছিল পর্ণা। নইলে এতক্ষণে সব শেষ।" ডাক্তারকে ফোন করেছি আসছে। জেঠুর পায়ের কাছে বসে নীলার্ক, সেই পা-জোড়া, প্রানান্ত সাইতে এসেছিল। ঠোলে আসা কান্নার দমক সামলাতে পায়ে হাত রাখে নীলার্ক। একটু বুঝি কেঁপে উঠল। জেঠুর মুখের দিকে দৃষ্টি যায়, ওর চোখ খুলেছে। ঠোঁটে অদ্ভুত করুণ হাসি। যেন নিজের ভাগ্যের প্রতি পরিহাস।

এগারো

লক্ষ্মীপুজো পার হল। খইতে শুরু করেছে চাঁদ। আজ আরও খানিকটা ক্ষয়ে যাবে। এখন পড়ন্ত বিকেল। পর্ণা বসে আছে পিছনের বারান্দার বেতের চেয়ারটায়। তাকিয়ে রয়েছে পুকুরের দিকে। এ বছর লক্ষ্মীপুজো হল না এ বাড়িতে। অভিজিৎ বলল, "সব পুজো বন্ধ। এত পুজো-আচ্চা করার পরও যদি বাবাকে আয়ুহত্যা করতে যেতে হয়, তা হলে আর ভগবানকে ডাকার দরকার নেই।"

আশপাশের বাড়িগুলোতে পুজো হয়েছে। আলপনা দেওয়া লক্ষ্মীর পা চুকেছে ঘরের ভিতর। শাঁখ, কাঁসরঘন্টা বেজেছে। এ বাড়ি ছিল নিঃশব্দ। পর্ণা যেন দেখতে পাচ্ছিল শ্বশুরবাড়িতে লক্ষ্মীর ছাপ পড়েছে, তবে উলটোপোনে। বেরিয়ে গিয়েছেন দেবী।

শ্বশুরমশাইয়ের ঘটনাটার পর আরও অনেক কিছুই ঘটেছে। আবার ফিরে এসেছে আগের অবস্থা। শ্বশুরমশাইয়ের দুর্গতির জন্য আশপাশের লোকেরা দায়ী করছে পর্ণাকে। অভিজিৎও প্রচুর চেষ্টাপাত করল। শ্বশুরমশাই একেবারে গুম মেরে গিয়েছেন। ওকে যাঁরা দেখতে আসছে, প্রায় সরাসরি কথা শোনাচ্ছে পর্ণাকে। অভিজিৎ তো পারিবারিক মিটিং ডেকে ফেলল। পর্ণার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে সেখানে। একজন ছাড়া সকলের মত, পর্ণা বাপের বাড়ি গিয়ে থাকবে। অভিজিৎকে রেহাই দিয়ে চ্যাটার্জিবাড়িতে রেহাই দিক। সেজ খুড়শ্বশুর বললেন, "এই মিটিংয়ে ওর বাপের বাড়ির লোকদেরও ডাকা উচিত ছিল। তা হলে সমস্ত ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া যেত আজই।"

ঘরের কোণে গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পর্ণা নিচুস্বরে বলেছিল, "আমি চাই না আমার বাড়ি লোক এ ব্যাপারে ইনভলভ হোক। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আপনারাই নিন।"

মিটিঙের সুর ঘুরিয়ে দিল নীলুঠাকুরপো। বলেছিল, "বউদিকে রাখা

AMARBOI.COM

নিয়ে যখন এতই সমস্যা, আমার সঙ্গে আমেরিকা চলুক। পাসপোর্ট করাই আছে, ভিসার অ্যাপ্লাই করে দিক। খুব বেশিদিন লাগবে না ভিসা পেতে। আমার যাওয়ার আগেই হাতে এসে যাবে।"

আলো নেভার মতো ঝপ করে ঘরের সব শব্দ থেমে গিয়েছিল। দেওয়াল ঘড়ির শব্দটা কানে লাগছিল বেশি-বেশি। যে-আওয়াজটা একসময় লাগত, তুমিই দায়ী, তুমিই দায়ী... তখন বলছিল, ঠিক হয়েছে ঠিক-ঠিক। অনেকদিন পর পায়ের তলার মাটির স্পর্শ পাচ্ছিল পর্ণা। পা রাখছিল ধীরে-ধীরে। প্রথমদিন নিলুকে দেখে যে-অনুভূতিটা হয়েছিল, তা মরীচিকাসুলভ দুষ্টিভ্রম নয়। সত্যিই মনে শান্তি এনে দিতে পারল সে।

নীরবতা ভেঙেছিলেন মেজ খুড়শ্বশুর, মানে নিলুর বাবা, বলেছিলেন, "এটা কোনও সলিউশন হতে পারে না। এ বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না বলে সোজা আমেরিকায়? বাপের বাড়ি না হোক, অন্য কোথাও বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।"

"বউদিকে আমি কোথাও সেফ মনে করছি না। সেদিন রাস্তায় যা ঘটেছে, ছেলেগুলো যে-রকম ডেসপারেট, দেশের যে-কোনও জায়গায় ধাওয়া করতে পারে," বলেছিল নিলু।

অভিজিৎ বলল, "ছ'মাসের বেশি তো ভিসা পাওয়া যাবে না। তার পর কী হবে?"

"ছ'মাস অনেকটাই সময়। তার মধ্যে কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখি। যদি না যায়, বউদি এসে নিজের কোনও আত্মীয় বন্ধুর বাড়িতে ক'দিন থাকবে। ফের ফিরে যাবে আমার ওখানে।" নিলুর এই কথার পর কারওরই কিছু বলার রইল না।

অভিজিৎ দু'দিন একবারে চুপচাপ রইল। বাড়ি থেকে কখন বেরোচ্ছে, ঢুকছে, কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছিল না। শ্বশুরমশাইয়ের কথা কমে গিয়েছে। ওষুধের প্রভাবে দিনের বেশির ভাগটাই ঝিমোচ্ছেন। যে-মারাত্মক ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছিলেন, তাতে স্নায়ু শান্ত রাখার ওষুধ দিতে হয়েছে ডাক্তারবাবুকে। দু'দিন বাদে অভিজিৎ এক সকালে এল। বলেছিল, "তা হলে ওই সিদ্ধান্তই বহাল রইল, যাচ্ছ আমেরিকায়। যাবে না-ই বা কেন! ওখানে কত স্বাচ্ছন্দ্য! শুধু আমার অবস্থারই কোনও পরিবর্তন হবে না এখানে।"

"কোন বলছ একথা?" জানতে চেয়েছিল পর্ণা।

অভিজিৎ বলল, "পাড়ায় অফিসে সবাই ঘোঁচাবে। বলবে, বউটা শেষে ভাইয়ের সঙ্গে ভাগল!"

"আমি এখানে থাকলেও তোমার সমস্যা, না থাকলেও। যাব কোথায় বলতে পারো?" বিরক্তি ঝরে পড়ছিল পর্ণার গলায়।

অভিজিতের কাছে কোনও উত্তর ছিল না। সরে গিয়েছিল সামনে থেকে। পরের দিনই এল তনয়া, অফিসে সঙ্গে নিয়ে। অলি পর্ণার ঘরে ঢোকেনি। তনয়া এসে বলল, "আমার আশীর্বাদের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে, জানো?"

"জানি" বলেছিল পর্ণা।

অভিযোগের সুরে তনয়া জানাল, "ছেলের আশীর্বাদের দিনটা এখনও ঠিক হয়নি। নীল এ ব্যাপারে আর মাথা ঘামাচ্ছে না। ওর মা-বাবা তীষণ কনফিউজড কন্ডিশনে আছেন।"

"আমি কী করতে পারি বলো?" কথাটা রূঢ় হয়ে যাচ্ছে বুঝেও বলেছিল পর্ণা। এই মেয়েটাই রাস্তায় একদিন মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল ঘেন্নায়। আজ যখন নিজের অবস্থান নিয়ে সন্দেহ জেগেছে, দৌড়ে এসেছে।

এরপরই ফোঁস করে উঠেছিল তনয়া। বলেছিল, "তুমি আর কী করবে! জাল বিছিয়েই রেখেছিলে। আমারই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। সত্যি করে বলো তো? মিটিয়েই দেব এঙ্গেলস যাওয়া ঠিক হয়েছে, নাকি তোমাদের গট-আপ?"

শ্লেষের হাসি হেসে পর্ণা বলেছিল, "এই বিশ্বাস নিয়ে তুমি নিলুকে বিয়ে করতে যাচ্ছ! প্রশ্নটা আমাকে না করে থাকেই তো করতে পারতে! সে অধিকার তোমার আছে।"

"কর্তব্যের দোহাই দিলে অধিকার ফলানো যায় না। তবে তুমি যে নষ্ট মেয়ে, সেটা কিন্তু এখন স্পষ্ট। নিজেই প্রমাণ দিচ্ছ। তোমার স্বরূপ বুঝতে নীলাঁকরও সময় লাগবে না। যদি না বোঝে, আমাকেও অন্য রাস্তার কথা ভাবতে হবে।"

'অন্য রাস্তা' বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিল তনয়া, ধরতে পারেনি পর্ণা। যদি পর্ণা আমেরিকায় যায়, তনয়া কি বিয়ে করবে না নিলুকে, নাকি পর্ণাকে ওদেশে যাওয়াটা বানচাল করার চেষ্টা করবে আপ্রাণ? এরা যে কেন বুঝছে না, আমেরিকায় যাওয়ার স্পর্ধা শুদ্ধেও দেখাতে পারে না পর্ণা। অভিজিৎ বরং কোনও একদিন ভাইয়ের কাছে বেড়াতে যাবে বলে দু'জনের পাসপোর্ট করিয়েছিল। সেটা যে স্বপ্ন, অভিজিৎ নিজেও জানত। পর্ণা নিলুকে বলতে পারছে না, তোমার দাদাকেও নিয়ে চলো। শ্বশুরমশাই একা হয়ে যাবেন। যদি যায়ও অভিজিৎ, ফিরতে হবে ঝামেলাগুলা বউ নিয়ে। কোনওদিনই পর্ণার থেকে ফেরাই পাবে না বেচারা।

ভিসার অ্যাপ্লিকেশন রেডি করার জন্য মাঝে দু'বার এসেছিল নিলু। পর্ণা বলল, "তনয়া চাইছে না আমি তোমার সঙ্গে যাই।"

"জানি। আমাকেও বারণ করছে নিয়ে যেতে। অনেক খারাপ কথাও বলেছে। ওসব নিয়ে ভেবো না। সময় যেতে দাও, তনয়ার ভ্রান্ত ধারণা নিজে থেকেই ভেঙে যাবে," বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিল নিলু।

পরশুদিন ভিসার ফার্স্ট ইন্টারভিউ। নিলু নিয়ে যাবে পর্ণাকে, কিন্তু মনের খচখচানি যে কাটছে না। পর্ণা কি সত্যিই নিলুর কোনও ক্ষতি করছে? এত লোকের শাপশাপান্ত, অসহ্যই মাথায় নিয়ে অতদূর যাওয়াটা কি ঠিক হবে? বিরাট সুখস্বাচ্ছন্দ্য তো চায়নি পর্ণা। ছোটখাটো শান্তির সংসার চেয়েছিল। টানাটানির সংসারে মানুষ হয়েছে। টিফিনভর্তে মালিক পালাল, মার ঘেয়ে হাসপাতালে গেল দাদা, ঘর তছনছ করল ক্লায়েন্টরা। শ্বশুরবাড়ি এসেও শান্তি পেল না পর্ণা। কুকুর, শিয়াল রাস্তায় ধরে টানছে। সামান্য শান্তির বিনিময়ে কেন এত মূল্য চোকাতে হবে পর্ণাকে?

ভোর-বুধে শাঁখ বাজল। আবনার মাঝে সন্ধে নামল ঢিমে তালে। বাড়িতে আর সন্ধে দেখানো হয় না। কী হবে দেখিয়ে! মঙ্গলজনক কিছুই তো ঘটল না। অমঙ্গলে বউ নিয়ে এলে যা হয়। নিজে সুখী হল না বলে এখন আর আপশোষ হয় না পর্ণার। এ বাড়ি কখা ভেবেই মরমে মরে থাকে। কী কুক্ষণেই যে এরা তাকে পছন্দ করেছিল! বাজিকেও এখন আর ভয় পায় না পর্ণা। ফোনে সিমকার্ড লাগিয়ে রেখেছে। বাজি ফোন করে যখন-তখন। দেয় একই প্রস্তাব, দেখা করো, হুমকি দেয় আরও দশ সেকেন্ডের ফুটেজ ছেড়ে দেবে বাজারে।

পর্ণা বলে, "যা পারো করে নাও। ক্ষতি যতটুকু হওয়ার হয়েই গিয়েছে আমার।"

পর্ণার হাতে এখন ফোনসেট ধরা আছে। গত দু'দিন ফোন করেনি বাজি। যে-কোনও মুহূর্তে আসতে পারে ওর ফোন। হাতে একটা স্রোত ধাক্কা মারতে থাকে পর্ণার চেতনায়। মোবাইল ধরা মুঠো শক্ত হয়ে ওঠে। মনে হয়, ও কেন বারবার ফোন করবে? এবার আমি করি। বাজির নম্বরে কল করে পর্ণা। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর ওপার থেকে ভেসে আসে উল্লাস, "উরি শালা, তুমি ফোন করেছ! আমার কী ভাগ্যি!"

তপার মা এল ঘরে। রাতের রুটি-তরকারি করতে হবে পর্ণাকে। সবে রান্নাঘরে ঢুকেছে পিছন দরজায় ঠকঠক। অচেনা কেউ নক করছে, যেন খুব সন্তর্পণে। আবারও আওয়াজ। রান্নাঘর থেকে বেরোয় পর্ণা। দরজা খুলে দেখে অভিজিৎ! অচেনা লোকের মতো নক করছিল কেন? অভিজিতের চোখে-মুখে ভয়। চাপা গলায় বলে ওঠে, "বাজি খুন হয়েছে। স্কুলের পিছনে পড়েছিল, বাইক রাস্তায়। আদলা বাজারে এসে বাজি ফাসিয়ে, 'দিয়েছে' না 'দিয়েছি' বলে লাফাচ্ছিল। বডির সঙ্গে আদলাকেও তুলে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। কিছু ও তো খুন করেনি, করেছ তুমি!"

"কী করে বুঝলে?" নির্বিকার গলায় জানতে চাইল পর্ণা। উত্তরের অপেক্ষা না করে রান্নাঘরের দিকে এগোল। চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঢুকতে যাবে, অভিজিৎ পর্ণার কনুই ধরে মুখোমুখি দাঁড় করাল। বলল,

AMARBOI.COM

"বাজারে খবরটা শুনেই বাবাকে ফোন করেছিলাম, জানতে চাইলাম সন্ধেবেলা তুমি বাড়ি ছিলে কি না। বাবা বলল, "বেরিয়েছিল। আমি শিয়ারে বাজিকে ডেকে এনে তুমিই খুন করেছ। কেন করতে গেলে? আর ক'দিন পরেই আমেরিকায় চলে যেতে। নিশ্চিন্ত আরামের জীবন। যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে গেল। তোমার আর বাজির শত্রুতার কথা পুলিশ জানে। জেরা করবে তোমায়। মামলা চলতে পারে।"

"জানি। আমেরিকায় যাব না আমি। এবাড়িতেই থাকব।"

পর্ণার কথা শুনে অভিজিৎ থ। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে বলে, "কেন এখানে থাকবে? আশপাশের লোক ছি ছি করে। আমিও কত গালমন্দ করেছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি।"

"ঘাড় ধরে বের তো করে দিতে পারোনি। তাই যাকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল, সরিয়ে দিলাম।"

একটু চুপ করে রইল অভিজিৎ। আর একধাপ গলা নামিয়ে জানতে চাইল, "অস্ত্র কোথায়? অস্ত্র? পুলিশ বলছে ভারী কিছু দিয়ে মারা হয়েছে, লোহা কিংবা পাথর দিয়ে। মাথার পিছনটা ফেটে গিয়েছে। পোস্টমর্টেমের পর পুলিশ বাড়িতে অস্ত্র খুঁজতে আসবে।"

পর্ণার চোখ চলে যায় রান্নাঘরে। দৃষ্টি অনুসরণ করে অভিজিৎ, আন্দাজ করতে পারে কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। লাফিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। শিলটা দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া আছে। নোড়াটা নেই। পর্ণার দিকে মুখ ফিরিয়ে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করে, "আসল জিনিসটা কোথায়?"

"খেয়াল নেই। কোথায় ফেলেছি কে জানে!"

অভিজিৎ শিলটা তুলতে যায়। বলে, "এটা ফেলে আসি পুকুরে। কালই ব্যবহার করা অন্য শিল-নোড়া জোগাড় করব। তপার মাকে বারণ করে দেব কাজে আসতে। পুলিশ ওকে জেরা করে জানতে পারবে এবাড়িতে শিল-নোড়া ব্যবহার হত। তপার মা কাজে না এলে জানা যাবে না, কোন শিল-নোড়া।"

শিলটা বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে অভিজিতের। পিছন দরজা দিয়ে এগিয়ে চলেছে মান্নাদের পুকুরের দিকে। ঝুঁকে গিয়েছে, পর্ণা ভাবছে, ছুটে গিয়ে হাত লাগাবে কি না! না থাক, বউয়ের কলজের পাটা, ভারী তো হবেই!

বারো

গড়িয়ে গেল আরও কয়েকটা মাস। দেউলপুর ফিরে গিয়েছে পুরনো ছন্দে। দমচাপা ব্যাপারটা আর নেই। বাসিন্দারা খোলামেলাভাবে ঘুরছে ফিরছে। রথতলার রকের আড্ডাটা নেই। বাজি খুন হওয়াতে বাকি ছেলেগুলো উধাও। নীলার্ক উড়ে গিয়েছে লস এঞ্জেলসে। পর্ণা যায়নি। তন্ময়, নীলার্কর যথাসময়ে আশীর্বাদ হয়েছে। নীলার্কর আশীর্বাদ হল দেউলপুরের বাড়িতেই। দু'জায়গাতেই প্রধান অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমর চট্টোপাধ্যায়। সামনের বছর নীলার্কদের বিয়ে। দিন দেখা হচ্ছে।

বাজির খুন হওয়া নিয়ে পর্ণাকে পুলিশি জেরার মুখে পড়তে হয়নি। সেটা হয়তো থানার ওই সেকেন্ড অফিসারের কারণে। ওঁর কাছে বাজির চেয়ে এলাকার শান্তি বড়। আদালাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোথায় একটা বাজি ফাটার শব্দ পেয়েই সে নাকি বাজারে এসে চেঁচাচ্ছিল। অভিজিৎ, পর্ণাকে নিয়ে কাছেপিঠে ট্যুর করে এসেছে। ঝাড়গ্রামের দিকে গিয়েছিল। স্বপ্নে লরি করে যে-জায়গায় পৌঁছেছিল, সেরকম মাঠ-রাস্তা-আদিবাসী গ্রাম ওখানে অনেক। পর্ণাকে নিয়ে দু'বার শেওড়াফুলির বাড়িতে ঘুরে এসেছে অভিজিৎ। শ্বশুরবাড়িতে তার কমই যাওয়া হয়। পর্ণাও সংসার ফেলে যেতে পারে না। তপার মাকে ছাড়িয়ে দেওয়াতে দু'বেলার রান্না তাকেই করতে হয়।

দেউলপুরের একজনের হাবেভাবে বিরাট বদল এসেছে। যেহেতু সে লোকটি আদলা, কেউ তেমন গ্রাহ্য করছে না। আদলার ভক্তির বহর বেড়েছে খুব। হামেশাই মহাদেবতলায় তাকে ঠাকুর প্রণাম করতে দেখা যায়। কখনও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে, কখনও বসে, দাঁড়িয়ে। চোখ দিয়েই পাথরগুলোর মধ্যে কী যেন খোঁজে। কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করে, "কী রে আদলা, কী খুঁজছিস? পয়সা ছুড়েছে কোনও লোক?"

আদলা বলে, "না রে বাবা, এগুলোর মধ্যে কোনটা আসল ভগবান, সেটাই দেখছি।"

প্রকৃত কারণ কিন্তু তা নয়। আদলা খুঁজছে সেই নোড়াটাকে। সন্ধেবেলা বাজিকে একা বাইক চালিয়ে স্কুলবাড়ির দিকে যেতে দেখে আদলাও পিছন-পিছন গিয়েছিল। কে জানে, বদ ছেলেটা কোন মেয়ের সর্বনাশ করতে যাচ্ছে! স্কুলের আগেই রাস্তার উপর অভিজিতের বউকে দেখতে পেয়ে আদলা ভীষণ অবাক। বউমা কথা বলছে বাজির সঙ্গে, কোনও ঝগড়াঝাঁটি নয়, সাধারণ কথা। কী হল ব্যাপারটা? ক'দিন আগেই না বাজি রাস্তায় বউমার হাত ধরে টেনেছিল! এখন ভাব হয়ে গেল! মানুষের চরিত্র বোঝা দায়! ব্যাপারটা যে তা নয়, বোঝা গেল একটু পরেই। বউমাই বোধ হয় বাজিকে বাইক থেকে নামতে বলল, হাত দিয়ে দেখাল স্কুলবাড়ির পিছনের মাঠ। যেন বলল, চলো, ওখানে বসে কথা বলি। বাজি রাস্তা থেকে মাঠে নামতে যাচ্ছে, বউমা সজোরে ওর মাথার পিছনে কী দিয়ে যেন মারল। বাজি মাটিতে পড়েই স্থির। হাতের জিনিসটা ফেলে দিয়েই বউমা পাগলের মতো দৌড়তে লাগল। নিশ্চয়ই বাড়িতেই যাচ্ছে। কিন্তু খুনের অস্ত্র যে মারাত্মক জিনিস। আদলার বয়স তো কম হল না, বেশ ক'টা কেস দেখেছে। পুলিশ খুনের অস্ত্র খুঁজে বেড়ায় খুনির অপরাধ প্রমাণ করার জন্য। বউমার ফেলে যাওয়া অস্ত্র তুলে নিয়েছিল আদলা, নোড়া! কোথায় ফেলবে ভেবে পাচ্ছে না, মাথায় এল মহাদেবতলার কথা। ঠাকুরের থানে রাখলে পুলিশ ঘাঁটাঘাঁটি করবে না। শিশিরদের বাড়ির সামনের টেপা কলে নোড়াটা ধুয়ে মহাদেবতলায় রেখেছিল আদলা। নিজে রেখেছে, অথচ নিজেই আর খুঁজে পায় না। ভক্তদের দেদার প্রণাম পাচ্ছে নোড়াটা। মিশে গিয়েছে ভগবানের ভিড়ে।

অঙ্কন: প্রত্যয়ভাস্কর জানা